১৯৫২ সাল

সৈয়দ আলী আহসান

আর্টস-এ চারুকলা বিষয়ে খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে। ১৯৮৩ সালে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ঐ বছরের ২৬ মার্চ, তাঁর জন্মদিনে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৮৯ সালে তিনি জাতীয় অধ্যাপক হন এবং ঐ বছরেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৯১ সালে চেয়ারম্যান পদ থেকে তিনি ইস্তফা দেন এবং সেই সময় থেকে পূর্ণভাবে লেখালেখির কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

অনেকগুলো জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মানে তিনি ভূষিত হয়েছেন। কবিতার জন্য ১৯৬৭ সালে পেয়েছেন বাংলা একাডেমী পুরস্কার। ১৯৮৩-তে পেয়েছেন একুশে পদক। দেশের সর্বোচ্চ সম্মান স্বাধীনতা স্বর্ণপদক পেয়েছেন ১৯৮৭ সালে। হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৭৪-এ নাগপুরের বিশ্ব হিন্দি সম্মেলন থেকে পেয়েছেন সম্মাননাপত্র। ১৯৯২ সালে ফরাসী সরকার তাঁকে দিয়েছেন OFFICIER DE L'ORDRE DES ARTS ET DES LETTER-এর সনদ।

বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। তাঁর বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো– 'পদ্মাবতী', 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', 'মধুসূদন: কবিকৃতি ও কাব্যাদর্শ', 'রবীন্দ্রনাথ : কাব্য বিচারের ভূমিকা', 'আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে', 'শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য', 'মহানবী', 'বাংলাদেশ ১৯৭৫'।

সৈয়দ আলী আহসান

সৈয়দ আলী আহসানের জন্ম ২৬ মার্চ, ১৯২২। এটা সরকারিভাবে স্বীকৃত। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, তাঁর জন্ম আরও দু'বছর আগে। যশোরের আলোকদিয়া গ্রামে একটি সম্ভ্রান্ত সুফী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষাজীবনের পুরোটা সময় কেটেছে ঢাকায়। ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরেজীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং সেই বছরেই ঢাকা সরকারি ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমানে কবি নজরুল কলেজ) কয়েক মাস শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৫ সালে হুগলী ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। ঐ বছরের শেষের দিকে কলকাতা অল ইন্ডিয়া রেডিওতে প্রোগ্রাম এ্যাসিসট্যান্ট হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৪৬ সালে কমর মুশতারীকে বিয়ে করেন। ১৯৪৭ সালে ঢাকায় চলে আসেন এবং রেডিও পাকিস্তানে দু'বছর চাকরি করেন। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে সিনিয়র লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৪-১৯৬০ পর্যন্ত করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬০ সালে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন এবং ১৯৬০-১৯৬৬ পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৭-১৯৭১ পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। এই সময় তিনি পরপর তিন বছর কলা অনুষদের ডীন নির্বাচিত হন। মার্চ ১৯৭১ থেকে ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রবল জনমত তৈরি করেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২-১৯৭৫ পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭৫ সালে পুনরায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যায়ের পূর্ব চাকরিতে ফিরে যান। কয়েক মাস পর আবারো উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তবে এবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যায়ের। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮-এ আবার শিক্ষকতায় ফিরে যান ; প্রথমে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক এবং পরে ইনস্টিটিউট অফ ফাইন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১৯৭৫

●

সংস্মরণ

www.pathagar.com

১৮৫৭

বিদ্রোহ

www.pathagar.com

১৯৭৫

সংস্মরণ

সৈয়দ আলী আহসান

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স ❑ ঢাকা

www.pathagar.com

দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রকাশকাল ❑ ২৬ মার্চ ২০০২

প্রকাশক ❑ মোঃ শিহাব উদ্দিন বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স ৫০ বাংলাবাজার, পাঠকবন্ধু মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০, ফোন : ৭১১১৯৯৩ কম্পিউটার সেটিং ❑ বাড কম্প্রিন্ট, ৫০ বাংলাবাজার মুদ্রণে ❑ মেরাজ প্রেস, প্যারীদাস রোড, ঢাকা প্রচ্ছদ ❑ মঈনুল ইসলাম মুক্তো গ্রন্থস্বত্ব ❑ লেখক

মূল্য ❑ ১৫০.০০ টাকা মাত্র US $ 11

ISBN-984-839-021-8

www.pathagar.com

উ ৎ স র্গ

মরহুম বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

স্মৃতির উদ্দেশে

www.pathagar.com

[illegible]

স্মৃতি নদীর প্রান্তে তাঁহাদেরই উদ্দেশে

www.pathagar.com

১৯৭৫ সাল আমাদের দেশের জন্য একটি সংকটের কাল বলা যেতে পারে। এ বছরে আমার জীবনেও অনেক পরিবর্তন এসেছিল। কয়েক বার বিদেশে গিয়েছিলাম এবং বিদেশীদের অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সব ক্ষেত্রেই আমি একটি উত্তর দিয়েছিলাম তাহলো যা কিছুই ঘটুক না কেন আমাদের দেশ তো বেঁচে আছে এবং এদেশকে আমরা বাঁচিয়ে রাখব। যা ঘটেছে তা পুনরুদ্ধার করা সম্ভবপর নয়। আমাদের কর্তব্য হবে সংশয় ও দ্বিধা থেকে মুক্ত হয়ে সর্বপ্রকার গ্লানি অতিক্রম করে দেশকে একটি প্রশান্ত মূর্তিতে উজ্জ্বল রাখা। ১৯৭৫ সালে আমি প্রতিদিন রোজ নামচা লিখতাম। এই রোজনামচা সেদিনের সব ক'টি দিনের চিন্তা-ভাবনা এবং আশ্বাসের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে। সেজন্য ইতিহাসের দিক থেকে এ বইটি মূল্যবান। আমার দৃষ্টিতে কোন কিছুই আড়াল থাকেনি। আমি নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে সবকিছু দেখবার চেষ্টা করেছিলাম। আমার কাছে আমার ক্ষুদ্র পৃথিবী সব সময় আমার সামনে জেগে উঠতো। আমি ভাবতাম পৃথিবী এবং আমি একটি সমস্যার মধ্যে যেন আবর্তিত। বিক্ষুব্ধ কখনও হইনি। কিন্তু হয়তো হতাশা কখনও জেগেছে।

আমার বন্ধু ছিলেন বিখ্যাত হিন্দী কবি বাৎসয়িন। তার সঙ্গে আমার অনেক বিষয়ে মিল ছিল। তিনি সমুদ্র দেখতে ভালবাসতেন এবং পাহাড়ের কাছে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। আমিও সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে অনন্তের গতিধারা লক্ষ্য করতাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, মানব জীবনে সবকিছু মসৃণভাবে ঘটে না। জীবনে শঙ্কা থাকে, আবার বাঁচবার ইচ্ছাও থাকে। আমাদের উচিৎ শঙ্কা-বিমুক্ত হয়ে বেঁচে থাকার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা। একজন লেখকের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বেঁচে থাকার জন্য শব্দ সংগ্রহ করা। কেননা শব্দ হচ্ছে আমাদের অভিজ্ঞতার মাপকাঠি। অভিজ্ঞতা যেমনিই হোক না কেন তার গতি হচ্ছে সময়ের মধ্য দিয়ে এবং প্রতিটি প্রহর গণনার মধ্য দিয়ে।

আমি প্রহর গণনাকে বিশেষ মূল্য দিয়েছি। '১৯৭৫ সাল' এই গ্রন্থটি একবার প্রকাশিত হয়েছিল তার তাৎপর্য আজও বিদ্যমান। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বর্তমান গ্রন্থটি দ্বিতীয়বার ছাপাবার মনস্থ করলাম। ভাবলাম মানুষের যাত্রা উদ্দেশ্যহীন নয়। তার দৃষ্টির একটি সীমাবদ্ধতা আছে, গতিবিধিরও সীমাবদ্ধতা আছে। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই তার সঞ্চরণ। আমি এই সঞ্চরণকে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছি। সেই কারণেই গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত হল।

৬০/২ উত্তর ধানমণ্ডি
ঢাকা-১২০৫
টেলিফোন ঃ ৯১২৮৯৬৫

সৈয়দ আলী আহসান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশ : ১৯৭৫

১-১-৭৫

মনটা আজ ভাল নেই। ভেবেছিলাম নতুন বিশ্ববিদ্যালয়কে শৃঙ্খলায় এবং স্বস্তিতে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলব কিন্তু তা পারলাম না। ইচ্ছে থাকলেও বিশৃঙ্খল সময়ের আঘাত যে এত প্রচণ্ড হবে তা ভাবিনি। বাইরের অশান্তি এবং বিক্ষোভ বিশ্ববিদ্যালয়কে যে স্পর্শ করবে তা আমি আগে ভাবিনি। ভেবেছিলাম ছাত্রদের গৃহগত অবস্থানের সুযোগ এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার কারণে একটি শৃঙ্খলার জন্ম দেবে, কিন্তু তা হয়নি। দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসন ছাত্রদের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে এবং তাদের আশ্রয়পুষ্ট ছাত্ররা শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা তৈরি করছে। ছাত্রদের রাজনৈতিক দলভুক্তি বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে– রাজনৈতিক বিরোধ থেকে হিংস্রতার সৃষ্টি এবং মানবীয় বোধের সম্পূর্ণ অবমূল্যায়ন। এই হিংস্রতার শিকার হল দুটি সুন্দর ছাত্র। প্রথমে মারা পড়ল রোকন এবং কয়েক দিন আগে মোজাম্মেল। রোকন ছিল সরকার বিরোধী ছাত্রদলের নেতা। তীক্ষ্ণ চেহারা, ধারালো হাসি এবং বুদ্ধিদীপ্ত কর্ম-কৌশল তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অত্যন্ত পরিচিত করে তুলেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত ছাত্র-প্রতিনিধিদের সে ছিল জেনারেল সেক্রেটারি এবং তার প্রভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তার দলের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। এ আধিপত্য ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করা হয়েছে বারবার। কিন্তু রোকনের কৌশলগত ব্যবস্থায় এটা কেউ ভাঙতে পারেনি। একবার তার বিরোধী পক্ষ এক ট্রাক বোঝাই অস্ত্রধারী গুণ্ডা নিয়ে ছুটির দিনে রোকনদের উপর আক্রমণ করেছিল। কিন্তু রোকনরা সাভারের গ্রামে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। বহিরাগত গুণ্ডারা ছাত্রাবাসের কিছু ক্ষতিসাধন করে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রোকন নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। একদিন সাভারের রাস্তা থেকে তাকে তুলে নিয়ে যায় এবং কয়েক দিন পর নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। কিছুদিন আগে যে ছেলেটিকে হত্যা করা হল সে-ও ছিল নির্বাচিত ছাত্র সংসদের জেনারেল সেক্রেটারি। সরকার সমর্থিত দলের ছাত্র হয়েও তাকে প্রাণ দিতে হল দলগত কোন্দলের জন্য। মোজাম্মেলকে হত্যা করা হয় তার কক্ষের মধ্যে বাইরের খোলা জানালা দিয়ে। মোজাম্মেলের মৃত্যুর পরে সিদ্ধান্ত নিলাম আমি উপাচার্যের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইব। দেশ স্বাধীন হল, একটি নতুন চৈতন্যের দ্বারোদঘাটন হবে ভেবেছিলাম, কিন্তু বিকার এবং বিরুদ্ধতা এসে আমাদের গ্রাস করল। দুর্ভাগ্যক্রমে

www.pathagar.com

বিকারটা এল এমন এক ক্ষেত্রে যেখানে মেধা তৈরি হয় এবং মানবচিত্রের স্ফূর্তি ঘটে। সমাজের কল্লোলিত বিক্ষুব্ধ কণ্ঠ কখনও কখনও শিক্ষাঙ্গনে আলোড়ন তোলে ঠিকই কিন্তু সর্বসময়ের জন্য শিক্ষাঙ্গনকে গ্রাস করে না। পৃথিবীর ইতিহাসে তো এটাই দেখেছি। তাছাড়া এশিয়ার দেশগুলোতে স্বাধীনতার আন্দোলনে ছাত্ররা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর সংগ্রাম এবং বিক্ষুব্ধতার অঙ্গন আর শিক্ষাঙ্গন থাকেনি; শিক্ষাঙ্গন হয়েছে তখন স্বাধীন দেশের মানুষকে গড়ে তুলবার একটি প্রক্রিয়া কেন্দ্র। কিন্তু আমাদের দেশে এ অবস্থাটি ঘটল না। আমরা কিছুতেই শিক্ষাঙ্গনকে শান্ত রাখতে পারছি না।

আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে একটি পদত্যাগপত্র লিখে মিন্টো রোডে শিক্ষামন্ত্রী ইউসুফ আলীর বাসায় গেলাম। ইউসুফ এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্র ছিল। ছাত্র হিসেবে সে ছিল অত্যন্ত শান্ত এবং নির্বিরোধী। পাকিস্তান আমলে সে দিনাজপুর কলেজে শিক্ষকতা করতে থাকে এবং তখন থেকে মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়। ইউসুফ আমাকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হল এবং নববর্ষের সম্ভাষণ জানাল। আমি কি জন্য এসেছি তা তাকে বললাম এবং সম্পূর্ণ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলাম। আমার কথা শুনে সেও খুব অসহায় বোধ করল। কিন্তু কিছু করতে পারবে বলে আমাকে আশ্বাস দিতে পারল না। আমি আমার পদত্যাগপত্রটি তখন তার হাতে দিলাম। পদত্যাগপত্রটি পেয়ে সে চমকে উঠল। সে বলল যে কিছুতেই পদত্যাগপত্রটি উপরে দাখিল করতে পারবে না। কেননা, যিনি প্রধান ব্যক্তি তিনি কারও পদত্যাগপত্র গ্রহণ করাকে অপমানকর মনে করেন। আমি তবুও পদত্যাগপত্রটি তার কাছে রেখে এলাম।

বিকেলে আমার ধানমণ্ডির বাসায় ভারতীয় দূতাবাসের ডক্টর জালাল আহমেদ এলেন। কিছুদিন আগে তাঁর কাছ থেকেই আমি নাগপুরে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব হিন্দী সম্মেলনে যোগ দেবার আমন্ত্রণপত্র পেয়েছিলাম। আমি সে জন্য প্রস্তুতিও নিচ্ছিলাম। জালালকে জানালাম যে আমি সরকারী অনুমোদনও পেয়েছি। জালাল আমাকে নাগপুর যাবার বিমানের টিকেট দিয়ে গেল। আমার স্ত্রীও এবার আমার সঙ্গে যাবেন। আমি শুধু নাগপুরেই যাব না, নাগপুর থেকে বোম্বে, দিল্লী এবং আগ্রা হয়ে দেশে ফিরব। নাগপুরে বিশ্ব হিন্দী সম্মেলনে আমাকে সংবর্ধনা দেয়া হবে। আমাকেই শুধু নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় নিযুক্ত বিশিষ্ট কর্মীদের সংবর্ধনা দেয়া হবে। আমি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গবেষণা সূত্রে হিন্দী ও অবধী ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছি। এটা ভারতের হিন্দী ভাষার পণ্ডিতরা জানতেন। ভারতের সাহিত্য একাডেমীর সচিব প্রভাকর মাচওয়েও একথা জানেন। আগ্রার হিন্দী ভাষাকেন্দ্রের লোকেরাও জানেন। সম্ভবত এদের মধ্য থেকেই কেউ আমার নাম প্রস্তাব করেছিলেন। তাছাড়া আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের একজন বড় মাপের কবি সচ্চিদানন্দ বাৎসায়নও আমার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়ে থাকতে পারেন। বাৎসায়নের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ১৯৫৭ সালে টোকিওতে। আমরা উভয়ই সেখানে গিয়েছিলাম আন্তর্জাতিক লেখক সংঘের আমন্ত্রণক্রমে। বাৎসায়নের কবিতা যেমন মনোজ্ঞ, তাঁর ভ্রমণ কাহিনীগুলোও নানাবিধ অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।

www.pathagar.com

ডঃ জালাল চলে যাবার পর বুলগেরীয় দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারি ইভান এল। আমার এবছরই বুলগেরিয়া যাবার কথা আছে। এখনও তারিখ নির্ধারিত হয়নি। ইভান সে ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছে। বুলগেরিয়া দেখবার ইচ্ছা আমার অনেক দিনের। এ দেশটি প্রায় পাঁচশ' বছর ওসমানীয় তুর্কিদের অধীনে ছিল। এর ফলে এ দেশের সংস্কৃতিতে, স্থাপত্যে, ভাষায় এবং খাদ্যাভ্যাসে কোন তুর্কি প্রভাব অবশিষ্ট আছে কি-না এটা আমার জানবার খুবই ইচ্ছা। ইভান জানাল যে, তার দেশের কোন একটি উৎসব উপলক্ষে আমাকে আমন্ত্রণ জানান হবে।

ইভান আমার জন্য এক বোতল 'কিয়ানতি' নিয়ে এসেছিল। কিয়ানতি বুলগেরিয়ায় প্রস্তুত এক প্রকার সুস্বাদু মদ্য। আমি যে মদ্য পান করি না তা ইভান জানে না। আমি বোতলটি রেখে দিলাম। মদ্যপায়ী কাউকে দিয়ে দেয়া যাবে। স্ত্রীকে জানাতেই তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি বললেন, "এ বোতল তুমি কাউকে দিতে পারবে না, ভিতরকার বস্তু নর্দমায় ঢেলে দাও। বোতলটা সুন্দর। বোতলটা ধুয়ে আমি ফুলদানী হিসেবে ব্যবহার করব।" আমি হেসে স্ত্রীর কথামতই কাজ করলাম। ইভানের উপহারের এহেন পরিণতিতে কৌতুক বোধ করলাম।

২-১-৭৫

বিশ্ববিদ্যালয় কাকে বলে এ প্রশ্ন নতুন করে মনে জাগছে। এক সময় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখন জানতাম যে, বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে বিশ্বের সকল বোধ এবং জ্ঞানের কেন্দ্র। শিক্ষকদের কাছে শুনেছি যে, পৃথিবীতে মানুষের প্রয়োজনে যে জ্ঞান তার কোন পরিসীমা নেই। তার ব্যাপকতা এবং গভীরতা অপরিসীম। জ্ঞানের প্রয়োজন হচ্ছে মানুষের জীবনে প্রাচুর্য এনে দেয়া, চিত্তের ঔদার্য নির্মাণ করা এবং অহমিকাশূন্য একটি অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা। মানুষ অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে এই অর্থে ভিন্ন যে মানুষ পরীক্ষা করতে জানে, বিশ্লেষণ করতে জানে এবং রূপ ও অরূপের মধ্যে ভেদরেখা নির্ণয় করতে জানে। মানুষের এ ক্ষমতাগুলো শাণিত করবার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। সে শিক্ষার কেন্দ্রভূমি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। পৃথিবীর সকল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই আদর্শে অনুপ্রাণিত। প্রাচীন যে ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীতে আছে তারা আজও গতিশীল এই কারণে যে, তারা বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহে এবং প্রচারে আজও সচল ও আন্তরিক।

ইংরেজরা যখন উপমহাদেশে প্রথম কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে তখন তাদের উদ্দেশ্য রাজনৈতিকভাবে যাই থাকুক না কেন, শিক্ষাগত দিক থেকে সততার অভাব ছিল না। আমরা যতই বলি না কেন যে, পরাধীন দেশের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য দেশীয় কর্মচারী প্রয়োজন এবং সে উদ্দেশ্যেই উচ্চশিক্ষার প্রবর্তন তারা করেছিলেন, এটা অংশত সত্য, তবে এটাই সব কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে সমস্ত বিষয়ের প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি করা হয়েছিল সে সমস্ত বিষয়ে উচ্চশিক্ষার দ্বার তাঁরা উন্মুক্ত রেখেছিলেন। শিক্ষাক্রমের নিজস্ব গণ্ডিতে তাঁদের সততা এবং আন্তরিকতা ছিল। তাই দেখি যে, ব্রিটিশদের প্রবর্তিত শিক্ষা লাভ করে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মতিলাল নেহেরু, বিপিনচন্দ্র পাল, মওলানা মোহাম্মদ আলী – এঁরা এবং আরও অনেকে স্বাধীনতা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছিলেন এবং উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষাঙ্গনে আজকের দিনের এই বিপর্যস্ত অবস্থা কেন সৃষ্টি হল তা আজও আমি বুঝে উঠতে পারি না। স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্ররা অংশগ্রহণ করেছে এটা সত্য এবং রাজনীতিবিদগণকে তাঁদের কর্মধারায় সুদৃঢ়ভাবে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা ছাত্ররাই দিয়েছিল ঠিক, কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ছাত্রদের রাজনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে গেল এবং সীমিত আবর্তে প্রলয়ংকর হয়ে উঠল; এটা তো আমরা ধারণা করতে পারিনি।

এর থেকে মুক্তির একটি মাত্র পথ আছে, সেটা হচ্ছে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো শিক্ষাঙ্গনে যদি তাদের প্রতিনিধি না রাখে। মূলত এহেন প্রতিনিধিত্বের কারণে শিক্ষাঙ্গনগুলো সর্বদাই উত্তপ্ত থাকবে। দেখা যায় যে, রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক ভেদবুদ্ধি শিক্ষাঙ্গনেই প্রধানত প্রতিফলিত হয়। ছাত্রদের দ্বারা সরকারকে যেভাবে উত্ত্যক্ত করা যায়, অন্য কোন পন্থায় তা করা যায় না। বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছি যে, ছাত্ররা তত্ত্বগতভাবে বিভিন্ন তাঁবুতে বিভক্ত। কিন্তু কখনই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত নয়। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং জার্মানির নির্বাচনগুলো দেখলেই তা সুস্পষ্ট হবে। ছাত্ররা নির্বাচন বিষয়ে আলোচনা করে এটা ঠিকই, নির্বাচনে আদর্শগতভাবে পক্ষ-বিপক্ষ থাকে কিন্তু নির্বাচনের ক্রিয়াকাণ্ডের সম্প্রসারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঘটে না।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রসংখ্যাও কম। যারা বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করেছিলেন তারা ভেবেছিলেন এটি একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ হবে, এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই আবাসিক হবে এবং শহর থেকে দূরে থাকার দরুন এখানে কোন আন্দোলন হবে না। কিন্তু এ সমস্ত সবকিছুই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ছাত্রদের ওপর শিক্ষকদের কোন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি, অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাজনীতিবিদদের। শিক্ষকদের নির্দেশে ছাত্র পরিচালিত হয় না, পরিচালিত হয় নেতৃবৃন্দের নির্দেশে। এর ফলে অনেক সময় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক শিক্ষাগত আদর্শ সম্পর্ক না হয়ে রাজনৈতিক সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে যে কথাগুলো উত্থাপিত হয়েছিল এখানে আমি তাই লিখলাম।

৩-১-৭৫

সকালে এম. আই. চৌধুরী এসেছিলেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে উন্নত করবার আশায় আমি বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে যে সমস্ত শিক্ষক এনেছিলাম তাদের মধ্যে এম. আই. চৌধুরী অন্যতম। তিনি সরকারী শিক্ষা বিভাগে ছিলেন এবং দেশ বিভাগের পূর্বে কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজের ভূগোল শিক্ষক ছিলেন, তাঁকে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং প্রফেসর হিসেবে নিযুক্তি দেই। ছাত্র রাজনীতিতে তিনি আমার মতোই চিন্তিত ছিলেন এবং প্রায়ই আমার বাসায় এসে আলোচনা করতেন। বেশ ক'দিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমি যাচ্ছি না দেখে তিনি অনুযোগ করলেন। তিনি বললেন, "আপনি বিশ্ববিদ্যালয়-প্রধান হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অসহযোগ করছেন এটা কি রকম কথা?" আমি উত্তরে বললাম, "গত ডিসেম্বরে হৃদযন্ত্রের অসুবিধার কারণে আমি

www.pathagar.com

পিজি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম আপনি জানেন। তার আগের মাসে আমার ভগ্নীপতির মৃত্যু হয়, একই সময়ে মোজাম্মের নিহত হয়– এসব কারণে আমি মানসিকভাবে খুব স্বস্তিতে নেই। তাছাড়া উপাচার্যের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আমি শিক্ষকতা কর্মে ফিরে যাব ভাবছি।" আমার শেষের কথায় চৌধুরী সাহেব ভীষণ চমকে উঠলেন এবং আমাকে এ সিদ্ধান্ত নিতে বারণ করতে লাগলেন। আমি হাসলাম, কোন উত্তর দিলাম না। স্ত্রীকে নিয়ে বিকেল বেলা শহরের বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত ঘুরে এলাম। এটা আমি মাঝে মাঝেই করি। খোলা বাতাস, উন্মুক্ত আকাশ এবং গাছের পাতায় পাখির বসে থাকা – এগুলো আমার দেখতে ভাল লাগে এবং মন প্রফুল্ল হয়।

৪-১-৭৫

আজ সকালে আমার ব্যক্তিগত সচিব আরজ আলীকে সঙ্গে নিয়ে চেক-আপের জন্য পিজি হাসপাতালে গেলাম। কর্নেল মালিক আমাকে ভালভাবে পরীক্ষা করলেন এবং ইসিজিও করলেন। হাসিমুখে বললেন যে, আমার শরীরে বিশেষ কোন গ্লানি নেই, ভারত ভ্রমণে আমার কোন অসুবিধা হবে না। প্রথম থেকেই মালিক সাহেব আমাকে দেখছেন। ১৯৭২ সালে প্রথম যখন হৃদরোগে আক্রান্ত হই তখন ডাঃ মালিকেরই তত্ত্বাবধানে ছিলাম। প্রায় দেড় মাসকাল হাসপাতালে ছিলাম। তারপরে নিয়মিতভাবে ডাঃ মালিককে দেখিয়ে আসছি।

ধানমণ্ডির বাসায় সাক্ষাৎকারের জন্য কিছু লোক অপেক্ষা করছিল, তাদেরকে একে একে বিদায় দিলাম। ইফতেখারুল আলম এসেছিলেন, তিনি বাংলাদেশ-বুলগেরিয়া মৈত্রী সমিতি স্থাপন করেছেন। কিছুক্ষণ পর ভারতীয় দূতাবাস থেকে বোরা এবং দীক্ষিত এলেন। এদের দু'জনকে নিয়ে দোতলার ড্রইং রুমে গিয়ে বসলাম। দীক্ষিত ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার এবং বোরা মিলিটারী এ্যাটাচী। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ১৯৭১ সালে কলকাতায় বোরার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বোরা বাংলাদেশ বিষয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মুখপাত্র ছিলেন। তার একটি দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশে অত্যাচাররত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা। তাদের কারও কারও মধ্যে নৈতিক বোধ জাগ্রত করা। আশা ছিল যে, নৈতিক বোধ জাগ্রত হওয়ার ফলে পাকিস্তানী সৈন্যদের কারও কারও মনে বিদ্রোহের ভাব জাগবে এবং তারা কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করবে। পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করবার জন্য এ ব্যাপারে যে-সব প্যামফ্লেট তৈরি হয়েছিল তা উর্দুতে আমি লিখেছিলাম। আমি ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত বিষয়টি উর্দুতে বলতাম এবং একজন শিখ অনুলেখক তা শুদ্ধ করে লিখে নিতেন। আমি বলতাম যে, ইসলামের দৃষ্টিতে যা অন্যায় এবং পাপ সে-সমস্ত অন্যায় এবং পাপকর্ম করবার নির্দেশ যদি কেউ পায় সেই নির্দেশ অমান্য করবার অধিকার তার আছে। ইসলাম কখনও ফলবান বৃক্ষকে কর্তন করতে বলে না, শস্যকে ধ্বংস করতে বলে না, গৃহে অগ্নিসংযোগ করতে বলে না এবং নারীধর্ষণ করতে বলে না। ইসলামের বিবেচনায় এগুলো জঘন্যতম অপরাধ। এসব অপরাধ করবার জন্য সাধারণ সৈনিককে যারা নির্দেশ দেন তারা ইসলামের দৃষ্টিতে নিষ্ঠুরতম অপরাধী, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

www.pathagar.com

ঘোষণা করা সাধারণ জোয়ানদের কর্তব্য। আমি জানি না, এই প্যামফ্লেটগুলোতে কোন কাজ হয়েছিল কি-না। বোরা অবশ্য জানিয়েছিলেন এসবে কাজ হয়েছে। কিছু কিছু সৈন্য নাকি বিক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং তাদেরকে পরে ফ্রন্টিয়ারে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের পর বোরার পোস্টিং ঢাকায় হল। আবার আমাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হল। বোরা প্রায়ই আমার বাসায় আসেন। আমাকে তিনি শ্রী অরবিন্দের কয়েকটি বই উপহার দিয়েছিলেন। অরবিন্দের 'উপনিষদ' বইটি আমার খুব কাজে এসেছে। ভারতীয় হাইকমিশনার সুবিমল রায় আমার বাসায় কয়েকদিন এসেছেন। দীক্ষিত এই প্রথমবার এলেন। দীক্ষিত জানালেন যে, তার চলে যাবার সময় হয়েছে। তিনি দিল্লীর ললিতকলা একাডেমী প্রকাশিত 'কাংরা' চিত্রকলার একটি এ্যালবাম আমাকে উপহার দিলেন। দীক্ষিত বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি আমাকে কথায় কথায় বললেন, পার্বত্য জাতিদের মুখোমুখি হয়ে ভারত কোন সুবিধা করতে পারেনি। বাংলাদেশও পারবে বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে কর্তব্য হবে পার্বত্যবাসীদের মনে বিশ্বাস এনে দেয়া যে – সরকার তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। তাদের বিশেষ কিছু সুবিধা দিতে হবে, যা অন্য এলাকার লোকেরা ভোগ করে না। দীক্ষিত এবং বোরার মধ্যে পার্থক্য এই দেখলাম – বোরা রাজনীতির কথা কখনও বলেন না, কিন্তু দীক্ষিত রাজনীতির কথা বলেন।

বিকেল বেলা আহমদ পাবলিশিং হাউজের মহিউদ্দিন আহমেদ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এমনিই আমার কুশল জানতে এসেছেন। ভদ্রলোক দয়ার্দ্রচিত্ত, শান্ত এবং ধর্মপ্রাণ। ফররুখের দুর্দিনে ফররুখকে সাহায্য করবার চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ফররুখ যখন আমার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে ফেলেন তখন মহিউদ্দিন সাহেবই আমাকে ফররুখ আহমেদের খবর এনে দিতেন। কেন জানি বিপুল একটি অভিমানে ফররুখ আমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়েছিল। আজও মীমাংসা করতে পারিনি যে ফররুখের এই অভিমানের কারণ কি? পাকিস্তান সম্পর্কে ফররুখের একটি স্বপ্ন ছিল। সে স্বপ্ন যখন ভেঙে গেল তখন সে হতাশ হয়ে পড়ল। নিজেকে সে আর সামাজিকভাবে সময়ের উপযোগী করতে চাইল না। সন্ধ্যার পর সিকানদার আবু জাফর এল। তাকে খুব বিধ্বস্ত মনে হল। আমি সে কথা বলতেই সিকানদার ক্রোধে ফেটে পড়ল। সে বলল, "তুমি কি মুহূর্তের জন্য ভেবেছ, দেশটি কি রকম বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশপ্রেমিক নিষ্পাপ কতগুলো মানুষ এজন্যই কি প্রাণ দিয়েছিল? কোথাও শৃংখলা নেই, সর্বত্র অব্যবস্থা এবং প্রতিদিন শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। বল, এই কি আমরা চেয়েছিলাম! দেশ পরিচালনার জন্য ন্যূনতম যে বিবেকের প্রয়োজন সেই বিবেক কি আমাদের কর্তাব্যক্তিদের আছে?" সিকানদারের কথার আমি কোন উত্তর দিলাম না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে সিকানদারের একটা আশা এবং মোহ ছিল। তার ট্রাজেডী হচ্ছে যে, দেশগড়ার কাজে তার উপদেশ কেউ গ্রহণ করল না। নানা ধরনের পরিকল্পনা তার ছিল। আমার সঙ্গে সে কখনও কখনও এসব বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করত। কিন্তু যখন দেখত যে, কার্যক্ষেত্রে শুধু নৈরাজ্যই দেখা যাচ্ছে তখন সে বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ত।

www.pathagar.com

আমি সিকান্দারকে বললাম, "দেশের কর্তাব্যক্তি তো তোমার বন্ধু, তুমি তার কাছে ক্ষোভ প্রকাশ কর না কেন?" সিকানদার বলল, "আমি কি করিনি ভেবেছ, কিন্তু আমার কথায় সে গুরুত্ব দেয়নি। আমার সব কথা শুনে সে কি বলল জান? সে বলল, রাজনীতিটা আমার, ওটা আমার ওপরই ছেড়ে দে। আর সাহিত্যটা তোর, তুই ওটা নিয়েই থাক। আর মন যদি বেশি খারাপ থাকে তাহলে বল মিষ্টি আনিয়ে দিচ্ছি। মিষ্টি খেয়ে বাড়ি চলে যা।" সিকানদার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "এ দেশে কিছুই হবে না।"

৫-১-৭৫

আজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গেলাম। ইউসুফের সঙ্গে দেখা হল। সেখানে টাঙ্গাইলের আবদুল মান্নানও ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন আবদুল মান্নান। সেই সুবাদেই আবদুল মান্নানের সঙ্গে আমার পরিচয়। আমি ইউসুফকে জানালাম যে, আমার ছুটির সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্মের দায়িত্ব কোষাধ্যক্ষের ওপর ন্যস্ত থাকবে। তিনি অস্থায়ীভাবে উপাচার্যের দায়িত্বে থাকবেন না। তিনি কোষাধ্যক্ষ হিসেবেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাজকর্ম দেখবেন। ইউসুফকে আমি লিখিতভাবে আমার সিদ্ধান্ত জানালাম। পরে হেসে বললাম, "আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা হঠাৎ কিছু করে বস না। আমি ফিরে এলে যা করার তা করা যাবে।" আমি আমার পদত্যাগের বিষয়টি এখানে ইঙ্গিত করলাম। আমার কথায় ইউসুফ বিব্রত বোধ করল বলে মনে হল। সে একবার মান্নানের দিকে তাকাল, একবার আমার দিকে। তারপর অন্যমনস্কভাবে টেবিলের কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে লাগল। আমি বুঝলাম যে, আমার সম্পর্কে সরকারীভাবে কিছু আলাপ আলোচনা হয়েছে তা সম্ভবত আমার পদত্যাগ সম্পর্কে। আমি এ নিয়ে আর কথা বাড়ালাম না। ইউসুফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

বিকেল বেলা হোসেনী দালান রোডে আমার ভাই আলী রেজার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। রেজা অল্প অবস্থা থেকে নিজেকে বড় করে তুলেছে। ব্যক্তিগত সাধনা এবং পরিশ্রমের সাহায্যে সে নিজেকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আত্মীয়-স্বজনরা প্রথম প্রথম ভাবত যে, রেজার কিছুই হবে না। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে রেজা আজ সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত।

রাতে গোপীবাগে বাবলুর ওখানে দাওয়াত ছিল। বাবলু আমার বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কিছু অসুবিধার কথা জানত। আমি মাসখানেকের জন্য ইন্ডিয়াতে যাচ্ছি শুনে সে হঠাৎ বলল. "এ সময়টায় আপনার চলে যাওয়াটা কি ঠিক? আপনার অনুপস্থিতিতে তো অনেক কিছুই হয়ে যেতে পারে।" আমি হেসে বললাম. "যা হবার তা হবে. আমি থাকলেও তা ঠেকাতে পারব না। সুতরাং আমার এখানে থাকা না থাকায় কিছু আসে যায় না। সরকারের যা সিদ্ধান্ত নেবার আমার মনে হয় তা তারা নিয়ে বসেছে এবং তাদের সময়মত তারা তা ঘোষণা করবে।" বাবলু আবার বলল, "আপনাকে নিয়ে অসুবিধা হচ্ছে আপনি তাল মিলিয়ে চলতে জানেন না। আমার স্ত্রী এর উত্তরে বললেন, "মানুষের রেজেকের মালিক আল্লাহ, সুতরাং অন্যায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চাকরি বজায়

www.pathagar.com

রাখতেই হবে– এটা কোন কথাই নয়। এ চাকরি যদি যায় যাবে, আল্লাহ তায়ালা অন্য একটা ব্যবস্থা করবেনই।" আমার স্ত্রীর এই নিশ্চিন্ততায় তার ভাই বাবলু খুশি হতে পারল না।

বাসায় ফিরে এসে দেখি ধানমণ্ডির একজন মহিলা সমাজকর্মী আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। রাত তখন সাড়ে ৯টা। মহিলা ধানমণ্ডির একটি পরিত্যক্ত বাড়ি দখল করে সমাজসেবামূলক কাজের ঘোষণা দিয়েছিলেন। সম্প্রতি পুলিশ এসে তার কাজে বাধা দিয়েছে এবং বাড়ি থেকে তাকে উৎখাত করেছে। ভদ্রমহিলা এসেছেন আমার সাহায্য চাইতে। আমি তার অপারগতা জ্ঞাপন করলাম এবং অনুরোধ করলাম ভবিষ্যতে তিনি যেন আমাকে বিরক্ত না করেন। ভদ্রমহিলার আসল উদ্দেশ্য ছিল সমাজকর্মের নামে বাড়িটার দখল নেয়া।

৬-১-৭৫

সকালে ডঃ সিরাজুল হক এলেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি আমার শিক্ষক, তাকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করি। তাকে আমি বললাম যে, আমার অনুপস্থিতিতে তিনি কোষাধ্যক্ষ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে থাকবেন। তাকে শুধু দৈনন্দিন কাজকর্ম দেখে যেতে হবে। সিন্ডিকেট, ফাইন্যান্স কমিটি বা একাডেমিক কাউন্সিল এগুলোর কোন মিটিং এ সময় অনুষ্ঠিত হবে না। সিরাজুল হক সাহেব এতে খুশিই হলেন। তিনি বললেন, "আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, আপনার অনুপস্থিতিতে সবকিছু যাতে ঠিকমত চলে সে ব্যাপারে আমি নজর রাখব। আমি তাকে অনুরোধ করলাম তিনি যেন আমার বাসার দিকে খেয়াল রাখেন। আমার ছেলেমেয়েরা রইল, তারা কি রকম থাকে না-থাকে সেজন্য তিনি যেন মাঝেমাঝে খোঁজ-খবর নেন। পরের দিন দুপুরে আমি সিরাজুল হক সাহেবকে আমার সঙ্গে যেতে বললাম।

সিরাজুল হক সাহেব অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, সত্যবাদী এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। আরবি এবং ফারসিতে তার পাণ্ডিত্য অগাধ। ধর্মের কোন গোঁড়ামি তার মধ্যে নেই। তিনি যুক্তিবাদী মানুষ। ইবনে তাইমিয়ার ওপর গবেষণা করে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি পেয়েছিলেন। তাইমিয়া মুক্তচিন্তার অধিকারী ছিলেন। হাদীসের যথার্থ তাৎপর্য নির্মাণে এবং ব্যাখ্যা-সূত্র নির্মাণে তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাইমিয়াকে অবলম্বন করে আরব দেশসমূহের কোন কোন জায়গায় বিশেষ মতাদর্শ গড়ে উঠেছে তা আমরা জানি; বিশেষ করে আরব ভূখণ্ডের আবদুল ওয়াহাব নজদি তাইমিয়ার অনুশাসনকে মান্য করে একটি চিন্তাধারা প্রবর্তন করেন, যা ওয়াহাবী মতবাদ বলে পরিচিত। সিরাজুল হক সাহেব এ মতবাদের লোক নন, কিন্তু তাইমিয়ার বিশ্লেষণের প্রতি তার শ্রদ্ধা আছে। সিরাজুল হক সাহেব রাজা রামমোহন রায়ের 'তুহ্ফাতুল মুয়াহহেদিন' আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন এবং কিছু অংশ আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর মত। আমার শৈশব থেকেই তিনি আমাকে জানেন। তাঁর স্ত্রী আমার শিক্ষক মরহুম ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জ্যেষ্ঠ কন্যা।

www.pathagar.com

সিরাজুল হক সাহেবকে আমার বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেবার ব্যাপারে আমি কিছুই জানাইনি। আমার আচরণে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারেননি যে, আমি কি সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি। তিনি একটি ব্যাপারে সব সময় আমাকে প্রশংসা করতেন যে, দুর্যোগের মধ্যেও আমি কেমন যেন নিস্পৃহ এবং নিশ্চিত থাকি। কথাটি পুরোপুরি সত্য নয়। আসলে আমার চিত্ত অধীর হয়, আমিও অস্থির হই, কিন্তু সেই অস্থিরতা বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ পেতে দিই না। এক্ষেত্রে সব সময় আমার স্ত্রী আমার জন্য বিরাট এক সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন। আল্লাহর ওপর তার অসাধারণ নির্ভরতা আমাকে সাহস দেয়, আশ্বাস দেয়।

৭-১-৭৫

দুপুরে সিরাজুল হক সাহেব খেতে এলেন। বাইরের আর কাউকে আমি ডাকিনি। আমার স্ত্রী অনেক রকম খাবারের আয়োজন করেছিলেন। তিন-চার রকমের মাছ ছিল – পাবদা, রুই এবং বাঁশপাতা, গোশত ছিল দু'রকমের – মুরগী এবং খাসী। সঙ্গে ডাল এবং সব্জিও ছিল। সিরাজুল হক সাহেব তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন। খাওয়া আরম্ভ করার আগে একটি দোয়া পড়ে নিলেন। খ্রিস্টান সমাজে খাদ্য গ্রহণের আগে প্রার্থনা করবার রীতি আছে। আমরা খাদ্য গ্রহণের আগে 'বিসমিল্লাহ' বলি, কিন্তু সিরাজুল হক সাহেব একটি লম্বা দোয়া পড়লেন কিছুটা সময় নিয়ে। খাওয়া শেষ হলে আমরা ড্রইং রুমে গিয়ে বসলাম, সিরাজুল হক সাহেব রাসূলে খোদার খাদ্য স্বভাবের কথা বললেন। তিনি বললেন, "রাসূলে খোদা ছিলেন অত্যন্ত স্বল্পাহারী, উদরপূর্তি করে তিনি কখনও খেতেন না। যতটুকুই না হলে নয় ততটুকুই তিনি খেতেন। খাদ্যের উপকরণ ছিল খুবই পরিমিত। রুটি, গোশ্‌ত এবং তরকারী খেতেন, টাটকা খেজুর খেতেন,কালো জিরা খেতেন এবং মধু খেতেন, দুধও খেতেন। সারা দিনে এই ছিল তার আহার। আমরা জানি জীবনে কখনও কখনও তিনি না খেয়ে থেকেছেন এবং অর্ধাহারে থেকেছেন। খাদ্যটা তাঁর কাছে কোন বিলাস ছিল না। প্রাণ ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন এবং তা ছিল পরিচ্ছন্ন এবং শুদ্ধ। আমরা কিন্তু খাদ্য-স্বভাবে রাসূলের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি।"

আমি বললাম, "নানা রকম খাবার গ্রহণে কোন প্রকার নিষেধ তো ইসলামে নেই, ইসলামে কিছু খাবার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু হালাল খাবারের ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তাছাড়া দেশ ও ক্ষেত্রভেদে খাদ্য-স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে। একেক দেশে একেক রকম খাবার। আরব দেশে খাদ্য বিষয়ক কোন কৌলিন্য গড়ে ওঠেনি। খাদ্য গ্রহণ এবং পরিবেশনটা সভ্যতা এবং সংস্কৃতির একটা অঙ্গ। মুসলমানরা পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছে সেখানেই খাদ্য বিষয়ে বিপ্লব ঘটিয়েছে। তাই আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে একা যখন খাই তখন খুব যে বেশি খাই তা নয়। সাধারণত আমি তিনটি পদ দিয়ে খেয়ে উঠি। কিন্তু যখন অতিথিকে আপ্যায়ন করি তখন অনেকগুলো পদের ব্যবস্থা করি।"

আমি এ কথা বলে একটু হাসলাম। সিরাজুল হক সাহেব একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, "আমি কিন্তু আপনাকে সমালোচনা করিনি, বরঞ্চ অনেক খাবার সামনে এনে

www.pathagar.com

আপনি আমাকে অনেক সম্মান দেখিয়েছেন। আমি যা বলতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে এই, রাসূলে খোদা পরিমিতিবোধকে গুরুত্ব দিতেন এবং খাদ্য গ্রহণ ও পরিবেশনায় পরিচ্ছন্নতা কামনা করতেন। আমার মনে হয়, এই পরিচ্ছন্নতাটা খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ – হাত ধুয়ে খেতে বসা, প্রয়োজন মত প্লেটে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা এবং খাবার শেষে পাত্রটি পরিষ্কার করে ফেলা এটা রাসূলের নির্দেশ। এটা ঠিকমত মানতে পারলে আমরা ভাল কাজ করব।"

সিরাজুল হক সাহেব জানালেন যে, পরের দিন তিনি আমার সঙ্গে এয়ারপোর্টে যাবেন। আমি বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি জানালেন যে, ওটা তার কর্তব্য। আমি কথা আর বাড়ালাম না।

বিকেল বেলা শামিম এল। শামিম আমার শ্যালক, আমার স্ত্রীর খালাতো ভাই। সে চট্টগ্রামে আমার কাছে থেকেই পড়াশুনা করছে এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার সাথে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছিল। সে অর্থনীতিতে এম. এ পাস করেছে এবং বর্তমানে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ভাল মাইনেতে চাকরি করে। শামিম ধীরে ধীরে কথা বলে এবং যা বলে তা ব্যাখ্যা করে বলবার চেষ্টা করে। তার এই অভ্যাস আমার কাছে কৌতুকের মনে হয়। তার বিয়ের ব্যাপারে কিছু কথা-বার্তা হল, সে হেসে বিয়ের কথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল। জিজ্ঞেস করলাম, "কোন মেয়ের প্রতি আকর্ষণ আছে কি-না?" সে হাসল কিন্তু কথা বলল না।

কয়েক দিন হল আমার মেয়ে নাসরিন চট্টগ্রাম থেকে ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছে। আমার অনুপস্থিতিতে সে বাড়ি দেখাশুনা করবে। সম্ভাব্য একটি সংকটের মুখে তাকে রেখে যাচ্ছি বলে চিন্তা হচ্ছিল। আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে, আমার অনুপস্থিতিতে সরকার যদি আমার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়, তবে সে যেন নিশ্চিন্ত থাকে। আমি তাকে আশ্বাস দিলাম যে, আমি ফিরে আসার পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

আজ সকালে কলকাতায় এলাম। বিমান বন্দরে বাংলাদেশের ডিপুটি হাই কমিশনারের অফিস থেকে গাড়ি এসেছিল। সে গাড়িতে করে বালিগঞ্জ গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে এলাম। এখানেই আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। কেন্দ্রের ব্যবস্থাপকরা আমাদের জন্য নীচতলায় একটা স্যুইটের ব্যবস্থা করেছেন। মিশনের লোকেরা আমার পূর্ব পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এখানে আমি কয়েকবার এসেছি এবং বক্তৃতা করেছি। আমার জামাতা ডঃ কোরেশী সে সময় মিশনের স্বামীজীর বদান্যতায় এখানে অতিথি হিসেবে ছিলেন। মিশনে আসবার পথে একটি ব্যাংকে কিছুক্ষণের জন্য ট্রাভেলার্স চেক ভেঙে নিয়েছিলাম।

বিকেল বেলায় ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ডঃ জালাল এলেন। তাঁর সঙ্গে সালাহউদ্দিন ছিল। সালাহউদ্দিন একটি সেমিনারে যোগ দেবে বলে কলকাতায় এসেছিল। সে ঢাকার খবর জানতে চাইলে আমি আমার পদত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা তাকে জানালাম। সে খবরে খুশি হল। সে বলল, "আমি অনেকদিন ভেবেছি যে আপনাকে পদত্যাগ করতে বলব, কিন্তু আপনি ভুল বুঝবেন এ ভয়ে বলিনি। দেশকে আপনার কিছু দেবার আছে। কিন্তু প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড থেকে তা আপনি দিতে

www.pathagar.com

পারছিলেন না। এখন প্রচুর সময় পাবেন এবং লেখাপড়ার মধ্য দিয়ে আপনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারবেন।" সালাহউদ্দিন এবং জালাল কিছুটা সময় আমার সাথে কাটালেন। তাঁরা চলে গেলে আমি সুশীল ভদ্রকে টেলিফোনে খবর দিলাম। সুশীল মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কলকাতায় আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছে। সে সময়ে সকালে সুতারকিন স্ট্রীটে আসতাম। সেখানে বাংলাদেশ আরকাইভসের অফিস ছিল। আমি আরকাইভসের সভাপতি ছিলাম। দুপুর বেলা সুনীল সেখানে আসত। সেখান থেকে আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়তাম। কোনদিন সাঙ্গুভ্যালিতে দুপুরের খাবার খেতাম, আবার কোনদিন সুশীল মানিকতলায় তার বাসায় আমাকে নিয়ে যেত। সেখানে তার সঙ্গে বসে খেতাম। সুশীলের বাড়ি যশোর। যশোর থেকে সুশীলরা চলে এসেছিল দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে। সুশীল বিয়ে করেনি এবং সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে এম. এন. রায়ের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে রেখেছিল। সুশীল এল, সঙ্গে কিছু খাবারও নিয়ে এসেছে। আমরা কথা বলছিলাম এমন সময় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ভদ্রলোক সব সময় লেখাপড়া নিয়ে থাকেন। তাঁর গবেষণার বিষয় হচ্ছে 'নিম্নস্তরের মানুষের শব্দ ব্যবহারের রীতি'। কয়েক বছর আগে ডঃ ভক্তিপ্রসাদের অনুরোধে আমি সংস্কৃত কলেজে একটি বক্তৃতা করেছিলাম। বক্তৃতার বিষয় ছিল – 'বাংলাদেশের সাহিত্য এবং সংস্কৃতি'। আমার সেদিনকার সভায় প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। সেদিন আমি বক্তৃতা দিয়ে খুবই তৃপ্তি পেয়েছিলাম। বক্তৃতার শেষে কলেজের অধ্যক্ষ আমার ভাষা এবং বক্তৃতা সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। বলেছিলেন যে, আমার দীর্ঘ পঞ্চাশ মিনিটের বক্তৃতার মধ্যে তিনি একটিও ব্যাকরণগত বিচ্যুতি পাননি; তাছাড়া আমার শব্দ ব্যবহারে বাংলার সঙ্গে বিদেশী শব্দের মিশ্রণ একটিও ছিল না। আমি হেসে অধ্যক্ষকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেছিলাম, "যেহেতু আমি সংস্কৃতি কলেজে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের সামনে বক্তৃতা করছি সেহেতু আমাকে খুব সজাগ থেকে কথা বলতে হয়েছে।" ভক্তিপ্রসাদ জানালেন যে, তিনি শিগগিরই পূর্ব জার্মানিতে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক একটি সেমিনারে যোগ দিতে যাচ্ছেন।

সন্ধ্যার সময় বিল্টুর এক ব্যবসায়িক বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। কবি জগদীশ ভট্টাচার্যকে টেলিফোন করলাম, কিন্তু তিনি জানালেন যে তিনি অসুস্থ। শান্তিনিকেতনে টেলিফোন করে ডঃ প্রবোধ সেনের কুশল জিজ্ঞেস করলাম। আমি টেলিফোন করায় তিনি অসম্ভব খুশি হলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপনি এখনও শৃঙ্খলাবদ্ধ আছেন? কবে শৃঙ্খল ভাঙবেন?" আমি উত্তরে বললাম, "আমার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে। ফিরে গিয়েই শিক্ষকতা কর্মে যোগ দেব।" আমার এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে তিনি খুব খুশি হলেন, বললেন, "প্রশাসনিক কর্মে ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, কিন্তু শিক্ষকতা কর্মে কর্মসাধনের তৃপ্তিতেই ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়।"

৯-১-৭৫

আজও আমাকে কলকাতায় থাকতে হবে। আগামীকাল নাগপুর যাব। সকাল বেলা ডঃ বরুণ দে-কে টেলিফোন করলাম। তিনি বাসায় আমাকে সস্ত্রীক আজ রাতে খেতে বললেন। বরুণ দে ইতিহাসের লোক। মুক্তিযুদ্ধের সময়, ১৯৭১ সালে তিনি 'ভারত-

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি চেষ্টা করেছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কিছু কর্মসংস্থান করে দেয়া। এ ব্যাপারে তাঁকে খুব ব্যস্ততা প্রকাশ করতে দেখেছি। তিনি প্রায়ই বলতেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজনের অস্থায়ীভাবে চাকরি হতে পারে। আবার কখনও কখনও বলতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের আওতায় কারও কারও চাকরির ব্যবস্থা হবে, কিন্তু কোন কিছুই হয়নি। আমি শুধু তাঁর ব্যস্ততা উপভোগ করেছি। বরুণ দে তখন কলকাতায় দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক একটি ইনস্টিটিউটের পরিচালক। ডঃ সালাহউদ্দিনের কাছে শুনেছি যে বরুণ দে একজন উদারচেতা এবং অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি।

সুশীল মুখার্জীকে টেলিফোন করলাম। ভদ্রলোক একটি প্রকাশনা সংস্থার সাথে জড়িত। সুশীল ভদ্রের মত ইনিও মানবেন্দ্রনাথের দলের লোক। তবে সুনীল যেমন উদার, মুখার্জী সে রকম নন। এঁর মধ্যে একটু সংকীর্ণতার আভাস পাওয়া যায়। অর্থাৎ চলাফেরায় কথাবার্তায় তিনি যে হিন্দু তা অনুভব করা যায়। এটা কিভাবে অনুভব করা গেল তা আমি বোঝাতে পারব না। কিন্তু তার আচরণে মনে হয়েছে তিনি কিছুটা ব্যবধান রেখে আমার সঙ্গে মিশেছেন। মুখার্জী তাঁর বাসায় যেতে বললেন। উনি থাকেন লেক প্রেসে। আজকের দিনের মধ্যে আমি সময় করে উঠতে পারব না জানালাম। জাস্টিস মাসুদকে টেলিফোন করলাম। তিনি বিকেল বেলায় তাঁর বাসায় যেতে বললেন। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলাম বিকেল বেলা নাসিরউদ্দিন রোডে মাসুদ সাহেবের ওখানে হয়ে বরুণ দে-র ফ্ল্যাটে যাব। মুক্তিযুদ্ধের সময় জাস্টিস মাসুদ আমাদের জন্য বিরাট এক সহায়ক শক্তি ছিলেন। বাংলাদেশ থেকে আগত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের দু'একজনকে বাসস্থান খুঁজে দিয়েছেন এবং কাউকে কাউকে অর্থ সাহায্যও করেছেন। শওকত ওসমান তো মাসুদ সাহেবের বাড়িতেই ছিলেন। অবশ্য ব্যক্তিগত জীবনে মাসুদ সাহেব এবং শওকত পরস্পরের বন্ধু। বিদেশ থেকে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের জন্য যে অর্থ-সাহায্য আমি আনতে পেরেছিলাম সে কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন মাসুদ সাহেব।

সুশীল ভদ্রের কাছে শুনলাম অম্লান এখন কলকাতায়। কিন্তু অম্লানের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল না। অম্লান দত্ত একজন খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ এবং সে সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে কাজ করছিলেন। অম্লানের আর একটি পরিচয় তিনি ঢাকার আরমানিটোলা স্কুলের ছাত্র এবং আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আলী আশরাফের সহপাঠী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় কয়েকবার অম্লানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। একবার নিখিল বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে আমি প্রধান অতিথি ছিলাম এবং অম্লান বিশেষ অতিথি।

বিকেল বেলা পনেরো নম্বর নাসিরউদ্দিন রোডে মাসুদ সাহেবের বাসায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে পাঁচ নম্বর পার্ল রোডে আবু সয়ীদ আইয়ূবের সঙ্গে দেখা করতে এলাম। গৌরী আইয়ূব আমাদেরকে ড্রইং রুমে বসালেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় একটি কথা হয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত 'ওয়েস্ট' পত্রিকায় আইয়ূব সাহেব বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখবেন। কিন্তু পত্রিকার সেই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়নি। আইয়ূব

www.pathagar.com

সাহেব একজন সংকল্পবদ্ধ সুস্থির দার্শনিক। তিনি সত্যিকারভাবে একজন প্রজ্ঞাবান পুরুষ। যদিও সাহিত্য তাঁর ক্ষেত্র নয়, কিন্তু সাহিত্যকে তিনি তাঁর প্রধান অভিরুচি করেছিলেন। যুক্তিবাদী ভাষার তীক্ষ্ণ বিন্যাসে তিনি তাঁর বক্তব্যকে যেভাবে প্রকাশ করেছেন তা নিঃসংশয়ে অসাধারণ। এক কথায় তাঁকে একজন সমৃদ্ধমান পুরুষ বলা যায়। তিনি আমাদের উভয়কেই সাদরে গ্রহণ করলেন। গৌরী আইয়ূবের নির্দেশ মত আমরা তাঁকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করলাম না। তার সার্বক্ষণিক একটা অসুস্থতা আছে, যে জন্য তাকে সময় হিসেব করে চলতে হয়।

আইয়ূব সাহেবের ওখান থেকে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে বরুণ দে-র বাসায় গেলাম।

১০-১-৭৫

আজ আমি নাগপুরে। আমাদের থাকবার জায়গা হয়েছে একটি কলেজ হোস্টেলে। একটি লম্বা করিডোর, তার দু'পাশে রাত্রিযাপনের কক্ষ। করিডোরের পূর্বপার্শ্বে ডানদিকের ঘরটি আমরা পেয়েছিলাম, সঙ্গে বাথরুমও ছিল। আমাদের ঘরের মুখোমুখি ঘরটি পেয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। এটা অবশ্য জেনেছিলাম পরে। হোস্টেলের সামনে বিরাট একটি চত্বর, সেখানে সামিয়ানা টাঙিয়ে খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুপুরে আমরা ঘর থেকে যখন বেরোলাম তখন সামিয়ানার সামনে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে দেখলাম। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন তাঁকে বেশ সচ্ছল এবং বিত্তবান মনে হল আমার। তাঁর পরনে ছিল জরির পাড়ওয়ালা ধুতি এবং কাঁধে জরির পাড়ওয়ালা চাদর। তাঁর পায়ের মোকাসিন জোড়া খুব চকচক করছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র আমার কুশল জিজ্ঞেস করলেন এবং পাশের ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এঁকে চেনেন?' আমি 'না' বলতেই প্রেমেন্দ্র মিত্র অবাক হওয়ার ভান করলেন "সেকি মশাই! এঁকে চেনেন না – ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত বিমল মিত্তির।" আমি হাসি মুখে বললাম, "বিমলবাবুর পরিচয় পেয়ে খুশি হলাম। এঁর লেখা আমি পড়েছি। কিন্তু হিন্দী সম্মেলনে ইনি কেন?" প্রেমেন্দ্র মিত্র উত্তরে বললেন, "হিন্দী সম্মেলনে ইনি আসবেন না তো কে আসবেন? হিন্দী এঁকে বিত্ত দিয়েছে, সম্মান দিয়েছে এবং সর্বভারতে পরিচয় করিয়েছে। হিন্দীতে এঁর বই সিনেমা হয়েছে যাতে ইনি বিপুল অর্থের অধিকারী হয়েছেন। আর আপনি মধ্যযুগের হিন্দী নিয়ে কাজ করেছেন। আর আমার কথা যদি বলেন আমি তো হিন্দীর ধারে-কাছেও নেই। সুতরাং মিত্তির মশাই এ সম্মেলনে আসবার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি।" প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথায় আমরা সবাই হেসে উঠলাম। বিমল মিত্র কিন্তু বিব্রতবোধ করলেন না। তিনি হাসিমুখে আমাকে করজোড়ে নমস্কার করলেন। এ সময় আরেক ভদ্রলোক এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ইনি দিল্লীস্থ ভারতীয় সাহিত্য একাডেমীর মুখ্য সচিব প্রভাকর মাচওয়ে। এঁর সঙ্গে আগে আমার পরিচয় ছিল না। ভদ্রলোকের গায়ের রং উজ্জ্বল, পাতলা চেহারা এবং খুব হাসি-খুশি। আমার পরিচয় পেয়ে খুশি হলেন এবং দিল্লীর সাহিত্য একাডেমীতে আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। আমি বললাম, "আমি এখান থেকে দিল্লীতে অবশ্যই যাব, সেখানে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি ভবনে থাকব। সময় পেলে সাহিত্য একাডেমীতে যাবার চেষ্টা করব।"

www.pathagar.com

এরপর আমরা দুপুরের আহারের জন্য সামিয়ানার ভেতরে গেলাম। সেখানে টেবিলভর্তি যে সমস্ত খাদ্যসামগ্রী রয়েছে সবই দেখলাম নিরামিষ। আমার স্ত্রীর নিরামিষে বিরাগ নেই; আমিও অল্প-স্বল্প নিলাম। ইতিমধ্যে দেখি, প্রেমেন্দ্র মিত্র সেখানে নেই, কিছুক্ষণ পর তিনি এলেন। তাঁর প্লেটভর্তি আমিষ খাবার। তিনি বললেন, "মশাই, এসব ঘাসপাতা কি খাবেন, সামনে ডান দিকে পর্দার আড়ালে প্রচুর আমিষ আছে, নিয়ে আসুন – কুক্কুট আছে, মেষ আছে, অবশ্য আপনার যেটা পছন্দ সেটা নেবেন।" আমি আমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আমিষ ঘরে গেলাম। সেখানে চিকেন রোস্ট ছিল, মার্টন কোপ্তা ছিল এবং মোটর-পনির ছিল। আমি আমার সাধ্যমত কিছু খাবার তুলে নিলাম, স্ত্রীর অসুবিধা হচ্ছিল, তিনি তার পাতে বেশি নিরামিষ তুলে নিয়েছিলেন। নাগপুরের রান্নাটা আমার ভালই লাগল। রান্নায় তেল ব্যবহার করা হয়নি, মোষের ঘি ব্যবহার করা হয়েছে। মোষের ঘি-র একটা আকর্ষণীয় সুগন্ধ আছে।

খাবারের জায়গা থেকে বেরিয়ে বিশ্রামের জন্য হোস্টেলে যাব। এসময় ডঃ বাৎসায়নের সঙ্গে দেখা হল। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল টোকিওতে, ১৯৫৭ সালে। তখন তিনি রকফেলার ফাউন্ডেশনের একটা বৃত্তি নিয়ে জাপানি জীবনধারা সম্পর্কে অনুসন্ধান করছিলেন। দীর্ঘ দিন পর দেখা। প্রথমে একে অন্যকে চিনতে অসুবিধা হচ্ছিল। পরে পরিচয় হলে আমরা খুবই খুশি হলাম। বাৎসায়ন হাসিমুখে বললেন, "পৃথিবীতে কেউ কাউকে হারায় না। আমরা একে অন্যকে একবার না একবার খুঁজে পাবই। সব সময় হয়তো শারীরিকভাবে পাব না, কিন্তু মানসিকভাবে পেতে পারি, চিন্তার মধ্যে পেতে পারি এবং নানাবিধ ইচ্ছার মধ্যে পেতে পারি।" বাৎসায়ন দার্শনিকভাবে কথা বলতে ভালবাসেন। তিনি খুব ধীর-স্থির এবং শান্ত। নাগপুরের অনুষ্ঠানে দেখলাম যে সকলেই তাঁকে অত্যন্ত সম্ভ্রম করেন।

বিকেল বেলা একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি একজন স্থানীয় জমিদার। প্রচুর জমিজমা আছে এবং নাগপুরে প্রতাপের সঙ্গে বসবাস করেন। তিনি বললেন, "খবরের কাগজে আমার নাম দেখে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। তিনি নাগপুরের শহরতলীতে নিজস্ব বাড়িতে থাকেন। আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে তিনি তাঁর বাসায় একটি ডিনারে যোগ দিতে বললেন। আমি যে অনুষ্ঠানসূচী পেয়েছি তাতে দেখা গেল যে রাত অথবা দুপুরে খাবারের কোন ফাঁক নেই। ঠিক হল পরের দিন সকাল বেলার নাশতা ভদ্রলোকের সঙ্গে করব। তিনি সকাল সাড়ে সাতটায় গাড়ি নিয়ে আসবেন।

সন্ধ্যায় ডঃ ধর্মবীর ভারতীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। এঁর নামের সঙ্গে আমি পূর্বেই পরিচিত ছিলাম। ইনি 'চর্যাগীতিকা'র ওপর হিন্দী ভাষায় একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। ইনি 'ধর্মযুগ' নামক একটি সাপ্তাহিক হিন্দী পত্রিকার সম্পাদক। ইনি বোম্বাইতে আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন। আমি ১৬ জানুয়ারি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি হিসেবে যাব সে কথা বললাম।

১১-১-৭৫

সকালবেলা নাগপুরের মুসলমান ভদ্রলোক গাড়ি নিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে নগরের উপকণ্ঠে তাঁর বাড়িতে এলাম। প্রায় তিন-চার বিঘা জমির উপর সুদৃশ্য একটি একতলা

www.pathagar.com

বাড়ি। চতুর্দিকে বড় বড় গাছ এবং বাড়ির একপাশে নানা ধরনের ক্যাকটাসের বাগান। ভদ্রলোকের স্ত্রী এবং ছ'-সাত বছরের একটি কন্যা দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা আমাদের স্বাগত জানালেন। নাশতার উপকরণ ছিল অনেক – আলু ভুনা, সামি কাবাব, মুরগীর রেজালা এবং পরোটা। সর্বশেষে ছিল সুস্বাদু ফিরনী। পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছি মুসলমানদের রান্না একটু ভিন্ন স্বাদের মনে হয়েছে। এখানেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ভদ্রলোক খুব দিলখোলা মানুষ। আমি তাঁর খাদ্য রুচির প্রশংসা করায় তিনি খুব হাসলেন।

তাড়াতাড়ি তাঁর বাসা থেকে চলে আসতে হল। কেননা ন'টায় সম্মেলন উদ্বোধন হবে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সম্মেলন উদ্বোধন করবেন। সেখানে বিশেষ অতিথি থাকবেন মরিশাসের রাষ্ট্রপ্রধান মিঃ রামগুলাম।

একটি খোলা মাঠে বিরাট আয়তনের সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অত্যন্ত সুদৃশ্য একটি সভামঞ্চ তৈরি হয়েছে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য অতিথিবর্গ বসবেন। মঞ্চের ডানদিকে একটি প্রশস্ত পথ রাখা হয়েছে, যার একপাশে বিদেশী অতিথিবর্গের সঙ্গে আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে দাঁড়াতে হল। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী মিঃ রামগুলামকে সঙ্গে করে গাড়ি থেকে নামলেন এবং দণ্ডায়মান বিদেশী অতিথিদের সঙ্গে করমর্দন করে তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সভামঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত যে সমস্ত হিন্দী পণ্ডিতগণকে সংবর্ধনা প্রদান করা হবে, তাদেরও মঞ্চে বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সে হিসেবে আমিও মঞ্চে বসেছিলাম। আমাদের প্রত্যেককে একটি করে মানপত্র, একটি করে কারুকার্যখচিত রেশমি শাল এবং সোনার তারে জড়ানো একটি খোসা ছাড়ানো নারকেল উপহার দেয়া হয়েছিল। সম্মেলনের সভাপতি এবং সচিব প্রথাগত বক্তৃতা করলেন এবং তারপর আমাদেরকে একে একে প্রধানমন্ত্রীর সামনে উপস্থিত করা হল। আমরা উপহার গ্রহণ করে প্রত্যেকে দু'মিনিট করে আপনাপন অভিব্যক্তি প্রকাশ করলাম। প্রত্যেকেই হিন্দী ভাষায় বললেন, আমিও হিন্দীতে বললাম। আমি আমার বক্তৃতার মধ্যে জায়সীর কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিলাম, মধ্যযুগীয় কাব্যের উদ্ধৃতি শুনে জনতা সহর্ষে করতালি দিল। লোথার বলে পশ্চিম জার্মানির একজন পণ্ডিত সুন্দর হিন্দীতে তাঁর ভাষণ দিলেন। তিনি বারবার রামমনোহর লোহিয়ার নাম উল্লেখ করলেন। পরে শুনলাম ইনি একজন বিজ্ঞ-বিবেচক পণ্ডিত। হিন্দী এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই ইনি গবেষণা করেছেন। তুরবিয়ানি বলে একজন ইতালীয় পণ্ডিত ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে তাঁর মনের আবেগ প্রকাশ করলেন। মরিশাসের রাষ্ট্রপতি রামগুলাম ইংরেজিতে বক্তৃতা করলেন। ইন্দিরা গান্ধী হিন্দীতে বক্তৃতা করলেন, কিন্তু তার হিন্দী আমার কাছে অনেকটা উর্দুর মত মনে হল। নেহেরু পরিবারের লোকজন যে মুসলমান সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত ইন্দিরা গান্ধীর বক্তৃতা শুনে তা বোঝা গেল।

অনুষ্ঠান শেষে দুপুরবেলা প্রভাকর মাচওয়ে আমাকে তুরবিয়ানীকে এবং রুশ দেশীয় প্রতিনিধিকে বিখ্যাত ব্যবসায়ী ডাল মিয়ার বাড়িতে মধ্যাহ্ন আহারের জন্য নিয়ে এলেন। ডাল মিয়ার বাড়ির দোতলার একটি বিরাট কক্ষে আমরা বসলাম। ঘরটিতে একটিও চেয়ার ছিল না। সমস্ত ঘরে এক হাত উঁচু কাঠের পাটাতনের ওপর নরম গদি

www.pathagar.com

বিছানো এবং তার উপর ধবধবে রেশমি চাদর। সুদৃশ্য গিলাফে ফরাসের ওপর দশ-বারোটা তাকিয়া ছিল। আমরা একেকজন একেকটি তাকিয়া নিয়ে গদির ওপর বসলাম। আমাদের প্রথমেই আদার কুচি এবং লবণ দেয়া হল। তারপর ছোট ছোট গ্লাসে পুদিনা পাতার রস খেতে দেয়া হল। পুদিনা পাতার রসে কিছু মিশ্রণ ছিল। তার ফলে এটি খেতে খুব সুস্বাদু হয়েছিল। খাবার সময়ে আমাদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হল খুব বড় একটি রান্নাঘরের সামনে। আমাদের বসবার জন্য ছোট চৌকোণো বালিশ দেয়া হল এবং প্রত্যেকের সামনে একটি করে মোড়া যেখানে খাবারের থালা থাকবে। ডাল মিয়ার স্ত্রী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে গরম খাবার পরিবেশন করলেন এবং আটার রুটি দিয়ে আমরা সেগুলো খেলাম। খাদ্যসামগ্রী সবটাই নিরামিষ ছিল। একটি তরকারি আমার কাছে খুব ভাল লেগেছিল, সেটি হল নানা রকম সব্জির মিশ্রণে একটি কোরমা। কিন্তু সবচেয়ে ভাল লেগেছিল অতিথিবর্গকে আপ্যায়নের পদ্ধতি। ডাল মিয়ার বাড়িতে আমাদের স্ত্রীরা আমন্ত্রিত ছিলেন না। কেন এটা হয়েছিল বুঝলাম না। আমার স্ত্রী অবশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্ত্রীর সঙ্গে দুপুরের খাবার খেয়েছিলেন। রাত্রে সম্মেলন ক্ষেত্রে রামলীলা অনুষ্ঠান হয়। মঞ্চে রামলীলার কুশলীবৃন্দ নৃত্যের মাধ্যমে রামের জীবন-বৃত্তান্ত উপস্থাপন করল এবং মঞ্চের এক প্রান্তে বসে আবৃত্তিকারের রামচরিত মানস পাঠ আমি কখনও ভুলব না। এ পাঠটিও ছিল একপ্রকার অনবদ্য অভিনয়ের মত। যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে এই পাঠ একটি তন্ময়তার হিল্লোল তুলেছিল। রামায়ণের একটি বিস্ময়কর নাটকীয়তা আছে। তুলসীদাসের মধ্যে এ নাটকীয়তা একটি বিচিত্র ব্যঞ্জনা পেয়েছে। বাংলাতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ কিন্তু এই সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি। তুলসীদাসের রামায়ণ যেমন হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে সর্বতো মধুর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, বাংলা রামায়ণ তা একেবারেই হয় না। বর্তমানকালে বাংলা রামায়ণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সামগ্রী মাত্র। তুলসীদাসের ছন্দোবদ্ধ পদসুরের ব্যঞ্জনায় হিন্দীভাষী পাঠকচিত্তকে সর্বদাই মুগ্ধ করে। হিন্দীভাষী জনতার কাছে তুলসীদাস কখনই পুরনো হয়নি। বিশেষ করে আধুনিক সময়ে নানা ধরনের মঞ্চাভিনয়ের সাহায্যে তুলসীদাসের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন রয়েছে। আমি তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' পড়েছি, সেজন্য এই নৃত্যনাট্য উপভোগে আমার কোন অসুবিধা হয়নি। উচ্চারিত সুললিত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে অভিনয় যখন চলছিল তখন আমার স্ত্রীকে দু'একটি দৃশ্য আমি বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। নাগপুরের হিন্দী সম্মেলনের আর কিছু আমার মনে না থাকুক, কিন্তু রামলীলা দীর্ঘদিন আমার মনে থাকবে।

১২-১-৭৫

বিশ্ব হিন্দী সম্মেলনে আমি এসেছি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে, দর্শক হিসেবে অবস্থান গ্রহণ করতে নয়। ঢাকায় সম্মেলন কর্তৃপক্ষের যে চিঠি পেয়েছিলাম তাতেও অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ ছিল। সে হিসেবে আমি একটি প্রবন্ধ তৈরি করেছিলাম হিন্দী অবধী প্রবাদ বিষয়ে। আমি যথেষ্ট পরিশ্রম করে প্রবন্ধটা রচনা করেছিলাম। কিন্তু এখানে এসে দেখতে পেলাম যে সামগ্রিকভাবে সম্মেলনটি একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এখানে সাহিত্য ও ভাষা বিষয়ে কোন প্রকার আলোচনা করবার সুযোগ

www.pathagar.com

নেই। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ বিশ্ব ভাষা হিসেবে হিন্দী ভাষার সম্ভাবনা, রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি স্বীকৃত ভাষারূপে হিন্দীকে মর্যাদাদান, ভারতের সকল অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র সংযোগ ভাষা হিসেবে হিন্দীর প্রতিষ্ঠা। এছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয় ছিল যেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভারতের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত ভারতীয়রা আছে তাদের মধ্যে হিন্দী চর্চা করা বিষয়েও একটি আলোচনা আছে। আমার বিবেচনায় সব ক'টি ছিল ভারতীয় সমস্যা। একজন বিদেশী হিসেবে আমি কোনটিতে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। আমি কর্তৃপক্ষকে বললাম, "আপনারা হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে একটি আলোচনার ব্যবস্থা করুন আমি সেখানে অংশগ্রহণ করব।" কিন্তু তাঁরা অপারগতা জ্ঞাপন করলেন। তাঁদের সব আলোচনা প্রকাশ্য সভায় হবে ঠিক হয়েছিল। সকাল বেলার অনুষ্ঠানে আমি দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকলাম। বক্তাগণ রাজনৈতিক কণ্ঠস্বরে 'বিশ্ব ভাষা' 'বিশ্ব ভাষা' বলে চিৎকার করতে লাগলেন। আমার পাশে বসেছিলেন বাৎসায়ন। তিনি চিৎকার শুনে মুচকি মুচকি হাসছিলেন। সকালের অধিবেশন শেষে ডঃ ধর্মবীর ভারতী আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং বললেন যে আমার প্রবন্ধটি তিনি 'ধর্মযুগ'-এ ছাপাবেন। পরে একটু হেসে বললেন, 'সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের হিন্দী ভাষাভাষী জনগণকে রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ করা'। তিনি আরও বললেন, "এ সম্মেলনের পিছনে ইন্দিরা-কংগ্রেসের সহানুভূতি এবং সমর্থন আছে। আমরা যারা সাহিত্যের লোক তাদের স্থান এখানে নেই।"

হোস্টেলে ফিরছি যখন তখন এক প্রবীণ ব্যক্তি আমার সঙ্গ নিলেন এবং জানালেন যে তিনি মালিক মুহম্মদ জায়সীর ওপর কাজ করছেন। হোস্টেলের বারান্দায় ভদ্রলোককে নিয়ে কিছুক্ষণ বসলাম এবং জায়সী বিষয়ক কিছু আলাপ-আলোচনা করলাম।

বিকেল বেলা সম্মেলন ক্ষেত্রে না গিয়ে আমি স্ত্রীকে নিয়ে স্থানীয় দোকানপাট দেখতে গেলাম। সম্মেলনের একজন তরুণ ভলেন্টিয়ার আমাদের দোকানে নিয়ে গেল। শাড়ি কিনতে গিয়ে আমার স্ত্রী বিপাকে পড়লেন। এখানকার শাড়িগুলো তেরো হাত। স্থানীয় মেয়েরা পুরুষের মত কাছা দেয়। তাই শাড়ি একটু বেশি লম্বা। তবুও এই লম্বা শাড়ি দুটি আমার স্ত্রী কিনলেন। দোকানদার বাঙালি ছিল। সে হাসিমুখে আমাদের আপ্যায়ন করল। দুটি কমলালেবু আমাদের খেতে দিল। এখানকার কমলালেবুগুলো বেশ বড় সাইজের। অনেকটা মাঝারি সাইজের বাতাবীলেবুর মত। কোয়াগুলো খুব মিষ্টি। ফেরার পথে রাত্রিবেলা খাব বলে কয়েকটি কমলালেবু কিনে নিলাম।

১৩-১-৭৫

আজ সকালে বিদেশী অতিথিদের নিয়ে আসা হল নাগপুরের উপকণ্ঠে পপুনকি আশ্রমে। এই আশ্রমে আচার্য বিনোবা ভাবে থাকেন। আশ্রমটি একটি নির্জন জায়গায়। আশ্রমের সামনের রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া চলে না বললেই হয়। আশ্রমের প্রবেশ মুখের ডানদিকে বিরাট একটি বটগাছ। আশ্রমটি অনেক উঁচুতে। প্রায় ২০টি ধাপ অতিক্রম করে আমরা আশ্রম চত্বরে পৌঁছালাম। প্রায় দশ বিঘা জমির ওপর আশ্রমটি গড়ে উঠেছে। আশ্রমের মাঝখানে একটি বাঁধান পুকুর। দক্ষিণ দিকে একটি খোলা বারান্দা।

www.pathagar.com

সেখানে আচার্য বিনোবা ভাবে বসে আছেন। আমাদেরও সেখানে গিয়ে বসতে হল। মেঝেয় চাদর পাতা ছিল, সেখানেই আমরা বসলাম। বিনোবা ভাবে খালি গায়ে বসে ছিলেন এবং তিলের নাড় বানাচ্ছিলেন। এ সময়টা নাগপুরে তিলের উৎসব হয়। সেই উপলক্ষে বিনোবা ভাবে তিলের নাড় বানাচ্ছিলেন। তাঁর সামনে একটি ভাণ্ড ছিল। ভাণ্ডের মধ্যে গুড়মিশ্রিত তিল ছিল। ডান হাত দিয়ে একমুঠো তুলে নিয়ে তিনি গোলাকার নাড় বানিয়ে এককেজনের হাতে একেটি নাড় দিচ্ছিলেন। নাড় বিতরণের আগে কয়েকজনের ভাষণ ছিল। তার মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। ভাষণ দিলাম আমরা তিনজন বিদেশী – আমি, ইতালির তুরবিয়ানী এবং ত্রিনিদাদের একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহিলা। আমরা তিনজনই হিন্দীতে ভাষণ দিলাম। আমরা সবাই বিনোবা ভাবের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম এবং তাঁর সমাজসেবার অকুণ্ঠ প্রশংসা করলাম। ভাষণ দিলাম বটে, কিন্তু বিনোবা ভাবের হাতের তৈরি তিলের নাড় খেতে প্রবৃত্তি হল না। আমার হাতে দুটি নাড় দেয়া হয়েছিল। একটি আমার, অন্যটি আমার স্ত্রীর। আমি নাড় হাতে পুকুরের দিকে গেলাম এবং লোকের দৃষ্টির আড়ালে সেখানেই নাড় দুটি বিসর্জন দিলাম।

পপুনকি আশ্রম থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল গান্ধীজীর ওয়ার্ধা আশ্রমে। এখানে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মধ্যাহ্ন আহারটি খুবই তৃপ্তিদায়ক হয়েছিল। সবই নিরামিষ ছিল, কিন্তু রান্নাটি খুবই উপাদেয় হয়েছিল। আমাদের প্রত্যেকের সামনে একটি করে কাঁসার থালা দেয়া হল। থালার কিনারায় সাজান ছিল ভাজা তিল, ভেজিটেবল চপ, বিভিন্ন সবজির মিশ্রণে ঘৃতপক্ক একটি সুস্বাদু তরকারি এবং আলাদা একটি পাত্রে ঘন ছোলার ডাল। থালা হাতে নিয়ে আমরা যখন বসে পড়লাম তখন পরিবেশনকারিণী ঘিয়ে মাখান আটার গরম মোটা রুটি দিয়ে যেতে লাগল। খাবার শেষে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর একটি অনুষ্ঠানে আমরা অংশগ্রহণ করলাম। অনুষ্ঠানটি ছিল গোস্বামী তুলসীদাসের মৃন্ময় মূর্তি অনাবরণ। আমরা যাকে 'উন্মোচন' বলি, হিন্দীতে তাকেই 'অনাবরণ' বলে। অনাবরণ উৎসবে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। এ উৎসবে আমাদের অনেককেই বক্তৃতা করতে হয়। তুলসীদাসের রামচরিত মানস আমাদের পড়া ছিল এবং কিছু শ্লোক আমার মুখস্থও ছিল। আমি আমার বক্তৃতায় শ্লোক আবৃত্তি করলাম। আমি 'বালকান্ড' থেকে একটি শ্লোক আবৃত্তি করলাম ঃ

'সেই জস গাই ভগত ভব তরহী।
কৃপাসিন্ধু জনহিত তনু ধরহী।
রামজনম কৈ হেতু অনেকা।
পরম বিচিত্র এক তে একা।।'

এর অর্থ হচ্ছে সেই যশ-গান করে ভক্ত ভব-সাগর পার হয়। দয়ার সাগর রাম লোকের হিতের জন্য শরীর ধারণ করেন। রাম-জন্মের হেতু অনেক, তার প্রত্যেকটি অতি বিচিত্র।

বাংলাদেশের একজন মুসলমান যে পরিশুদ্ধ হিন্দীতে বক্তৃতা দেবে এবং রামচরিত মানস থেকে আবৃত্তি করে শোনাবে এটা শ্রোতা-দর্শকরা কল্পনাও করতে পারেনি। তারা

www.pathagar.com

উঠে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত ভাষায় আমার প্রশংসা করল, করতালি দিল এবং আরও কিছু শুনতে চাইল। আমি রামচন্দ্রের রূপ বর্ণনাসূচক কয়েকটি পদ আবৃত্তি করলাম ঃ

'সরদ বিমল বিধু বদনু সুহাবন।
নয়ন নবল রাজীব লজ্জাবন।
সকল অলৌকিক সুন্দরতাঈ।
কহি ন জাই মনহী মন ভাঈ।'

এর বাংলা হচ্ছে শরৎকালের নির্মল চাঁদের মত সুশোভন মুখ, চোখ দুটি নতুন ফোটা পদ্মকেও হার মানায়। সকল সৌন্দর্যই অলৌকিক তা কথায় ব্যক্ত করা যায় না, তা মনে মনেই রাখতে হয়।

অনুষ্ঠান শেষে প্রভাকর মাচওয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আরও অনেকে এসে তাঁদের আনন্দ প্রকাশ এবং সমর্থন প্রকাশ করলেন।

এখান থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল গান্ধীজির 'সেবাগ্রাম' নাম আশ্রমে। এ আশ্রমে গান্ধীজি কিছুকাল কাটিয়েছিলেন, আশ্রমটি ছোট এবং বর্তমানে গান্ধীজির স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ একটি যাদুঘররূপে এটাকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। আশ্রমে প্রবেশ করতেই আমাদের প্রত্যেককেই এক গ্লাস আখের রস খেতে দেয়া হল। রসের মধ্যে বরফের কুচি এবং এক টুকরো লেবু দেয়া ছিল। রসটি খুব তৃপ্তির সঙ্গে পান করলাম। খোলা মাঠে চেয়ার পাতা ছিল, সেখানেই আমরা বসলাম। সামনে একটি বেদীর মত, সেখানে তবলা এবং হারমনিয়াম রাখা ছিল। আমরা সুস্থির হয়ে চেয়ারে বসতেই এক ভদ্রমহিলা হারমনিয়াম নিয়ে বসলেন এবং তার পাশে তবলচি তবলা-সঙ্গত করতে লাগল। মহিলা সুললিত কণ্ঠে রামধুন গান করলেন। রামধুন গানের শেষে মহিলা হারমনিয়াম বাজিয়ে সূরা ফাতেহা গেয়ে শোনালেন। সুস্পষ্ট উচ্চারণে একজন রমণীর কণ্ঠে সূরা ফাতেহা শুনে আমি খুবই অবাক হলাম। আমি শুনলাম যে সূরা ফাতেহা গান করবার একটি রীতি নাকি এখানে আছে। গান্ধীজি নাকি এটা প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন। স্বাগত অনুষ্ঠানের শেষে অতিথিবর্গকে গান্ধিজী যে গৃহে থাকতেন সেটা দেখাতে নিয়ে যাওয়া হল। আগন্তুকগণকে যে কক্ষে গান্ধীজি সাক্ষাৎ দিতেন সেটা দেখলাম। এ কক্ষেই নাকি লুই ফিসারকে তিনি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। গান্ধীজির শয়ন-কক্ষ দেখলাম। সে কক্ষটি খোলা, সাক্ষাৎকার কক্ষের সঙ্গে যুক্ত এবং মাঝখানে কোন দরজা নেই। শুধু একদিকে তিন ফুট উঁচু একটি দেয়াল আছে। শয়ন-কক্ষের মধ্যেই দক্ষিণ প্রান্তে পায়খানা এবং গোসলখানা। এটাও একেবারে খোলা। তিনদিকে শুধু অল্প উঁচু করে একটি আড়াল তৈরি করা হয়েছে। যার ফলে পায়খানায় বসলেও মানুষের মাথাটা দেখা যায় বাইরে থেকে। আমার কাছে এই ব্যবস্থাটি কেমন যেন নোংরা মনে হল। আমি আশ্রমের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে আশ্রম-গৃহটি পাকা দালান, এখানে বিজলী বাতিও আছে, ইচ্ছে করলে পায়খানার জন্য কি সেফটি ট্যাংক করা যেত না? যাকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি মোটেও বিব্রত হলেন না। তিনি বললেন যে মানব-সেবার আদর্শ হিসেবে এই ব্যবস্থাটি রাখা হয়েছিল। প্রতিদিন সকালে শিষ্যরা মলভাণ্ড পরিষ্কার করত। এটাই ছিল 'সেবাগ্রাম'-এর লোকসেবার একটি আদর্শ। ভদ্রলোকের জবাবটি আমার কাছে সমর্থনযোগ্য মনে হল না।

www.pathagar.com

আজকের সারাদিন গেল তিনটি আশ্রম পরিদর্শন করে। সন্ধ্যায় আমরা সবাই হোস্টেলে ফিরে এলাম। প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং তাঁর স্ত্রীকে হোস্টেলেই পেলাম। তাঁরা আমাদের বাসের আগের বাসে চলে এসেছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন এবং বললেন, "মশাই, আপনি তো মারাত্মক মানুষ! যেভাবে তুলসীদাস আবৃত্তি করলেন তা আমি কখনও ভুলব না। আপনি যেভাবে হিন্দী উচ্চারণ করলেন তা আমি কোনদিন পারব না। বাঙালিদের হিন্দী উচ্চারণে সব সময় বাংলার টান থাকে, কিন্তু আপনার একেবারেই নেই।" আমি তাঁকে তাঁর প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ জানালাম এবং বললাম, "আমি যেটা শিখতে চাই সেটা পুরোপুরি শিখবার চেষ্টা করি, মাঝপথে কখনও সরে যাই না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় ব্যক্তিগত চেষ্টায় হিন্দী শিখেছিলাম এবং বারানসী দাস চতুর্বেদীর 'বিশাল ভারত' পত্রিকাটি নিয়মিত পড়তাম। তাতেই হিন্দী আমার আয়ত্তে আসে। এটা এমন কিছু নয়।"

১৪-১-৭৫

আজ শেষ রাতের দিকে একটি কৌতুকের ঘটনা ঘটে। রাতের শেষের দিকে সম্ভবত তখন সাড়ে তিনটা কি চারটে বাজে, কেমন একটি ঝগড়া বা তিরস্কারের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। শব্দটা আসছিল আমাদের সামনের ঘর থেকে। আমার স্ত্রী আমাকে উঠিয়ে দিলেন। দেখতে বললেন কি হয়েছে। আমি দরজা খুলে দেখি প্রেমেন্দ্র মিত্র কাপড়চোপড় পরে ঘর থেকে বেরোবার চেষ্টা করছেন এবং ভেতর থেকে তার স্ত্রী তাকে ধমকাচ্ছেন। স্ত্রীর কথা সুস্পষ্ট শুনতে পেলাম ঃ "বুড়োর কাণ্ডজ্ঞান নেই, এত রাতের বেলা বেড়াতে চলেছেন।" আমি বাইরে থেকে সাড়া দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কি হয়েছে?" প্রেমেন্দ্র মিত্র ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "সকাল বেলা বেড়াতে বেরুনো আমার অভ্যাস, কিন্তু গিন্নী আমাকে বেরুতে দেবে না এ কি রকম কথা?" আমি বললাম, "এখনও তো পুরোপুরি সকাল হয়নি, এখন সাড়ে তিনটার মত বাজে, আপনি ঘড়ি দেখুন।" ঘড়ি দেখে বোঝা গেল প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘড়ি গতকাল ৬টা থেকে বন্ধ হয়ে রয়েছে। রাত্রে ঘুম ভেঙে তাঁর ধারণা হয়েছে যে, এখন সকাল ৬টা। সেই ভ্রান্তিতেই কাপড়-চোপড় পরে তিনি বেড়াতে বেরোচ্ছিলেন। সকাল বেলা আমি যখন উঠলাম তখন ৭টা বাজে। মুখ-হাত ধুয়ে নাস্তা করতে গেলাম। প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্ত্রী আমাকে দেখে হেসে বললেন, "ভাই গত রাতে আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন, ও তো রাতে ঘুমোয় না, সন্ধে রাতে যা একটু ঘুমায়।" প্রেমেন্দ্র মিত্র কোনরূপ বিব্রতবোধ করলেন না, হাসিমুখে বললেন, "মশাই, বেশি ঘুমানো খুব ভাল নয়। আমি সব সময় রাতের শেষে উঠি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে কিছুটা হাঁটতে বেরোই। হাঁটার অবকাশে আমি নানাকিছু চিন্তা করি। অন্য সময় গিন্নির জন্য তো চিন্তা করবার অবসর পাই না।" আমরা সবাই তাঁর কথায় হাসলাম।

আজকের অধিবেশনেও কয়েকটি দীর্ঘ ভাষণ ছিল। ভাষণগুলো সবই প্রচারমূলক। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ থেকে একজন আদিবাসী ভদ্রলোক বিশুদ্ধ হিন্দীতে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তৃতার মূল বিষয় ছিল যে আন্দামান ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, এই অবস্থাটি বাঞ্ছনীয় নয়। মরিশাসের এক ভদ্রমহিলা বক্তৃতা করতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। তিনি বললেন যে, ভারতে আসতে পারা তার জন্য পিতৃগৃহে আসার মত।

www.pathagar.com

১৫-১-৭৫

আমি সব সময় লক্ষ্য করেছি যে, ধর্মের ব্যাপারে মানুষ অনেক কল্পনার আশ্রয় নেয়। এ ধরনের কাল্পনিক ভাব-বিন্যাসের ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের মানুষের চেয়ে দক্ষ আর কেউ নেই। তাদের সব কিছুই পরম মহাদেব থেকে উদ্ভূত। সঙ্গীত, নৃত্য, কাব্য, নাট্যশাস্ত্র সব কিছুতেই ব্রহ্মা রয়েছে। এ কথাটি উঠল নাগপুরে হিন্দী সম্মেলন শেষে একটি ঘরোয়া আলোচনায়। আমরা রামলীলা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, সেখানকার নৃত্যের বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে স্থানীয় একজন ভদ্রলোক বললেন যে, নৃত্যের জন্ম হয়েছে স্বর্গে, দেবতাদের আদেশক্রমে। দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মা পঞ্চম বেদ অর্থাৎ নাট্যবেদ রচনা করেছিলেন। ব্রহ্মার উদ্দেশ্য ছিল যেন নৃত্য-নাট্যের সাহায্যে স্বর্গ ও মর্ত্যের মানুষ প্রত্যেকেই আনন্দ নিতে পারেন, ভগবান শংকর স্বয়ং তাণ্ডব-নৃত্যের উদ্ভাবক এবং পার্বতী লাস্য-নৃত্যের। ব্রহ্মা নিজেই নাট্যের অভিনয়, গীত তথা নৃত্যের সুন্দর সমন্বয় করেছিলেন। দেবতা এবং ঋষিগণ এ সমস্ত নৃত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাল্মিকীর রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে নাটক এবং নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম ভরতমুণি নাট্যশাস্ত্রের ইতিহাস রচনা করেন। মহর্ষি ভরত নাট্যশাস্ত্রটিকে স্বর্গীয়-চৈতন্যের একটি আলেখ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এভাবে উৎসাহ ভরে স্থানীয় একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ভারতীয় নৃত্য এবং নাট্যশাস্ত্র আমার কাছে ব্যাখ্যা করলেন।

আমি প্রতিবাদ করলাম না, শুধু বললাম, "ভরতমুণি নাট্যশাস্ত্র রচনা করেছেন এ নিয়ে তো কোন তর্ক নেই। কিন্তু আপনারা কথায় কথায় ব্রহ্মাকে টেনে আনেন. এটা আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়।" ভদ্রলোক আমার কথায় রুষ্ট হলেন না, বরঞ্চ এক প্রকার কৃপামিশ্রিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন যে, কয়েক দিন সময় পেলে তিনি আমাকে নাট্যশাস্ত্রের অলৌকিক দিকটা ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। তিনি তাঁর ঠিকানা আমাকে দিলেন এবং অনুরোধ করলেন আমি যেন তাঁর গৃহে অতিথি হই। তিনি তখন ভারতীয় সঙ্গীত এবং নৃত্য সম্পর্কে আমাকে একজন প্রজ্ঞাবান পুরুষ বানিয়ে দেবেন।

নাগপুরে রামায়ণ গানের নৃত্যভঙ্গিমা আমার খুব ভাল লেগেছিল। সমস্ত কাহিনীটি নৃত্যের সাহায্যে উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। রামকাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন ভাবের যে প্রকাশ আছে তার অনুরূপ রস নৃত্য-ভঙ্গিমায় প্রকাশ পেয়েছিল। যে সমস্ত ভাব কাহিনী থেকে উৎসারিত হয়েছিল তা হল রতি, শোক, উৎসাহ, ভয়, হাস্য, ক্রোধ, ঘৃণা, বিস্ময় এবং নির্বেদ। এর নৃত্য কলাগত রূপান্তর ঘটেছে বিভিন্ন অভিব্যক্তির মাধ্যমে। এই অভিব্যক্তিকে আমরা রস বলে থাকি। এই রসগুলো হচ্ছে শৃংগার, করুণ, বীর, ভয়ানক, হাস্য, রুদ্র, বীভৎস, অদ্ভূত এবং শান্ত। এ রসগুলো রূপ পেয়েছিল দৃষ্টির সাহায্যে, এবং হস্তপদ সঞ্চালনের সাহায্যে, ভ্রূভঙ্গিমার সাহায্যে, সমস্ত মুখভঙ্গির সাহায্যে এবং হস্তপদ সঞ্চালনের সাহায্যে। কলাকারদের সাহায্যে এ রসগুলো বিচিত্র চাতুর্যে প্রকাশ পেয়েছিল। আমার কাছে নৃত্য ব্যাখ্যার জন্য এটাই যথেষ্ট। আমি এখানে ব্রহ্মাকে আনতে চাই না।

হিন্দী সম্মেলনের একটি বিষয় আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলাম। হিন্দী ভাবটি তার আদিপর্ব থেকেই গ্রামীণ, কিন্তু উর্দু হচ্ছে নাগরিক। রাজদরবারের সম্ভ্রান্ত জীবনযাত্রার

www.pathagar.com

সঙ্গে উর্দুর একটি সম্পর্ক আছে। বর্তমানে হিন্দীকেও নাগরিক করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। উর্দুর কিছু আদব কায়দার শব্দ হিন্দীতে অনুবাদ করে এমনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যা আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়। যেমন উর্দুতে বলা হয়, 'আপকা ইসমে শরীফ?' অর্থাৎ আপনার মর্যাদাবান নামটি কি? হিন্দীতে তাকেই অনুবাদ করে ব্যবহার করা হচ্ছে "আপকি কি শুভ নাম?" এখানে অনেকেই আমার পরিচয় জানতে চেয়ে এই শুভ নামসূচক কথাটি ব্যবহার করেছেন। বিষয়টি আমার কাছে হাস্যকর মনে হওয়ায় আমি বাৎসায়নকে বললাম। বাৎসায়ন হাসতে লাগলেন। তিনি বললেন, "এরা সব পাগল, এরা জানে না যে ভাষা তার নিজস্ব স্বভাবে অগ্রসর হয়। ভাষার স্বভাবকে পাল্টানো যায়নি, যেমন নদীর স্রোতের পরিবর্তন করা যায় না। হিন্দীকে উর্দুর মত করা তো দরকার নেই। হিন্দী তার নিজস্ব দীপ্তিতেই জেগে থাকবে।" এ সম্পর্কে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গেও আলোচনা করলাম। তিনি হেসে বললেন, "মশাই, আমরা এসেছি অতিথি হয়ে, আমাদের আপ্যায়নটা ঠিক আছে কিনা লক্ষ্য রাখবেন। এসব শুভ-অশুভ দিয়ে আমাদের দরকার কি?" আমার কাছে অধিক হাস্যকর মনে হয়েছিল উর্দু 'আপকি দৌলতখানা' কথাটির হিন্দী অনুবাদ। অনুবাদটি হচ্ছে 'আপকি সম্মানি গৃহ?' এছাড়া আরও ছিল, যেমন "চলিয়ে, ভোজন কা সময় হো গিয়া" অর্থাৎ চলুন, খাবার সময় হয়ে গেছে।

যাই হোক, নাগপুরে অবস্থানটি আমার ভালই লেগেছিল। আজ ছিল শেষ দিন। আগামীকাল আমি এখান থেকে বোম্বাইতে যাব।

১৬-১-৭৫

বোম্বে বিমান বন্দরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এক ভদ্রলোক আমাদের স্বাগত জানিয়েছিলেন। প্লেন থেকে নামার পর টারমাকে ভদ্রলোককে দেখলাম। তিনি এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় জানালেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রটোকল তিনিই দেখে থাকেন। আমার মনে হল প্লেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক চিনেবাদাম চিবোচ্ছিলেন। তাঁর গায়ের জামায় চিনেবাদামের দু/একটা লাল খোসা লেগেছিল। ভদ্রলোক বেশি কথা বলেন। এয়ারপোর্ট থেকে মালপত্র নিয়ে ট্যাক্সি পর্যন্ত নিয়ে যেতে যেতে ভদ্রলোক জানালেন যে, কয়েক দিন আগে মহীশূর থেকে আর. কে. নারায়ণ এসেছিলেন। তাঁকে তিনি ফিসারম্যানস হোয়াপে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের অবাক লেগেছিল যে, একজন নামকরা লেখক বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে চাইলেন না, কিন্তু যেতে চাইলেন জেলে বস্তিতে। আমি ভদ্রলোককে বললাম, "নারায়ণ হচ্ছেন একজন বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক। তিনি জেলেদের পরিচয় জানতে চাইবেন এর মধ্যে অবাক হওয়ার কি আছে?"

যে ট্যাক্সিতে আমরা উঠলাম সেটি ভাড়া করা ট্যাক্সি. বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি নয়। ভদ্রলোক জানালেন যে, সে সময় বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি হিসেবে অনেক লোক এসেছে, তাই সবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি ব্যবহার সম্ভব হয়নি। তবে আগামীকাল তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গাড়ি যোগাড় করতে পারবেন বলে আশ্বাস দিলেন। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গেস্ট হাউস আছে। সেখানে কোন কামরা খালি না থাকায় আমাদের জন্য হোটেলে পৌছে আমার বন্ধু এ.বি. শাহকে টেলিফোন করলাম। শাহের

www.pathagar.com

সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৫৪ সাল থেকে। আন্তর্জাতিক একটি সেমিনারে তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সে সময় শাহ্ বোম্বের ফার্গুসন কলেজের অংকের অধ্যাপক ছিলেন শাহ্ এম. এন. রায়পন্থী। সেই সুবাদে আমার সঙ্গে তার অতি সহজেই অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধের সময় শাহ্ বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের জন্য অনেক কিছু করেছেন যা কখনও ভুলবার নয়। অর্থ সাহায্য, পোশাক সংগ্রহ, ওষুধপত্র সংগ্রহ, সাংগঠনিকভাবে এগুলো অনেক কিছু তিনি করেছেন। তার সঙ্গে ছিলেন দিনকার সাক্রিকর। সাক্রিকর একজন সাংবাদিক। বোম্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে তিনি বাংলাদেশের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করেছেন। হোটেলে আমরা যখন খেতে বসেছি তখন এ. বি. শাহ্ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এলেন। ডাইনিং রুমে খেতে খেতেই কথা হল। মিসেস শাহ্ আমার স্ত্রীকে একটি শাড়ি উপহার দিলেন। শাহের জরুরি একটা অ্যাপয়েনমেন্ট ছিল বলে বেশিক্ষণ থাকতে পারলেন না। তিনি সাক্রিকর এবং কারণিককে খবর দেবেন বললেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকটি বিকেল বেলা আমাদেরকে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। বোম্বে শহর আমার পূর্ব পরিচিত। এটি একটি পরিচ্ছন্ন আধুনিক শহর। এখানকার জীবনযাপন এবং মানুষের ব্যবহার-বিধির মধ্যে একটি আন্তর্জাতিকতার ছাপ আছে। এখানকার হিন্দু, মুসলমান, জৈন এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায় পারস্পরিক সহানুভূতি এবং সমর্থন নিয়ে এক সঙ্গে বসবাস করছে। এখানকার লোকেরা গর্ব করে বলে যে, এখানে নাকি কোন দিন সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে সংঘর্ষ বাঁধে না। এখানকার জৈন সম্প্রদায় খুব বিত্তশালী এবং বেশ উচ্চ শিক্ষিত। বুদ্ধিবৃত্তি এবং জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে বোম্বের শিক্ষিত সম্প্রদায় সমগ্র ভারতবর্ষে আপন বিশিষ্টতায় উজ্জ্বলভাবে চিহ্নিত। এ শহরের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ইংরেজিতে ভাব প্রকাশ করতে পারে। ইংরজিটা এ শহরের লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা হয়ে উঠেছে। এ শহরের দুজন পার্সি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। একজন হচ্ছে মনিবেন কারা, অন্যজন হচ্ছে মিনু মাসানী। এদের উভয়ের গৃহই ছিল বোম্বের উচ্চ শিক্ষিত মানুষের মিলিত হবার কেন্দ্রস্থল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন আমি বোম্বে এসেছিলাম তখন মনিবেন কারার গৃহে এক নৈশভোজে আপ্যায়িত হয়েছিলাম। আরেক জন পার্সি মহিলাকে আমি জানতাম যিনি বর্তমানে পরলোকগত – তিনি ছিলেন মাদাম সোফিয়া ওয়াদিয়া। তিনি ছিলেন ভারতীয় পি.ই.এন-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সেই সূত্রে ভারতীয় লেখক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভদ্রলোকের সঙ্গে আমরা বোম্বের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল এবং শহরতলী ঘুরে দেখলাম। ভদ্রলোক আমাদের মালাবার হিলেও নিয়ে গেলেন। মালাবার হিলে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বাড়িটি আমি দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভদ্রলোক সেটি দেখাতে পারলেন না। তার বদলে তিনি আমাদের দিলীপ কুমারের বাড়ি দেখাতে চাইলেন। কিন্তু দিলীপ কুমারের প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই দেখে ভদ্রলোক মনঃক্ষুণ্ন হলেন। দিলীপ কুমারের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য তিনি দিলীপ কুমার সম্পর্কে নানা কথা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, দিলীপ কুমারকে নাকি পণ্ডিত নেহেরু খুব স্নেহ করতেন, দিলীপ কুমার ঘোড়ায় চড়ে প্রায়ই সমুদ্রের ধারে বেড়াতে আসেন। এ রকম আরও অনেক গল্প। ভদ্রলোক যেমন বাচাল, তেমনি আবার অনবরত মুখে কিছু দিয়ে রাখেন। সমুদ্রের ধারে একহালি কলা কিনে খেতে লাগলেন। যাই হোক সন্ধ্যায়

www.pathagar.com

ভদ্রলোকের কাছ থেকে রেহাই পেলাম। পরের দিন সকালে তিনি আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে যাবেন বললেন।

সন্ধ্যার সময় হোটেলে সাক্রিকর এলেন। আমি স্ত্রীকে হোটেলে রেখে সাক্রিকরের সঙ্গে লেখকদের জন্য নির্ধারিত সরকারী বাস-প্রকল্পে এলাম। বোম্বেতে এ ধরনের বাস-প্রকল্প অনেক আছে। স্থানীয় নাগরিক সুবিধাদির মধ্যে এটাও একটি প্রধান সুবিধা। প্রথম থেকে নগরটির সামগ্রিক পরিকল্পনার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবীদের জন্য বাস-প্রকল্প ছিল এবং তা প্রাধান্য পেয়েছিল। এ ধরনের একটি বাস-প্রকল্পের একটি ফ্ল্যাটে সাক্রিকর থাকেন। সাক্রিকরের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করলাম। আমি দেখলাম যে তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার খবরাখবর রাখেন। তিনি একটি কথা বললেন যে, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তার শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত রাখার মধ্যে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেখা যাচ্ছে যে, রাজনৈতিক হট্টগোল ক্রমশ শিক্ষাঙ্গনকে গ্রাস করছে। হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে তিনি প্রশ্ন করলেন, মুজিব কি মহাত্মা গান্ধীর মত দেশের প্রশাসনিক কর্মের বাইরে থাকতে পারতেন না? প্রশ্নটি উত্তরের জন্য করা হয়নি। আসলে সাক্রিকর প্রশ্নের আকারে মন্তব্যটি করছিলেন। সাক্রিকরের ওখানে খুব সুস্বাদু এক প্রকার চানাচুর খেলাম। চানাচুরের মিশ্রণের মধ্যে কিসমিস ছিল এবং কাজু বাদাম ছিল।

১৭-১-৭৫

আজাকের ব্রেকফাস্টে পাকা পেঁপে ছিল এবং স্মোকড বা ধূমায়িত এক ধরনের মাছ ছিল। আমরা উভয়ই খুব পছন্দ করে খেলাম। ন'টার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রটোকল অফিসার এলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলাম। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় বলতে একটি প্রশাসনিক কাঠামো বুঝায়। একাডেমিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় বিভিন্ন কলেজ দ্বারা। কলেজগুলো খুবই মর্যাদাশীল এবং উন্নতমানের। এসব কলেজের সমন্বয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশ এবং পূর্ণতা। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কিছু কিছু ডিসিপ্লিন আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিক্রমা শেষে আমরা আর্মি এণ্ড নেভি বিল্ডিং-এ 'ধর্মযুগ'-এর অফিসে গেলাম। 'ধর্মযুগ'-এর সম্পাদক ডঃ ধর্মবীর ভারতী আমাদের দুজনকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলেন। ভারতী একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি চর্যাগীতিকার ওপর উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। তাঁর এই গবেষণা কর্মের সঙ্গে আমি পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিলাম। আমি 'ধর্মযুগ'-এ প্রকাশের জন্য আমার একটি প্রবন্ধ দিলাম। প্রবন্ধটির নাম 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দীর প্রভাব'। প্রবন্ধটি আমি নাগপুরের সম্মেলনের জন্য লিখেছিলাম। কিন্তু সেখানে পড়া হয়নি। কথায় কথায় ভারতী বললেন যে কুররাতুল আইন হায়দার সেখানে কাজ করেন, আমি ইচ্ছে করলে তার সঙ্গে দেখা করতে পারি। ভারতী টেলিফোন করলেন কিন্তু কুররাতুল আইন কোন একটি অজুহাত দেখিয়ে দেখা করতে এলেন না। এখান থেকে মূলকরাজ আনন্দের সঙ্গেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাকেও পেলাম না। তিনি তখন বোম্বের অফসোরে একটি দ্বীপে অবস্থান করছিলেন। দেখা হলে খুশি হতাম। আনন্দ এখন

www.pathagar.com

খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক, শিল্প তত্ত্বজ্ঞ এবং প্রাচীন ধর্মীয় শিল্পের প্রতি আগ্রহশীল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তিনি বাংলাদেশের পক্ষে পাশ্চাত্যের সহানুভূতি সৃষ্টির জন্য ইউরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। আমার সঙ্গে তার চিঠিপত্রের যোগাযোগ দীর্ঘকালের।

আজ বিকেলে বোম্বের কিছু বইয়ের দোকান ঘুরে দেখলাম। আগামীকাল দিল্লী যাব।

১৮-১-৭৫

দিল্লীতে আমি প্রথমবার আসি মুক্তিযুদ্ধের সময়। দিল্লীবাসীদের কাছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা বলতে জয়প্রকাশ নারায়ণ তখন বাংলাদেশের ওপর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডেকেছিলেন। সেই সম্মেলনে আমি যোগ দিয়েছিলাম। সম্মেলন শেষে একদিন ইঞ্জিনিয়র ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্সে বাংলাদেশের ওপর একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। বক্তৃতার শেষে উপস্থিত শ্রোতারা আমাকে নানা রকম প্রশ্ন করেছিলেন। সে সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে আমি সবাইকে খুশি করতে পেরেছিলাম। '৭৩ সালে আরেকবার দিল্লী এসেছিলাম। সেবার ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এসেছিলাম শ্রী অরবিন্দের একটি স্মরণ সভায় যোগ দিতে। সেবার হাতে সময় ছিল; দিল্লী শহর ঘুরে দেখেছি এবং আগ্রাতেও গিয়েছি।

এবার আমি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সহকারী রেজিস্ট্রার বিমান বন্দরে গাড়ি নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় গেস্ট হাউজে আমাদের জন্য থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দিল্লীতে আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেটি হচ্ছে নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যিালয়টি নতুন কিন্তু দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় বুঝাতে পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বুঝায়। ব্রিটিশ আমলে এক সময় ভারতের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গাওয়ার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। গেস্ট হাউজে পৌঁছাতেই একজন পার্সি মহিলা আমাদের স্বাগত জনালেন। মহিলাটি বয়স্কা, খুব শীর্ণকায়া, কিন্তু মুখাবয়বে লাবণ্য আছে, মাথার চুলে সিঁথির দিক থেকে সাদা রেখা দেখা গেল। ভদ্রমহিলা আমাদের ঘর দেখিয়ে দিলেন এবং বললেন, "দুপুরে আপনারা কি খাবেন তাতো জানতাম না, তাই ভাত, চাপাতি, মুরগী আর ডাল করে রেখেছি। সবজি ভুনজিয়া যদি চান তাও করে দিতে পারব, একটু সময় নেবে। রাতের বেলা কি খাবেন বলুন, সেভাবেই ব্যবস্থা করব।" আমি রাতের জন্য চিকেন তন্দুরী এবং নানের কথা বললাম। ভদ্রমহিলা জানালেন যে, রাতের খাবার ঠিক ঠিক হয়ে যাবে,তবে তার সঙ্গে তিনি আরেকটি আইটেম যোগ করবেন সেটা হচ্ছে রগনজুস। মুখ হাত ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে দুপুরের খাবার খেলাম। তারপরে বাংলাদেশের হাইকমিশনার ডঃ মল্লিককে টেলিফোন করলাম। ডঃ মল্লিকের কথা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। তিনি বললেন, "আপনি তো দিল্লীতে আসবেন তাতো জানাননি। এদিকে বাংলাদেশের কাগজে দেখলাম যে ডঃ এনামুল হককে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিযুক্ত করা হয়েছে। তবে আপনাকে কোথায় দেয়া হয়েছে তা কিন্তু লেখেনি।" মল্লিক সাহেবের কথা শুনে আমি হতভম্ব হলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংযত হয়ে বললাম, আমি

www.pathagar.com

অবশ্য পদত্যাগপত্র দিয়েই এসেছিলাম, কিন্তু আমার অনুপস্থিতিতে কোন সিদ্ধান্ত যেন না নেয়া হয় সে রকম অনুরোধ করেছিলাম। যাই হোক, যা হবার তাতো হয়েছেই। এখন চিন্তা করে কোন লাভ নেই।" মল্লিক সাহেব তার বাসায় খেতে ডাকলেন, পরদিন দুপুরে যাব ঠিক হল। আমার স্ত্রী খুব ধৈর্যশীলা। চাকরি চলে যাবার কথায় তিনি কোনরূপ বিচলিত ভাব দেখালেন না। তিনি শুধু বললেন, "তোমার তো চট্টগ্রামের চাকরিটা আছেই, সেখানে চলে গেলেই হবে। আমাদের জন্য শিক্ষকতার কাজটাই ভাল।" আমি বললাম, "প্রবোধ সেন কিন্তু প্রথম থেকেই কোনরূপ প্রশাসনিক দায়িত্বে যেতে আমাকে নিষেধ করেছেন। আমি তখন তাঁর কথা শুনিনি। আমি অনবরত এক চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরিতে গেলাম। তার ফলে কোথাও টাকা-পয়সা জমতে পারল না। এটা আমার বিধি-লিপি।" আমার স্ত্রী আমার কথার মধ্যে সম্ভবত একটু হতাশার সুর খুঁজে পেলেন। তিনি বললেন, "আমাদের টাকা-পয়সা খুব একটা হয়নি, কিন্তু অভাবও আমরা বোধ করিনি। টাকা থাক বা না থাক অভাব না থাকলেই তো হল। বিকেল বেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকটি পুরনো দিল্লী দেখাতে নিয়ে গেলেন। আমরা চাঁদনী চক, দিল্লীর জামে মসজিদ, গান্ধীর সমাধি স্থান এগুলো দেখে সন্ধ্যায় 'পাকিজা' নামক একটি সিনেমা দেখতে গেলাম। আমরা মওলানা আজাদের সমাধি এবং পণ্ডিত নেহেরুর সমাধিও দেখলাম। জামে মসজিদের নিকটের একটি দোকান থেকে আমার স্ত্রী আমার জন্য একটি কোর্তা কিনলেন এবং তার নিজের জন্য এক শিশি গোলাপি আতর কিনলেন। সিনেমা দেখে রাত ৯টায় গেস্ট হাউজে যখন ফিরলাম তখন দেখলাম যে সেখানে হিন্দী বিভাগের দুটি ছাত্র আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছে। তারা আমাকে আগামীকাল হিন্দী বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে অনুরোধ করল। আমি যাব বলে কথা দিলাম। পার্সি ভদ্রমহিলা আমাদের মুখ-হাত ধুয়ে প্রস্তুত হতে বলে খাবার গরম করতে গেলেন। পরিতৃপ্তির সঙ্গে পরিবেশিত খাবার খেলাম। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে দিল্লীর চিকেন তন্দুরী অনেক বেশি সুস্বাদু। এখানকার মোগলাই খাবারগুলো অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে অনেক ভাল। পার্সি ভদ্রমহিলা গেস্ট হাউজের কেয়ারটেকার। তিনি গেস্ট হাউজের একটি কামরা নিয়ে থাকেন। খাবারের প্রশংসা করতে তিনি বললেন, "আপনারা তো পার্সি সম্প্রদায়ের রান্না খেয়ে দেখেননি। আমাদের রান্নার মধ্যে অনেক নতুনত্ব আছে।"

১৯-১-৭৫

আজ সকালবেলা বিশ্ববদ্যালয়ে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে জানালাম যে, আমি এখানে বাংলাদেশের একজন উপাচার্য হিসেবে এসেছি বটে, কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে উপাচার্যের পদ থেকে অব্যাহতি নেব এবং শিক্ষকতা কর্মে ফিরে যাব। ভদ্রলোক আমার কথায় খুশি হলেন এবং বললেন যে, একজন অধ্যাপককে অধ্যাপক হিসেবে দেখতেই তার ভাল লাগে, উপাচার্য হিসেবে নয়। তিনি নিজে একজন বিজ্ঞানী, ল্যাবরেটরি বাদ দিয়ে প্রশাসনের মধ্যে তিনি নিজেকে কেমন যেন অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করেন। হাসতে হাসতে বললেন, "একজন রমণী বিধবা হলে যেমন সে তার অলঙ্কার এবং প্রসাধন ফেলে দেয় একজন অধ্যাপকও

www.pathagar.com

উপাচার্য হলে তেমনি তার ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরি ফেলে দিতে বাধ্য হয়।" তিনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে প্রশাসনিক ভবনটা ঘুরে-ফিরে দেখালেন এবং বিকেলে এক সময় এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপের বাগানটা দেখে যেতে বললেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলাপের বাগানটি খুবই বিখ্যাত, নানা জাতের গোলাপ সেখানে আছে, ফুলগুলোর আকৃতিও সেখানে বড়, কোন কোন ফুলের মত বড়। অনেক দিন ধরে উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকরা এ বাগানটি গড়ে তুলেছেন, গোলাপের অঙ্কুর এনেছেন পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগানে সুগন্ধ গোলাপ আছে, তবে সুদৃশ্য গোলাপই বেশি। আমি উপাচার্যকে বললাম যে, তিনি যেন আমাকে গোলাপের কিছু চারা দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে তাদের মধ্যে পেয়ে খুব খুশি হল। আমি তাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা বললাম। বিশেষ করে হিন্দী সাহিত্যের মধ্যযুগ সম্পর্কে, যে বিষয়ে আমার কিছুটা জ্ঞান আছে।

দুপুরবেলা আমরা মল্লিক সাহেবের ওখানে খেতে গেলাম। তিনি আমাদের নেবার জন্য গাড়ি পাঠিয়েছিলেন। আমাদের জন্য তাঁকে বেশ চিন্তিত দেখলাম। তিনি বললেন, "আপনি ঢাকায় তাড়াতাড়ি ফিরে যান, সেখানে বঙ্গবন্ধুর মুখোমুখি হয়ে কথা বলেন, দেখবেন তিনি আপনার জন্য একটি ব্যবস্থা ঠিকই করবেন।" আমি গতরাত্রেই স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আমি বললাম, "এখন আর ফিরে গিয়ে কোন লাভ নেই। আমার ভ্রমণসূচীতে আর মাত্র দু'দিন ভারতে থাকা আছে। সেই দুটো দিন শেষ করেই আমি যাব। এখন ব্যাকুল হয়ে ছুটে গিয়ে কোন লাভ নেই।" খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কথায় কথায় একবার বললাম, "আমি ভেবেছিলাম দেশে ফিরে গিয়ে আমার পদত্যাগপত্রটি যাতে গৃহীত হয় সে ব্যবস্থা করব এবং তারপর আমার পুরনো কর্মস্থল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাব। কিন্তু তার বদলে আমাকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হল। এটা তো আমার জন্য অসম্মান।" মল্লিক সাহেব বললেন, "বঙ্গবন্ধু যাদের চাকরি দেন, তাদের পদত্যাগ করবার অধিকার দেন না। পছন্দ না হলে তিনি তাদের সরিয়ে দেন।" এ বিষয়ে আমাদের আর কোন কথাবার্তা হল না। চলে আসার আগে আমি মল্লিক সাহেবকে অনুরোধ করলাম, "তিনি যেন ঢাকায় আমার বাসায় টেলিফোন করে আমার মেয়ে নাসরিনকে আশ্বস্ত করেন এবং আমি ২২ তারিখে ফিরব এ কথা যেন তাকে জানিয়ে দেন।"

বিকেলবেলা সাহিত্য একাডেমীতে গেলাম কিন্তু সেখানে উল্লেখযোগ্য কাউকে পেলাম না। আমি প্রভাকর মাচওয়েকে খুঁজছিলাম। শুনলাম তিনি ছুটিতে আছেন।

সন্ধ্যায় দিল্লী ফোর্টে আলোকসজ্জা এবং সংলাপমুখর ইতিহাসের প্রেক্ষাপট দেখতে গেলাম। এই অনুষ্ঠানটি বহু দর্শককে প্রতি সন্ধ্যায় টেনে আনে। ইতিহাসের কোন কিছু চোখের সামনে ঘটে না, কিন্তু আলোকসম্পাতের মধ্য দিয়ে ইতিহাস বিবৃত হয়, দ্রুত পায়ে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যায়, অস্ত্রের ঝনৎকার শোনা যায়, যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের শব্দ শোনা যায়। এগুলোর মধ্যে আবার মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক, ফারসি বয়েত এবং উর্দু গজল শোনা যায়। অনুষ্ঠানটি খুবই সুন্দর। কিন্তু আধুনিককালের পরিপ্রেক্ষিতটা কিছুটা দ্রুতপূর্ণ মনে হল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসকে এবং নেহেরু

www.pathagar.com

পরিবারকে একমাত্র অংশভাগী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, এ রকম বোধহয় করা উচিত ছিল না। ইতিহাস তো একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ হয়ে কথা বলে না। ইতিহাসে সকলেরই অবস্থান থাকে।

২০-১-৭৫

আজই দিল্লীতে আমাদের শেষ দিন। আমার ভ্রমণ-সূচীতে আজকের জন্য কোন কার্যক্রম নেই। সহকারী রেজিস্ট্রার ভদ্রলোক জানতে চাইলেন যে আমি কোথাও যেতে চাই কিনা। আমার স্ত্রী রাজী হলেন। তিনি বললেন যে তিনি যতটা সম্ভব আজ দিল্লী ঘুরে-ফিরে দেখবেন। আমার স্ত্রী অবশ্য দুঃখ করলেন যে, তাঁর আগ্রা দেখা হল না। ভবিষ্যতে কোনদিন হবে আমি এই বলে তাকে আশ্বাস দিলাম। দিনের বেলা আজকে দিল্লী ফোর্ট আবার ভাল করে দেখলাম। দিল্লী ফোর্টের অভ্যন্তরভাগ দেখলে একটি বিশ্বাস মনে জাগে যে, মোঘল সম্রাট তাঁদের ঐশ্বর্যের প্রতাপ এবং অহমিকা দেখাতে চাননি, ঐশ্বর্য যে সৌন্দর্য নির্মাণ করতে পারে তাই দেখাতে তারা ব্যাকুল ছিলেন। দিল্লী, লাহোর, আগ্রা এবং ফতেপুর সিক্রি মোঘল সৌন্দর্যের লীলা-নিকেতন। তাঁরা বিপুল অর্থ ব্যয় করে বিভিন্ন অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু চেয়েছিলেন যে এসব অট্টালিকা যেন মানুষের দৃষ্টিতে বিস্ময় এবং মুগ্ধতা সৃষ্টি করে। মোঘল স্থাপত্য রীতির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে বিপুল এবং বলিষ্ঠ কর্মকে সুচারু এবং সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপিত করা। দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস অত্যন্ত অনবদ্য মনোমুগ্ধকর সৃষ্টি; তাজমহল তো বটেই। যতটা সম্ভব আমরা ঘুরে-ফিরে দিল্লী দুর্গ দেখলাম। দুর্গের এলাকা থেকে বেরিয়ে ফুটপাতের একটি দোকান থেকে পাকোড়া খেলাম। একটু এগিয়ে এক ঠেলাওয়ালার কাছ থেকে লেবু এবং মসলা মিশ্রিত পুদিনা পাতার রস খেলাম। খেতে খুব স্বাদ লাগল। এখান থেকে গেলাম একটি কুটিরশিল্পের এম্পোরিয়ামে। হাতে আমাদের টাকা খুব বেশি ছিল না। আমি সিল্কের একটি সার্ট নিলাম এবং আমার স্ত্রী সুচিত্রিত চামড়ার ব্যাগ কিনলেন। ছেলেমেয়েদের জন্য অল্প কিছু তাকে কিনতে হল।

গেস্ট হাউজে ফিরে আমার বন্ধু প্রাণগোপাল পালের খোঁজ করলাম। তারা এক সময় ইউনিভার্সিটি এলাকায় থাকত। প্রাণগোপাল কোথায় গেছে কেউ তার খোঁজ-খবর দিতে পারল না।

২৩-১-৭৫

আজ সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদের কর্মকর্তারা দেখা করতে এল। তারা আমি চলে যাচ্ছি শুনে দুঃখ প্রকাশ করল এবং অতীতে আমার বিরুদ্ধে তাদের যে আন্দোলন ছিল, সে জন্য তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করল। ছাত্ররা এতটা বিনয়ী হবে আমি ভাবতে পারিনি। তারা আমাকে বিদায় সংবর্ধনা জানাবে বলল। আমি প্রথমে রাজি হলাম না, বললাম, "দেখ, তিন বছর আমি তোমাদের এখানে ছিলাম, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি নিয়ম-বহির্ভূত কোন কাজ করিনি, সে জন্য অনেকে অসন্তুষ্ট হয়েছে, তোমরাও হয়েছ। তোমাদের ন্যায়সঙ্গতভাবে অনেক সুযোগ-সুবিধা আমি

www.pathagar.com

দিয়েছি, কিন্তু তোমাদের কোন অন্যায় দাবি আমি মেনে নেইনি। সে জন্যই আজ আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। বড় হয়ে বুঝবে যে, আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চাইনি। তখন তোমাদের মনে এ বিশ্বাসটা জাগবে যে, আমি অন্যায় দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করিনি। আমার প্রতি তখন তোমাদের শ্রদ্ধাও জাগতে পারে।" ছাত্ররা কিছুক্ষণ কোন শব্দ করল না, অবশেষে বলল, "আমরা যে আপনাকে সংবর্ধনা দিতে চাই তাতে কি প্রমাণ হয় না যে, আমরা আপনাকে শ্রদ্ধা করি।" এ কথার পর আমি সংবর্ধনা নিতে রাজি হলাম। বললাম, "তোমাদের সংবর্ধনা সভায় এনামুল হক সাহেবও যেন থাকেন এই ব্যবস্থা নেবে। আর কবে অনুষ্ঠানটি করবে, সেই তারিখ ও সময়টি আমার সচিব আরজ আলীর কাছ থেকে জেনে নিও।"

ভূগোল বিভাগের প্রফেসর এম. আই. চৌধুরী এলেন। আকস্মিকভাবে আমার স্থানচ্যুতিতে তিনি খুব ক্ষুব্ধ হয়েছেন দেখলাম। তিনি বললেন, "এ পর্যন্ত যাদের যাদের সরান হয়েছে তাদের প্রত্যেককেই অন্য কোন উল্লেখযোগ্য চাকরি দেয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরিয়ে মোজাফফর আহমদকে বিশ্ববিদালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান করা হল, তেমনি সরওয়ার মোর্শেদ সাহেবকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরিয়ে পোল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত করা হল, কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে কিছুই করা হল না, আপনাকে শুধু বলা হয় দায়িত্ব হস্তান্তর করতে, এটা কোন্ দেশী বিচার?" আমি হেসে জবাব দিলাম, "এটা বঙ্গদেশীয় বিচার? কিন্তু এতে আমি মোটেই ক্ষুব্ধ নই। আমি আমার পূর্বতন অধ্যাপনার কাজেই ফিরে যাব এবং সেখানেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারলে খুশি হব।"

আমি চট্টগ্রামে আবুল ফজল সাহেবকে টেলিফোন করলাম। আবুল ফজল সাহেব আমাকে চট্টগ্রামে আমার পূর্বপদে যোগ দিতে অনুরোধ করলেন এবং বললেন যে, তিনি চট্টগ্রামে আমার থাকবার জন্য একটি বাড়ি বরাদ্দ করে রাখবেন। আবুল ফজল সাহেবের এই সৌজন্যে আমি মুগ্ধ হলাম। তার মতাদর্শের সঙ্গে আমার মিল নেই এটা সত্য কিন্তু তাঁর ভদ্রতা এবং মানসিক বোধ আমাকে সব সময় মুগ্ধ করেছে। আমি আবুল ফজল সাহেবকে একটি বড় বাড়ি ঠিক রাখতে বললাম। তিনি বললেন যে প্রফেসরদের জন্য নির্দিষ্ট বাড়িগুলোর একটিও খালি নেই তবে রশীদুল হকের বাড়িটা তিনি আমাকে খালি করে দেবেন। রশীদুল তখন দীর্ঘ ছুটিতে আছেন।

স্ত্রীকে বললাম, "আবার একটি নতুন জীবনের জন্য প্রস্তুত হও। কি করবে, তোমার ভাগ্যে কোথাও স্থিতিশীল হওয়া নেই।" স্ত্রী বললেন, "আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করেছেন তাই তো হবে। তুমি তো নিমিত্ত মাত্র।"

২৪-১-৭৫

ভারত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমি ঢাকায় বসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম দেখাশুনা করছি। একবার ভেবেছিলাম যাব, কিন্তু সিরাজুল হক সাহেব বললেন যে আমি গেলে কিছু ছেলে মিছিল করে এসে আমাকে বিব্রত করতে পারে। তিনি নাকি এরকমই শুনেছেন। সেক্ষেত্রে আমার ক্যাম্পাসে না যাওয়াই ভাল। আরও শুনলাম যে

www.pathagar.com

শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যে এনামুল হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আরম্ভ করেছেন, তাকে নৈশভোজে আপ্যায়নও করেছেন। যিনি আপ্যায়ন করেছেন তিনি অর্থনীতি বিভাগের প্রধান মালিক খসরু চৌধুরী। ভদ্রলোক করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহকর্মী ছিলেন এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে পেয়ে আমি খুশিই হয়েছিলাম। ভদ্রলোক আমার সঙ্গে তার আন্তরিকতার নিদর্শনস্বরূপ মাঝে মাঝে ময়মনসিংহ থেকে আমার জন্য লাল বিড়ুই চাল পাঠাতেন। এ চালের তিনি দাম নিতেন না। বলতেন যে এগুলো তার ক্ষেতের চাল। আমিও সহজ মনে এগুলো গ্রহণ করতাম। কিছু ছাত্রভর্তি নিয়ে আমার সঙ্গে যখন সরকার পক্ষের ছাত্রদলের বিরোধ বেধে উঠল তখন থেকে এ ভদ্রলোকের আচরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। তিনি ছিলেন ভর্তি কমিটির চেয়ারম্যান। বিশ্ববিদ্যলয়ে ভর্তির নিয়ম অনুসারে এই কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারী ছিল। উপাচার্যের কাছে সিদ্ধান্তটি এলে তিনি অনুস্বাক্ষর করবেন মাত্র। কিন্তু মালিক খসরু চৌধুরী ছাত্র সংগঠনের কিছুসংখ্যক প্রার্থীর ফরমে লিখলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নিয়ম অনুসারে এদেরকে ভর্তি করা যায় না, কিন্তু উপাচার্য ইচ্ছা করলে তার বিশেষ ক্ষমতা বলে ছাত্র ভর্তি করতে পারেন। ছাত্ররা তখন সুযোগ পেল এবং আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগল। কিন্তু আমি যখন কিছুতেই তাদের অন্যায় দাবি মেনে নিলাম না তখন তারা আমার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন করল এবং সফলকামও হল।

যাই হোক, এনামুল হককে কার্যভার গ্রহণ করার আগেই সংবর্ধনার ব্যবস্থা করবে – এটা আমি ভাবতে পারিনি। তা ছাড়া কার্যভার গ্রহণের পূর্বে এনামুল হক সাহেবই বা কি করে ভোজের আমন্ত্রণ নিলেন তা ভাবতে আমার অসুবিধা হল। ভোজ-সভায় কারা কারা ছিলেন তার খবর আমি পেলাম। কিন্তু সেখানে পরামর্শ হয়েছিল কি-না অথবা কি পরামর্শ হয়েছিল এবং আদৌ কোন পরামর্শ হয়েছিল কি-না তা আমি জানতে পারিনি। সিরাজুল হক সাহেব আমাকে বললেন, "আপনি মনে রাখবেন যে পৃথিবীতে কেউ কারও আপন নয়, আপনার আপনজন হয়েছেন একমাত্র আল্লাহ। আপনি তাঁর দিকে লক্ষ্য রেখে সকল কাজ করবেন। কাজ করতে গিয়ে কে আপনার পক্ষে রইল অথবা বিপক্ষে গেল তা ভেবে আপনার লাভ নেই। আপনি যদি বিশ্বাস করেন সত্য আপনার পক্ষে তাহলে সেখানেই তো আপনার শান্তি। আমি আমার একান্ত সচিব আরজ আলীকে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমার একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে বললাম। দায়িত্বভার ছেড়ে দেবার আগে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন বোধ করলাম এ কারণে যে আমার বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ আছে কি-না তা জানা দরকার।

ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর একজন নিকটস্থ লোক আমার সঙ্গে আজ দেখা করতে এসেছিল। তার কাছে আমাকে অব্যাহতি প্রদানের ব্যাপারটি কি পরিস্থিতিতে ঘটল জানতে পারলাম। কিছুসংখ্যক ছাত্র নাকি আমাকে অপসারণের জন্য বঙ্গবন্ধুর উপর কিছুদিন ধরেই চাপ সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল। তারা বোঝাতে চাচ্ছিল যে আমি উপাচার্য থাকতে তাদের ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতায় আসতে পারবে না। আমাকে অপসারণ যাতে না করা হয় সেজন্য মনসুর আলী নাকি অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তার চেষ্টায় কোন কাজ হয়নি। আমি ভদ্রলোকের কথা শুনলাম, কিন্তু কোন মন্তব্য করলাম না। কেন বা কিভাবে কি হল

www.pathagar.com

এগুলো জেনে এখন আমার কি লাভ। ভদ্রলোক আমাকে মনসুর আলীর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। আমি বললাম, 'এখন আমি দেখা করব না, দায়িত্বভার হস্তান্তরের পর দেখা করব। এখন দেখা করলে মনে হবে যে আমি কোন না কোনভাবে চাকরিতে বহাল থাকতে চাই, এটা আমার জন্য সম্মানজনক হবে না।'

আত্মীয়-স্বজনের কেউ কেউ আমাকে উপদেশ দিলেন বিদেশে কোথাও চাকরি খুঁজে নিতে। আমার শ্যালক বাবলু এ ব্যাপারে খুবই স্পষ্টভাষী ছিল। সে বলল, "দেশের যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি তিনি যদি আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন তাহলে ভবিষ্যতে আমার জন্য অসুবিধা হতে পারে।" তার কথায় আমি একবার একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, ভেবেছিলাম শিকাগোতে প্রফেসর দিমককে একটি চিঠি লিখি। তিনি সেখানে আমার জন্য চাকরির ব্যবস্থা করতে পারেন কি না। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করলাম, কিন্তু তিনি সায় দিলেন না। এর ফলে আমাদের চট্টগ্রাম ফিরে যাবার সিদ্ধান্তটি অটুট রইল। এদিকে আস্তে আস্তে আমার স্ত্রী আমাদের মালপত্র গুছিয়ে ফেলছিলেন। কেননা দুই তারিখে ক্ষমতা হস্তান্তর করেই চট্টগ্রাম রওয়ানা হতে হবে। হাতে সময় খুব কম।

সন্ধ্যার পর নারিন্দায় শাহ সাহেব সৈয়দ নজরে ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং আমার সাম্প্রতিক অবস্থাটি তাকে খুলে বললাম। তিনি একটি কথা বললেন যা আমার মনে বেশ দাগ কাটল। তিনি বললেন, "দেখুন চাকরি ক্ষেত্রে তো পরিবর্তন থাকে, সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল জীবনে ঈমানের সঙ্গে এবং সম্মানের সঙ্গে আপনি বেঁচে থাকতে পারছেন কি না। হঠাৎ আপনাকে সরিয়ে দেয়ার ফলে কিছু লোক ধারণা করতে পারে যে, নিশ্চয়ই আপনি কিছু অন্যায় করেছিলেন, সে জন্য সরিয়ে দেয়া হল। তবে আমার বিশ্বাস আপনার সম্মান কেউ নষ্ট করতে পারবে না। আজ হোক কাল হোক আপনি নতুন করে আবার সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হবেন। আসুন আমরা আল্লাহর কাছে মোনাজাত করি, তিনি যেন আপনার সম্মান অক্ষুণ্ন রাখেন এবং আপনাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেন।"

আমি পারিবারিকভাবে নারিন্দায় শাহ সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে অনেকদিন ধরে যুক্ত। কখনও মনে কোন অশান্তি এলে আমি তার কাছে গিয়ে থাকি এবং তার কথায় সান্ত্বনা পাই। তিনি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান এবং বিবেচক ব্যক্তি। মানুষের অসুবিধা, বিপদ এবং দুঃখের দিনে তাদের পাশে এসে দাঁড়ান। আমাদের দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি তার কাছে গিয়ে থাকেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকেও আমি তার ওখানে দেখেছি। তা ছাড়া এমন অনেক লোককে সেখানে দেখেছি যারা তথাকথিত সমাজতন্ত্রবাদী এবং ধর্ম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন না। ডঃ আখলাকুর রহমানকে একদিন আমি সেখানে দেখেছিলাম।

নারিন্দা থেকে ফেরার পর দেখি যে ধানমণ্ডির বাসায় সিকান্দার এবং তার স্ত্রী অপেক্ষা করছে। তারা আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে তাদের বাসায় চট্টগ্রামে চলে যাবার আগে যেতে বলল। সিকান্দারকে পুরনো দিনের মতো উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত দেখলাম না – এ কথা বলতেই সিকান্দার জানায় যে, সে বেশ কিছুদিন ধরে হাঁপানিতে ভুগছে।

www.pathagar.com

২৫-১-৭৫

সকাল বেলা আরজ আলী জানালেন যে, গতকাল তিনি বঙ্গবন্ধুর সচিবালয়ে যোগাযোগ করে কোন ফল পাননি। তার কাছে মনে হয়েছে যে সাক্ষাৎ দান প্রসঙ্গটি তারা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। আমি একটু অবাক হলাম। এরকম তো অতীতে কখনও হয়নি। অতীতে যখনই আমি সাক্ষাৎ চেয়েছি তখনই সাক্ষাৎ পেয়েছি। তাছাড়া অনেক সময় সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত না থাকলেও প্রয়োজনবোধে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি, কোন অসুবিধা হয়নি। আমি আরজ আলীকে চেষ্টা করে যেতে বললাম। তাকে বললাম যে আমি আগের মত দরজা ঠেলে ভেতরে যাব – এমন অবস্থা এখন নেই। তাই এখন একটু ফর্মাল ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। অধ্যাপক এম.আই. চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, "চলুন মল্লিকের কাছে যাই। সেতো এখন ঢাকায় এসে উপস্থিত হয়েছে এবং মন্ত্রিসভায় এসে যোগ দিয়েছে। সে বঙ্গবন্ধুর নিকটের লোক, সুতরাং তার মাধ্যমে চেষ্টা করা যেতে পারে।" আমরা মল্লিক সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি জানালেন, "চিন্তার কোন কারণ নেই, সাক্ষাতের ব্যবস্থা হবে।"

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সাহিত্যকর্মে কোন বাধা পড়েনি, দ্রুততা কমে গিয়েছিল মাত্র। এ সময় একটি ভাল বই তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। বইটির নাম 'রবীন্দ্রনাথ কাব্য বিচারের ভূমিকা'। বইটি ছাপা হয়ে বেরিয়েছে। বইটি উৎসর্গ করেছি ডঃ প্রবোধচন্দ্র সেনকে। তার মত উদার নিরহঙ্কার এবং ধর্মগত ভেদবুদ্ধিহীন মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। ১৯৭১ সালে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটলেও আমরা পূর্ব থেকেই একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। কি করে যেন কবি মধুসূদনের ওপর লেখা আমার একটি বই তার হাতে পড়েছিল। বইটি তার ভাল লেগেছিল এবং সে কথা তিনি একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ওপর আমার বইটি পুরোটাই মুখে মুখে বলা। আমার পি. এ. আরজ আলী অফিসে বসে কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে ডিকটেশন নিয়েছে এবং এভাবে কয়েক মাসের মধ্যে পুরোপুরি বইটি তৈরি হয়েছিল। প্রবোধ সেনের কাছে বইটি এখনও পাঠাইনি, কদিনের মধ্যে পাঠাব।

সনজীদা খাতুন এবং হালিমা খাতুন দেখা করতে এল। সনজীদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্রী ছিল, পরে সে শান্তি নিকেতনে গিয়ে এম. এ. করে। প্রবোধ সেনের সঙ্গে আমার যোগাযোগের একটি সূত্র ছিল সনজীদাও। হালিমা আমার সরাসরি ছাত্রী না হলেও দীর্ঘকাল থেকেই সে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। এরা আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে কিছু জানতে চাইল। আমি বললাম, "আমি আমার পুরনো কর্মক্ষেত্র চট্টগ্রামে যাব এবং বাকি জীবনটা শিক্ষকতা কর্মে নিজেকে নিযুক্ত রাখব। প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে মুক্তির ফলে আমি কাজ করবার প্রভূত সময় পাব এবং সাহিত্যকর্মে নিবিষ্টচিত্ত হতে পারব। আমার স্ত্রী সব সময় একটি জায়গায় স্থির হয়ে সংসার গড়ে তুলতে চাইতেন। এবার আশা করি তার সে সুযোগ আসবে। তবে মানুষ ভাবে এক এবং সময় অনেক ক্ষেত্রে অন্য কিছু ঘটিয়ে দেয়। এরকম হলে অবশ্য আমার কিছু করবার নেই।"

শিল্পী রশীদ দেখা করতে এল। তাকে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিয়ে এসেছিলাম। আমার চেষ্টায় এবং আগ্রহে চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ খোলা হয়। অবশ্য উপাচার্য ডঃ মল্লিকের সমর্থন এবং সহানুভূতি না থাকলে সম্ভব হত না। এই বিভাগের নাট্যতত্ত্ব শাখাও ছিল। আমি রশীদ চৌধুরীকে নিয়েছিলাম শিল্প শাখায় এবং জিয়া হায়দারকে নিয়েছিলাম নাট্যতত্ত্ব শাখায়। পঠন-পাঠনের দায়িত্বে আমিও ছিলাম। মূলত আমি এবং রশীদ চৌধুরী চারুকলার পাঠ দিতাম। শিল্পের তত্ত্বগত এবং ঐতিহাসিক দিকটা পড়ানোর দায়িত্ব নিয়েছিলাম আমি। রশীদ চৌধুরী এবং আমি শিল্পের নির্মাণকৌশল এবং শিল্পবোধ নিয়ে আলোচনা করতাম। অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আমরা শিল্পকলা বিভাগটি গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রশীদ চৌধুরী তার ব্যবসায়িক দিকটি রক্ষা করতে গিয়ে চট্টগ্রাম ছেড়ে ঢাকায় চলে এল। তার শিল্প ছিল বয়নধর্মী টেপেস্ট্রী। দেশে এর একটি চাহিদা ছিল। এই চাহিদার যোগান দিতে গিয়ে ঢাকায় তার একটি কারখানা খুলতে হয় এবং শেষমেষ সে ঢাকায় চলে আসে। রশীদ চৌধুরীর প্রতি আমি একটু বিরূপ হয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম সে পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগটি গড়ে তুলবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হল না। রশীদ চৌধুরীকে ১৯৫৮ কি '৫৯ সালে আমি যখন প্যারিসে দেখি তখন সে উজ্জ্বল দীপ্তিময় যুবক, হর্ষোৎফুল্ল এবং প্রাণবন্ত। আমি যখন বাংলা একাডেমীতে যোগ দেই তখন সে প্রশিক্ষণ শেষে ঢাকায় ফিরে এসেছে। সে স্বাভাবিকভাবেই আর্ট স্কুলের শিক্ষক হবে এটা আমি ধারণা করেছিলাম, কিন্তু স্কুলের অভ্যন্তরে একটি সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের ফলে সে তার চাকরি হারাল। তখন আমি তাকে বাংলা একাডেমীতে প্রকাশন বিভাগে চাকরি দেই। তার দায়িত্ব ছিল বই-এর প্রচ্ছদ আঁকা। শিশু গ্রন্থগুলোর জন্য অভ্যন্তরীণ চিত্র তৈরি করা। শিল্পী হিসেবে রশীদ চৌধুরী একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন। ফরাসি দেশে বিভিন্ন রঙিন সূতা দিয়ে বয়নের সাহায্যে ঐতিহাসিক কাহিনীর চিত্রাঙ্কন চলে আসছে। এই শিল্পটি পরিশ্রমসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ। প্যারিসে লেখাপড়া করতে যেয়ে রশীদ চৌধুরী এই শিল্পধারার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং টেপেস্ট্রীকে আপন শিল্পকর্মের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয়। দেশে ফিরে এসে এই টেপেস্ট্রীর কাজই সে করা আরম্ভ করেছে। সে তার টেপেস্ট্রীতে উজ্জ্বল রঙের সুতো ব্যবহার করে – বিশেষ করে লাল-নীল এবং হলুদ। কাগজে অর্থাৎ ক্যানভাসে আমাদের দেশে হিউমিড আবহাওয়ার দরুন যে উজ্জ্বল রংগুলো ক্রমশ ঔজ্জ্বল্য হারায় টেপেস্ট্রীতে কিন্তু তা হয় না। তার ফলে তার টেপেস্ট্রীগুলো ঔজ্জ্বল্য নিয়ে দীপ্যমান থাকে। আমাদের বঙ্গভবনে আমাদের দেশের ছয়টি ঋতুর রূপ-বৈচিত্র্য নিয়ে রশীদ চৌধুরীর ছয়টি বড় আকারের টেপেস্ট্রী আছে। এগুলোর মধ্যে শিল্পী হিসেবে দক্ষ তা উজ্জ্বলভাবে চিহ্নিত।

রশীদ চৌধুরী আমার ওখানে কিছুক্ষণ থাকল। খুব বেশি কথাও হল না। আমি তার স্ত্রী এবং কন্যার কুশল জিজ্ঞাসা করলাম। রশীদ চৌধুরীর স্ত্রী ফরাসি মেয়ে, কিন্তু অত্যন্ত ঘরোয়া এবং সংসারী।

আমি সব সময় বিশ্বাস করি যে শিল্পচর্চা একটি গভীর সাধনার মত। এ সাধনায় একাগ্রতা না থাকলে এবং বিচ্যুতি ঘটলে সিদ্ধিতে উপনীত হওয়া যায় না। আমাদের দেশের শিল্পীরা শিল্প কুশলতায় অল্প একটু অগ্রসর হয়েই সিদ্ধি পেয়ে গেছেন ভাবেন,

www.pathagar.com

যার ফলে তারা জীবিতকালেই পরিত্যক্ত হন। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন জয়নুল আবেদীন। তাঁর সামগ্রিক জীবনটাই শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোত ছিল। এদেশের অনবরত পরিবর্তনশীল ছন্দমুখর রাজনীতি ক্ষেত্র থেকে তিনি দূরে ছিলেন। তিনি তার শিল্পে রাজনৈতিক কোন বক্তব্য রাখতে চাননি। তার সকল বক্তব্যই ছিল শিল্পগত এবং জীবনগত। কলকাতায় দুর্ভিক্ষের যে ছবি তিনি এঁকেছেন সেগুলো কোন প্রতিবাদের ছবি নয়, কিন্তু মানুষের অসহায় বুভুক্ষার প্রতিকৃতি। আমি আশা করেছিলাম রশীদ চৌধুরীও এরকম একজন শিল্পী হিসেবে নিজেকে সবার প্রত্যক্ষে আনবেন, কিন্তু তা হল না।

২৬-১-৭৫

সকালে টেলিফোন পেলাম আবু জাফর শামসুদ্দিনের। তিনি আমার কুশল জিজ্ঞেস করলেন এবং কবি মহিউদ্দিনের অসুস্থতার সংবাদ দিলেন। তিনি আরও জানালেন যে, আমার অপসারণের সংবাদ শুনে মহিউদ্দিন খুবই মর্মাহত হয়েছেন এবং প্রতিদিন সকালে তন্ন তন্ন করে খবরের কাগজ দেখেন কোথাও আমাকে কোন নতুন দায়িত্ব দেয়া হল কিনা। কবি মহিউদ্দিন আমার শুভাকাঙ্ক্ষী এবং আন্তরিকভাবে আমার প্রতি সহানুভূতিশীল। দেশ বিভাগের পূর্বে তিনি বিভিন্ন বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং রাজনৈতিক প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভকে তিনি আদর্শ বলে মনে করতেন। তবে তিনি একান্তভাবে মানবতাবাদী ছিলেন। মহামানবের মহাজাগরণ বলে তাঁর একটি বই সে সময় খ্যাতি পেয়েছিল। দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং সে সময়ই তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক। গোপীবাগে থাকতাম। সে সময় একদিন মহিউদ্দিন সাহেব এলেন এবং আমার সঙ্গে পরিচিত হলেন। ভদ্রলোক শ্যামলা, মাঝারি গড়নের এবং মুখভঙ্গির মধ্যে একটা দৃঢ়তা লক্ষ্য করলাম। তিনি পরিচয় দিয়েই বললেন, "আমি একটি প্রশ্ন নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি কি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন?" এ ধরনের আকস্মিক প্রশ্নে হতবুদ্ধি হওয়ার কথা; যার সঙ্গে পরিচয়ই গড়ে ওঠেনি, তিনি হঠাৎ করে এ ধরনের প্রশ্ন করে বসবেন যা আমি ভাবতেই পারিনি। আমি নিঃসংশয়ে উত্তর দিলাম, "আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি বলেই আমি আমার নিজের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। পৃথিবীর সকল কর্মপ্রবাহ, মানুষের প্রাণধারণ, সৌরজগতের পরিক্রমা সবকিছুই একটি শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। যেহেতু এ শৃঙ্খলা বিদ্যমান। সুতরাং এই শৃঙ্খলার পশ্চাতে একটি একক অনিবার্য শক্তিই বিদ্যমান। এই অনিবার্য শক্তিই হচ্ছে পরম সত্তা যার স্পর্শ সমগ্র পৃথিবীকে সচল করে রেখেছে।" আমি আরও কি কি বলেছিলাম মনে নেই, সম্ভবত আবেগের তাড়নায় আরও অনেক কিছু বলেছিলাম। আমি যখন কথা বলছিলাম সর্বক্ষণ মহিউদ্দিন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। আমার বলা শেষ হলে মহিউদ্দিন সাহেব মন্তব্য করলেন, "আপনার প্রবল বিশ্বাস দেখে আমার ভাল লাগল, আপনি জীবনে কখনো দুঃখ পাবেন না। আমার অসুবিধা হচ্ছে যে, আমি কখনো সংশয় কাটাতে পারি না"। সেদিনের সেই পরিচয়ের পর ক্রমশ মহিউদ্দিন সাহেব আমার খুব নিকটের মানুষ হয়ে পড়েন। আমি ঢাকা থেকে করাচী চলে যাই এবং দীর্ঘ সাত বছর

www.pathagar.com

পর আবার যখন ফিরে আসি তখন মহিউদ্দিন সাহেবকে একজন বিশ্বাসী, শান্ত এবং ধীর-স্থির মানুষ হিসাবে পাই। কিন্তু তিনি তখন আর রাজনীতিতে নেই, কোন রকম বিপ্লবী চিন্তাতেও নেই। শুধু নির্বিরোধী সাহিত্য করে যাচ্ছেন। আমার বাংলা একাডেমীর সময়কালে তিনি প্রায় প্রতিদিন আমার ওখানে আসতেন। তাকে দিয়ে আমি একাডেমীর অনেক কাজ করিয়ে নিয়েছিলাম। তিনি তখন ফতুল্লায় একটি ছোট-খাট বাড়ি করেছিলেন এবং সেই বাড়িতেও আমি কয়েকবার গিয়েছি। পাকিস্তান সরকার সে সময় সাহিত্যিক এবং শিল্পীদের জন্য বাৎসরিক অর্থ সাহায্য এবং পুরস্কার প্রবর্তন করেছিল। এটাকে 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' বলত। মহিউদ্দিন সাহেব এই 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' পেয়েছিলেন। মূলত আমার চেষ্টা এবং লবিংয়ে তিনি পুরস্কারটি পান। ঢাকার 'রাইটার্স গিল্ড' আবদুল কাদিরের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মহিউদ্দিন যখন পুরস্কারটি পেয়ে গেলেন এবং আবদুল কাদির দু'হাত উত্তোলন করে নিজের ক্ষুব্ধতা প্রকাশ করলেন এবং এক পর্যায়ে আমাকে তিনি শাসিয়ে গেলেন যে, এর ফল ভাল হবে না। এ ঘটনার পর থেকে মহিউদ্দিন আমার খুব কাছের মানুষ হয়ে গেলেন। আমি যখন বাংলা একাডেমী ছেড়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম তখন আমার অনুপস্থিতির বেদনা নিয়ে লেখা একটি কবিতা তিনি 'সওগাত'-এ ছেপেছিলেন। একাডেমীর যে ঘরে আমি বসতাম সে ঘরের দেয়ালে কিছু চিত্রকর্ম টাঙ্গান ছিল। আমার বাঁ হাতের সেলফের উপর কিছু পুরনো পাণ্ডুলিপি সাজান ছিল। টেবিলের একপাশে এক গুচ্ছ গোলাপ ফুল শোভা পেত। মহিউদ্দিন তার লেখায় এগুলোর কথা লিখেছিলেন।

চট্টগ্রাম থেকে যখন মাঝে মাঝে ঢাকায় আসতাম তখন যেভাবে পারি মহিউদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতাম। তারপর মুক্তিযুদ্ধ এল। কিছু সময় দেশের বাইরে রইলাম। প্রত্যাবর্তনের পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব যখন গ্রহণ করি মহিউদ্দিন সাহেব শুভ কামনা জানাতে এসেছিলেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যকালের সময় আমাদের সাক্ষাৎকার বিরল হয়ে উঠেছিল। তিনি নিজেই বলেছিলেন, "আপনার কর্মব্যস্ততা এখন অনেক। সুতরাং আপনাকে আগের মত বিরক্ত করব না। আগের মত আর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হত না। কখনও কখনও ফতুল্লা থেকে ঢাকায় এলে তিনি টেলিফোনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। আমার মানসিক প্রসন্নতার জন্য মহিউদ্দিন সাহেবের অস্তিত্ব আমার কাছে একটি বিরাট সম্পদ ছিল। তার মতো বন্ধু আমার খুব কম ছিল এবং এখনও খুব কম আছে। আবু জাফর শামসুদ্দিন সাহেবের মুখে মুহিউদ্দিনের অসুস্থতার সংবাদ শুনে দুঃখ পেলাম। ঠিক করলাম দু'এক দিনের মধ্যে সময় করে তাকে দেখতে যাব।

২৯-১-৭৫

আজ আরজ আলী জানালেন যে, পহেলা ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুমতি মিলেছে। যাক একটা চিন্তা গেল।

আমার স্কুল জীবনের বন্ধু আবদুল খালেকের স্ত্রী তার মেয়েকে নিয়ে দেখা করতে এলেন বেলা ১০টার দিকে। আরমানিটোলা স্কুলে আবদুল খালেক আমার সহপাঠী ছিল

www.pathagar.com

চতুর্থ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত। আমার সহপাঠীদের মধ্যে খালেকই ছিল সবচেয়ে চঞ্চল এবং সেয়ানা। সে প্রচুর সিনেমা দেখত এবং সিনেমার গল্প আমাদের কাছে বলত। সে-ই আমাকে জীবনে প্রথম একটি ছবি দেখতে নিয়ে গিয়েছিল। ছবিটির নাম আজও আমার মনে আছে – পিয়া পেয়ারা। অভিনয়ে ছিলেন সুলোচনা এবং ডি. বিলিমোরিয়া। ছবিটি এসেছিল ইসলামপুরের লায়ন সিনেমা হলে। ছবি দেখতে বসে আমার কি যে শিহরণ এবং উত্তেজনা তা আমি আজ আর বুঝিয়ে বলতে পারব না। স্কুলে থাকতেই খালেক বলত যে, সে রোমান নভোরোর মত অভিনেতা হবে। আমরা তখনও বুঝতাম না রোমান নভোরো কে বা কি। খালেক তখন রোমান নভোরোর ভঙ্গিতে কিছুটা অভিনয় করে দেখাত। তার জন্য বিপত্তির কারণ হত। সে একবার "মানময়ী গার্লস স্কুল" থেকে অভিনয় করে দেখানোর সময় আমাদের শিক্ষক প্রকাশবাবুর মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল। প্রকাশবাবু তাকে ধরে ইংরেজ হেডমাস্টার টি. জে. কলিন্সের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। এতে বিশেষ কিছু হয়নি। ইংরেজ হেডমাস্টার একবার বেত্র আস্ফালন করে ধমক দিয়েছিলেন মাত্র। খালেক এখন জীবিত নেই। খালেকের স্ত্রীকে দেখে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ল। খালেকের স্ত্রী তার কিছু সমস্যা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদের কয়েকজন প্রতিনিধি দেখা করতে এল। তারা জানাল যে, আমাকে তারা বিদায় অভ্যর্থনা জানাবে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। তাঁরা ঠিক তারিখটা আমার কাছে জানতে চাইল। আমি বললাম, "সামনের মাসে পহেলা ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার দেখা হবে তখন আমি জানতে পারব আমাকে কি করতে হবে। এমনিতে আমি ২ তারিখে চার্জ বুঝে দেব এবং একই তারিখে রাত্রিতে চট্টগ্রাম চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ১ তারিখে সাক্ষাৎকারের ফলে আমার যাওয়াটা যদি বিলম্বিত হয় তাহলে আমি তোমাদের অভ্যর্থনা নিতে পারব।" ছেলেরা তখন ১ তারিখে অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে বলল। শেষ পর্যন্ত আমি স্বীকৃত হলাম যে, যদি আমি ছুটি নিতে পারি তবে চার তারিখ সকালে তাদের অভ্যর্থনায় যোগ দেব, ১ তারিখে আমি পারব না।

কিছুক্ষণের জন্য ভারতীয় দূতাবাসের ডঃ জালাল দেখা করতে এলেন। তিনি জানালেন যে, বাংলা একাডেমী একটি সাহিত্য সম্মেলন হতে যাচ্ছে, সেখানে ভারত থেকে অন্নদাশংকর রায় এবং আরও ক'জন আসবেন। আমি যদি সে সময় ঢাকায় থাকি তাহলে ভাল হয়। আমি বললাম, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর আমি ছুটির ব্যবস্থা নেব, আশা করি সে সময় আমি থাকতে পারব। আমি এ সুযোগে জালালকে কিছু বইয়ের জন্য অনুরোধ জানালাম। বইগুলো মধ্যযুগের অবধী এবং হিন্দী সাহিত্যের ওপর। জালাল বলল যে, বইগুলো যদি দোকানে পাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই সে সেগুলো আমাকে দেবার ব্যবস্থা করবে।

আজ শুনলাম যে, দু'একদিনের মধ্যে গৌরকিশোর ঘোষ ঢাকায় আসবে। গৌরকিশোরের বাড়ি আমাদের যশোর এলাকায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার সাথে আমার কলকাতায় সাক্ষাৎ হয়। সে সময় সে আমাকে কলকাতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়ে

www.pathagar.com

গিয়েছে। একদিন সন্ধ্যার সময় তার লেখা সাগিনা মাহাতো গল্পটির নাট্যরূপ দেখেছিলাম। গৌরকিশোর ঘোষ আনন্দবাজার গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত আছে বটে তবে সেখানে সে স্বকীয়তা নিয়ে চলাফেরা করে। শিবনারায়ণ রায়ও ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা আসবেন। শিবনারায়ণ আমার আমন্ত্রণে আসছেন বটে, কিন্তু আমি যখন ক্ষমতায় নেই, তখন তার আসা হবে। আমি চট্টগ্রামের জন্য শিবনারায়ণের কয়েকটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করলাম এবং কলকাতায় তাকে তা জানিয়ে দিলাম।

মোস্তফা নুরুল ইসলাম তার বাসায় যেতে বলল পহেলা তারিখ রাতে।

৩০-১-৭৫

সময় মানুষকে অনেক সুযোগ দেয় কিন্তু মানুষ সময়কে পুরোপুরি ব্যবহার করে না। যারা কাজ করে তারা ঘুম থেকে উঠে, গোসল করে পোশাক পরে এবং কাজে চলে যায়; আবার ফিরে আসে কাজ থেকে তখন রাতের শয্যায় যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। প্রাত্যহিক কর্মের ব্যস্ততার এই মানুষগুলো সূর্যোদয়ও দেখে না, সূর্যাস্তও দেখে না। প্রতিনিয়ত শুধু তারা সময়কে হারায়। আমি কিন্তু সব সময় সময়কে ধরে রাখবার জন্য ব্যাকুল থাকি। যত ব্যস্তই থাকি না কেন প্রতিদিন সূর্যোদয়কে দেখতে চাই, আলোর ছোঁয়ায় চমকিত গাছের পাতা দেখতে চাই এবং সন্ধ্যাকালে সূর্যের অস্তমিত হওয়াটা বুঝতে চাই। আমার সময়ের ওপর কর্মের দাবিটা যত প্রবলই হোক না কেন সূর্যটা না দেখে আমি বসে থাকতে পারি না। এ দেখাটা ইচ্ছে করে সময় নিয়ে দেখা। সব সময়ই আমি এই দেখাটির ওপর গুরুত্ব দিয়েছি। এখন যখন ঢাকার অবস্থান গুটিয়ে ফেলতে হচ্ছে তখন ঢাকার সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তকে ভাল করে দেখে যেতে চাই।

আজকে বিশেষ কোন কাজ ছিল না। লোকজনও তেমন একটা আসেনি। বসে বসে ইয়েটস-এর অটোবাইওগ্রাফিজ পড়তে বসলাম। মাঝে মাঝেই আমি এই বইটির কাছে ফিরে আসি। কতকগুলো কারণে ইয়েটস-এর এই বইটি আমার ভাল লাগে। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে তিনি তার শৈশব, যৌবন এবং বিভিন্ন কর্ম-প্রক্রিয়াকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তার লেখার এক জায়গায় বলেছেন, 'আমাদের সমস্ত চিন্তা আবেগের সঙ্গে জড়িত এবং আমরা যে স্থানে অবস্থান করি, আমাদের বোধের ক্ষেত্রে তার কোন অতীত এবং বর্তমান নেই। সেটা শুধু আমাদের অবস্থিতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমি জীবন-যাপন করব কবিতার মধ্যে শব্দোচ্চারণের মধ্যে এবং স্বপ্নের মধ্যে। মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়া বাস্তবকে যেমন গ্রহণ করে, স্বপ্নকেও তেমনি গ্রহণ করে।' ইয়েটস-এর এই বইটি একটি অনবদ্য মুখরতায় আমাকে অভিভূত করে। এই বইটি পড়ে মনে হল আমি আত্মজীবনী লেখায় হাত দিলে বোধ হয় ভাল হবে। তাতে প্রতিদিনের ঘটনাগুলো ডাইরিতে লিখে রাখি তাতে যে কোন সময় আমি আমার জীবনের কথা লিখতে পারব বলে আমার বিশ্বাস আছে।

৩১-১-৭৫

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করলাম। ইচ্ছে করে এসেছিলাম এখানে যাতে পরিচিত লোকদের সঙ্গে দেখা হয়। নামাজের শেষে অনেকের

www.pathagar.com

সঙ্গে কুশল বিনিময় করলাম। আরবি বিভাগের ডঃ ইসহাক হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর পর্যন্ত আমার সঙ্গে এলেন। আমি চলে যাচ্ছি শুনে তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। ডঃ ইসহাককে আমি দীর্ঘকাল ধরে দেখছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যখন ছিলেন তখন তিনি পি.এইচডি. গবেষণা করছিলেন। সে সময় থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। ভদ্রলোক অত্যন্ত সহানুভূতিপরায়ণ এবং মানব হিতৈষী। আজকে হাঁটতে হাঁটতে অনেক কথা বললেন।

৩-২-৭৫

আজ সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংসদের পক্ষে সাভার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমাকে বিদায় জানান হল। এনামুল হক সাহেব আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, কিন্তু আসেননি। ছাত্ররা আমাকে কিছু কলম এবং বই উপহার দিল। অনুষ্ঠান শেষে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলের সঙ্গে দেখা করলাম – প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষা ভবন এবং গ্রন্থাগার ভবন ঘুরে এলাম। গ্রন্থাগারের জন্য অনেক হিন্দী বই আমি ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে আনিয়ে ছিলাম। সেগুলো নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতে কি করবে লাইব্রেরিয়ানকে তা জিজ্ঞেস করলাম। লাইব্রেরিয়ান হেসে বললেন, 'এগুলো স্যার কোন কাজেই আসবে না।' আমিও হেসে বললাম, 'এগুলো তাহলে আমাকেই দিয়ে দিন।'

আমি জীবনে যেখানেই গিয়েছি সেখানেই গ্রন্থাগার গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছি। করাচীতে যখন ছিলাম তখন সেখানে কোন বাংলা বই ছিল না। নানাভাবে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে একটি বাংলা সেকশন গড়ে তুলেছিলাম কিন্তু প্রয়োজনীয় বইয়ের জন্য ভারতীয় দূতাবাসের সাহায্যেরও দরকার হয়েছিল। এরপর যখন বাংলা একাডেমীতে এলাম তখন একাডেমীর গ্রন্থাগারকে একটি গবেষণা সহায়ক গ্রন্থাগারে পরিণত করলাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সময়ে ছিলাম সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের জন্য অনেক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ও তেমনি নানাভাবে পরিপূর্ণ করবার চেষ্টা আমি করেছিলাম। গ্রন্থের প্রতি আমার মোহ খুব প্রবল। আমি গ্রন্থ সংগ্রহকে বিত্তসংগ্রহের সঙ্গে তুলনা করি। আমি মনে করি যে, তিনি যথার্থ বিত্তবান যার অনেক গ্রন্থ আছে। গ্রন্থ যদি শুধুমাত্র অলঙ্কার হিসেবে শোভা পায় তাতেও ক্ষতি নেই। এ অলঙ্কার প্রাণকে দীপ্ত করে এবং হৃদয়কে আশ্বস্ত করে।

৪-২-৭৫

আমার এক বোনঝির জামাই আছে, সে দেশে ভাল চাকরি করছে, সামাজিক প্রতিষ্ঠা আছে কিন্তু সে আমেরিকায় চলে যেতে চায়। আমেরিকায় যাবার ইচ্ছাটা তার একটি নেশার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি তাকে বললাম, তুমি দেশে যে উপার্জন করছ তাতে তুমি সচ্ছল অবস্থায় রয়েছ। তোমার সামাজিক একটি প্রতিষ্ঠা আছে। তোমার আত্মীয়-স্বজনরা সবাই সম্ভ্রান্ত, বৈবাহিক সূত্রে যাদের পেয়েছ তারাও মর্যাদাবান ব্যক্তি। তোমার তো কোন অভাব নেই। কি আশায় তুমি আমেরিকায় যাবে? সে উত্তরে যা বলল তাতে আমি হতবাক হলাম। সে বলল যে, অর্থোপার্জনই তার একমাত্র লক্ষ্য। অর্থাৎ সে জীবনটাকে প্রাচুর্যে ভরে দিতে চায়। সে তার আত্মীয়-স্বজনকে টাকা দিয়ে সাহায্য দিতে

www.pathagar.com

চায়, পিতা-মাতাকে প্রচুর টাকা দিতে চায়, তাদের কাছে সে জন্মসূত্রে ঋণী। অন্য কোনভাবে না হলেও টাকা দিয়ে সে ঋণের কিছুটা শোধ করা প্রয়োজন মনে করে। আমি তার যুক্তিতে বিরক্ত হলাম এবং দুঃখিত হলাম। আমি শুধু বললাম, "তোমার কি দেশের কোন প্রয়োজনে আসবার ইচ্ছে করে না?" সে নিশ্চিন্তে বলল, "মামা দেশ কি আমাদের কাছে কিছু চায়, দেশ শুধু সুযোগ সন্ধানী সুবিধাবাদীদের চায়। আমি তাই দেশের জন্য ভাবি না। আমি শুধু আমার জন্য ভাবতে চাই। এ কথার পর আমি আর কিছু বললাম না। বিকেল বেলা মাগুরা থেকে আমার চাচাতো ভাই সুবা এল। মাগুরায় আমার সাহায্য নিয়ে সে একটি কলেজ গড়ে তুলেছে। আমার বাড়ির পাশে একজন হিন্দু শিল্পপতির দশ একরের মত জমি ছিল। দীর্ঘকাল ধরে তারা পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে। কিন্তু জন্মভূমিতে তার এক মামা আছেন। সম্পূর্ণ জমিটা তারা কলেজের জন্য দান করেছেন। তাছাড়া কলেজ ভবন নির্মাণের সময় তাঁরা নানা উপকরণ দিয়েও সাহায্য করেছেন। সুবা কঠোর পরিশ্রম করে কলেজটাকে দাঁড় করিয়েছে এবং আমি সরকারকে বলে কলেজের জন্য অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেছি। সুবা এই সাহায্যের টাকা নিতে ঢাকায় এসেছে এবং আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছে যে, কলেজে একটি কৃষি বিভাগ খুলবে কিনা। সে আরও বলল যে, যশোর বোর্ডের কর্তৃপক্ষ কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করবার অনুমতি দিচ্ছে না। তাই অনুমতিটা প্রয়োজন। আমি বললাম যে, শিক্ষামন্ত্রীকে বলে আমি কিছু করতে পারি কিনা দেখব। তবে আমি আবার চট্টগ্রামে চলে যাচ্ছি, সুতরাং বিশেষ কিছু করতে পারব বলে মনে হয় না।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সুবা আমার বিরোধী পক্ষ ছিল। সে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। সে জন্য তার প্রতি আমি খুব বিরূপ ছিলাম। তবে কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সে ক্রমশ জনসাধারণের মধ্যে তার একটি গ্রহণযোগ্যতা নির্মাণ করবার চেষ্টা করছে। তাছাড়া মাগুরা অঞ্চলে আমাদের অনুগত লোক প্রচুর। তারা সুবাকে অনেক বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন। এখনো পারিবারিকভাবে আমি এবং আমার স্ত্রী সুবাকে এড়িয়ে চলি এবং প্রশ্রয় দিতে চাই না।

৫-২-৭৫

আজ বিকেলে আরজ আলী দেখা করতে এসেছিলেন। ভদ্রলোক আমার সামনে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু কথা বললেন না। তাকিয়ে দেখি তার চোখে পানি টলটল করছে। আমি আস্তে আস্তে বললাম, 'আরজ আলী সাহেব, দুঃখ করবার কিছু নেই। আমাকে তো চলে যেতেই হত। এক বছর আগে চলে গেলাম এই যা। আপনি যতদিন চাকরি করবেন ততদিন একের পর এক কয়েকজন উপাচার্যকে পাবেন – এটাই নিয়ম। আমার সঙ্গে আপনার একটি সহানুভূতি এবং মমতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এখন বরঞ্চ আমাদের সম্পর্কটা আরও সহজ হবে।' আরজ আলী সাহেব বললেন, "আমি যে জন্য প্রচণ্ড দুঃখ পাচ্ছি তা হচ্ছে যারা এতদিন আপনার কাছ থেকে সুবিধা নেবার চেষ্টা করেছে এবং সব সময় আপনার পাশাপাশি থাকার চেষ্টা করত তারাই এখন আপনার বিরুদ্ধে নানা কথা বলে নতুন উপাচার্যের কান ভারি করছে। এর

www.pathagar.com

মধ্যে অধ্যাপকরা আছেন, আবার প্রশাসনের দু'একজন কর্মকর্তাও আছেন। তারা কি সব বলছে এটা শুনলে আপনি দুঃখ পাবেন।" আরজ আলীর কথায় হেসে বললাম, "আপনি যা শুনেছেন তা আমার শোনার দরকার নেই। বানিয়ে কথা বলা খুব সহজ এবং কিছু কিছু লোকের এ ব্যাপারে খুব দক্ষতা আছে। এসব কথায় আমার কোন ক্ষতি হবে না। আপনি নিশ্চিত থাকুন এবং সততার সঙ্গে কাজ করে যাবেন।"

আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে আরজ আলীকে পেয়েছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে আরজ আলী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। আরজ আলী অত্যন্ত আন্তরিক এবং নিষ্ঠাবান চরিত্রের লোক। যে কোন দায়িত্ব তাঁকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম। ফাইল নিয়ে সচিবালয়ে যাওয়া এবং সেখান থেকে ফাইল বের করে আনার কাজটি আরজ আলী অত্যন্ত সহজে পারতেন।

আমি লক্ষ্য করেছি যে, একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তির নিকট প্রিয়পাত্র হওয়ার সহজ উপায় হচ্ছে পূর্ববর্তী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কথা বলা। আমার চাকরি জীবনে এটা অনেকবার দেখেছি। যেহেতু মানুষ সহজেই প্রশংসায় বিগলিত হয় সুতরাং তার পূর্ববর্তী ব্যক্তির অপ্রশংসায় সে আনন্দিত হয়। বাংলা একাডেমীতে যখন আমি যোগ দিলাম তখন সেখানে এ ধরনের কথা আমাকে শুনতে হয়েছিল। একজন কর্মচারীকে আমি বলেছিলাম, "আপনি যে আমার কাছে আমার পূর্ববর্তী পরিচালকের বিরুদ্ধে বলছেন এটা কি ঠিক হচ্ছে? আপনি তো এখনও আমাকে জানেন না। আমি তো আরও খারাপ হতে পারি।" ভদ্রলোক তখন খুব বিব্রতবোধ করেছিলেন। আজ আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলে যাচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিরুদ্ধে কথা বলে নতুন উপাচার্যের কান ভারি করা হচ্ছে। যারা এ কাজটা করছেন তাঁরা আমার সময়ে যেমন সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন, নতুন উপাচার্যের আমলেও তাই করবেন। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষ সততার সঙ্গে কাজ করতে চায় না, সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য কাজ করে থাকেন। সে সব সুযোগ-সুবিধার জন্য তারা নানা ধরনের অপকৌশল অবলম্বন করে।

সন্ধ্যায় খেতে বসে আমার স্ত্রী ধীরে ধীরে বললেন যে, তিনি ডায়াবেটিক রোগী, ঢাকায় থাকা তাঁর জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল। চট্টগ্রামে কি ব্যবস্থা হবে তিনি বুঝতে পারছেন না। আমি হেসে বললাম, "চট্টগ্রামেও মেডিকেল কলেজ আছে। আমাদের পরিচিত ডাক্তারও আছেন। ডাঃ গোলাম মোস্তফা আছেন তিনি তোমাকে আগেও দেখেছেন। সুতরাং আমার মনে হয় আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। তবে খুব প্রয়োজন হলে ঢাকায় এসে ইবরাহীম সাহেবকে দেখাব।" আমার স্ত্রী কিছু বললেন না।

আজ আহমদ পাবলিশিং হাউজের মহিউদ্দিন সাহেব এসেছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম যাবার আগে তাঁর ওখানে খেতে বললেন। ভদ্রলোক খুব নিষ্ঠাবান মুসলমান এবং খুবই সৎ ব্যবসায়ী। আমার কিছু বই তার কাছে আছে। নিয়মিত সেগুলোর হিসেব দিয়ে থাকেন এবং অর্থ প্রাপ্য থাকলে সঙ্গে সঙ্গে তা পরিশোধ করেন। খুবই সাধারণ অবস্থা থেকে তিনি নিজে বড় হয়েছেন। দেশ বিভাগের পূর্বে তিনি কলকাতায় কবি গোলাম মোস্তফার পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দেশ বিভাগের পর ঢাকায় এসে

www.pathagar.com

নিজের একটি স্বতন্ত্র প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তোলেন। প্রকাশক হিসেবে লেখকদের সঙ্গে তিনি সম্পর্ক ভাল রেখেছেন এবং দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে একটি শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। শুধুমাত্র এটাই নয়, তাঁর পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি একটি সামাজিক বন্ধনও গড়ে তুলেছেন। কেউ অসুবিধায় পড়লে তিনি তার পাশে গিয়ে দাঁড়ান, ঈদ এবং অন্যান্য উপলক্ষে তাদের কথা স্মরণ করেন, কেউ রোগাক্রান্ত হলে তার রোগশয্যার পাশে এসে বসেন। ১৯৭৯ সালে আমি যখন অসুস্থ হয়ে পিজি হাসপাতালে ভর্তি হই, তখন তিনি প্রতিদিন হাসপাতালে দেখতে যেতেন। ফররুখের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এবং শ্রদ্ধা খুবই প্রবল ছিল। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর ফররুখের প্রতি অনেক অবিচার করা হয়েছিল। মহিউদ্দিন সাহেব তার প্রতিকার করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং সফলকামও হয়েছিলেন। তিনি তৎকালীন মন্ত্রী খন্দকার মোশতাকের কাছে ফররুখের বিপদের কথা বলেছিলেন এবং মোশতাক সরকারের তরফ থেকে রিহেবিলিটেড করবার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নিয়েছেন। খন্দকার মোশতাক এবং মহিউদ্দিন সাহেব একই অঞ্চলের বাসিন্দা এবং একে অপরের বন্ধু।

৬-২-৭৫

বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঘটনা আমার কানে আসতে লাগল। যতদিন না অন্যত্র যাচ্ছি ততদিন এ রকম ঘটতেই থাকবে। আমাদের স্বভাব হচ্ছে এক জায়গার কথা অন্য জায়গায় লাগান এবং আনন্দ পাওয়া। আমিও যে এর থেকে মুক্ত তা বলতে পারি না। কেননা আমিও এসব কথা শুনি এবং কখনও কখনও হয়তো আনন্দ পাই। আজ বিকেলে ডলার এসেছিল। সে এসে নতুন উপাচার্যের কার্যবিধির একটি উদাহরণ দিল। তিনি নাকি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশ করে অনেক কাঁঠাল গাছ দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিতে কতগুলো কাঁঠাল গাছ আছে। কেউ এর সঠিক উত্তর দিতে পারেননি বলে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। বলেছিলেন, "গাছ গুনে রাখেননি। এখানে গাছ যদি চুরি হয়ে যায়, তাহলে কি করবেন?" পরে অফিসে বসে ফাইলে লিখলেন, "অবিলম্বে পনস বৃক্ষের সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান চাই। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্য থেকে ৪ জন অক্ষরজ্ঞ ব্যক্তিকে বৃক্ষ চিহ্নিতকরণের কাজে নিযুক্ত করুন।" ফাইলটা ডেপুটি রেজিস্ট্রার ডলারের কাছে এল। সে অক্ষরজ্ঞ কথাটার অর্থ করতে পারল না। সে ভাবল এর অর্থ তো নিরক্ষর। নিরক্ষর লোকেরা কি করে গাছে নম্বর দাগবে। সে তাড়াতাড়ি উপাচার্যের কাছে এল। উপাচার্য তার বক্তব্য শুনে মহাক্ষিপ্ত হলেন। বললেন : 'আপনারা সব অকাট মূর্খ। আমি লিখেছি অক্ষরজ্ঞ অর্থাৎ যার অক্ষর জ্ঞান আছে। আপনারা এ শব্দটাও জানেন না। কি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করেন?' আমি ডলারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন তুমি তাহলে কি করছ?' ডলার বলল, 'আমি লোক লাগিয়ে দিয়েছি। তারা পনস গাছের গায়ে আলকাতরা দিয়ে এক, দুই, তিন লিখে যাচ্ছে।'

আমি তখন ডলারকে বাংলা একাডেমীর অভিজ্ঞতার কথা বললাম। এনামুল হক সাহেবের পরে একাডেমীর দায়িত্বভার আমি পেয়েছিলাম। প্রথম যে ফাইলটা আমার

www.pathagar.com

হাতের কাছে এল, তাতে লেখা ছিল 'ইঁদুর বিষয়ক'। সে ফাইলটা পাঠ করে আমি একা একা অনেকক্ষণ পর্যন্ত হেসেছিলাম। একাডেমীর মুদ্রিত পুস্তকগুলো যে ক্ষুদ্র কক্ষে রাখা হয়েছিল সেখানে ইঁদুরের আগমন ঘটায়, 'প্রকাশনাধ্যক্ষ' পরিচালকের নিকটে 'মুখ্যাধ্যক্ষ'-এর মাধ্যমে ইঁদুর মারার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু পরিচালক মহোদয় সহজে অনুমতি দেননি। তিনি জানতে চেয়েছিলেন কিভাবে ইঁদুরকে হত্যা করা হবে এবং নিহত ইঁদুরগুলোকে কে বাইরে ফেলে দিয়ে আসবে। প্রকাশনাধ্যক্ষ এর উত্তরে যখন লিখলেন যে, ইঁদুর মারার এক প্রকার যন্ত্র পাওয়া যায়, যে যন্ত্রের ধারালো মুখ দু'পাশে খুলে রাখা হয় এবং মাঝখানে খাবারের পুটলি বেঁধে রাখতে হয়। খাবারের পুটলিকে ইঁদুর আক্রমণ করা মাত্রই একটি চাপ পড়ে এবং তার ফলে দু'পাশে ধারালো মুখ ছুটে এসে ইঁদুরকে কেটে ফেলে। পরিচালক মহোদয় এ ধরনের যন্ত্র কিনতে নিষেধ করে নির্দেশ দিলেন। কেননা এ ধরনের যন্ত্রের মধ্যে কোন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পা আটকে গেলে ভয়ানক গোলযোগের সম্ভাবনা। এই রকম লেখায় ফাইলটি কন্টকিত এবং এভাবে প্রায় ছ'মাস সময় অতিবাহিত হয়। পরে দেখা যায় যে, এই সময়ের মধ্যে ইঁদুর গুদামের সব বই কেটে শেষ করে দিয়েছে। এই ঘটনা শুনে ডলার হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। আমি ডলারকে বললাম, "এনামুল হক চিরকাল সরকারী চাকরি করে এসেছেন। সুতরাং সরকারী কোন ক্ষতি হতে দিতে চান না। তিনি খুঁটিনাটি বিষয় খুব পর্যবেক্ষণ করেন। তার চরিত্রের এদিকটার কথা মনে রাখলেই তোমরা মানিয়ে কাজ করতে পারবে।

সন্ধ্যার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সুনীল তার স্ত্রী পারিজাতকে নিয়ে দেখা করতে এল। সুনীল বলল, "আপনি যেখানেই থাকুন না কেন আমি কিন্তু মাঝে মাঝে বিরক্ত করব। আপনি আমাকে রাজশাহী থেকে এনেছিলেন এবং আপনার সাহায্যে ঢাকায় আসার পর নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা আমি পেয়েছি। তাছাড়া যখনই আমি কোন বিষয়ে আলোচনা করতে চেয়েছি আপনি বিনা দ্বিধায় আমাকে সময় দিয়েছেন। এ কথা সব সময় আমি মনে রাখব। আমরা সাধারণত উপাচার্যকে প্রশাসক হিসেবে পাই, কিন্তু আপনাকে সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলাম। এটা চিরকাল মনে থাকবে।" আমি সুনীলকে বললাম, "তোমাকে সব সময় আমি আন্তরিকভাবে কাজ করতে দেখেছি। তুমি কখনো ফাঁকি দাওনি। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষ্ঠানে তুমি অংশগ্রহণ করেছ তা আমি জানি। তবে এখন তো তুমি আর উপাচার্য পাবে না, এখন তুমি উপ-মহাধ্যক্ষ পাবে। এনামুল হক সাহেব 'উপাচার্য' শব্দটি পছন্দ করেন না। তিনি তার পরিবর্তে উপ-মহাধ্যক্ষ হওয়া উচিত বলে মনে করেন।'

সুনীল বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন, উনি ইতিমধ্যেই 'উপাচার্য' এর পরিবর্তে 'উপ-মহাধ্যক্ষ' লেখার হুকুম দিয়েছেন।" আমি সুনীলকে বললাম, "এ বিষয়ে এনামুল হক সাহেবের সঙ্গে অতীতেও তর্ক হয়েছে। আমি তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করেছি যে, পাণিনি-র সূত্র মতে যিনি অক্ষকে আবিষ্কার করেন, তিনিই অধ্যক্ষ অর্থাৎ মহাদেব। কিন্তু টোল-বিদ্যাপীঠে যিনি পাঠ দিয়ে থাকেন এবং যিনি টোলের প্রধান তিনি আচার্য। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান অর্থাৎ চ্যান্সেলর হবেন আচার্য এবং ভাইস চ্যান্সেলর হবেন উপাচার্য। এটাই বিধেয়।"

www.pathagar.com

৭-২-৭৫

স্বপ্ন দেখা আমার একটি নিয়মিত ঘটনা। আমার ঘুম কোন দিনই স্বপ্নহীন হয় না। কেন যে এই অবস্থা আমি জানি না। ডাক্তাররা নানা কথা বলেন। কেউ বলেন যে এগুলো হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপের ঔষধ সেবনের প্রতিক্রিয়া, আবার কেউ মনে করেন বাইরে আমি যাই নির্লিপ্তভাব দেখাই না কেন, আমার অন্তর্মুখী সত্তায় সব সময় টেনশান থাকে। এসব কথা আমি বিশ্বাসও করি না। অবিশ্বাসও করি না। আমার স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয় না। একটি স্বপ্ন আমি প্রায়ই দেখি। বহু দুর্গমপথ অতিক্রম করে একটি জনমানব শূন্য নির্জন দুর্গে আমি প্রবেশ করেছি। দুর্গে অসংখ্য কক্ষ অগুনিত সুড়ঙ্গ পথ। দুর্গের অভ্যন্তরে অসম্ভব অন্ধকার, কিন্তু বাইরে পর্যাপ্ত আলো। আমি দুর্গের অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত কক্ষ এবং সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে বাইরের আলোতে এসে উপস্থিত হচ্ছি। কিন্তু তখন ফিরে যাবার পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমি তখন পথের সন্ধানে চলছি। অনন্তকাল ধরে চলছি। কিন্তু যেখান থেকে যাত্রা করেছিলাম সেখান থেকে ফিরে আসতে পারছি না। এরপরই ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। এ স্বপ্ন আমি বহুদিন ধরে দেখছি। স্বপ্নগুলো একটু এদিক-ওদিক হলেও মোটামুটি তাদের ভঙ্গি একই থাকে। গতরাতেও একই স্বপ্ন আমি দেখেছি। অনেক চিন্তা করে আমার মনে হয়েছে যে, আমি জীবনভর স্থান পরিবর্তন করেছি এবং কখনও আমি যে জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম সেখান থেকে কখনও ফিরে আসতে পারিনি। এটা সম্ভবত আমার বিধিলিপি। আমার জীবনে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এবং এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে বারবার গতি পরিবর্তন ঘটেছে এবং সর্বদাই আমি সংকীর্ণ থেকে প্রশস্ততর পথে এবং ক্ষুদ্র থেকে বৃহতের পথে পা বাড়িয়েছি। সম্ভবত আমার স্বপ্নগুলো আমার জীবনেরই প্রতীকগত প্রতিফলন। আমি ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্ব সংক্রান্ত বইগুলো পড়েছি এবং সেগুলোর সাহায্যে আমার নিজের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বের করার চেষ্টা করেছি। আগে বয়স যখন কম ছিল এবং কর্মেরও বিশেষ কোন জটিলতা ছিল না তখন কোন গুরুতর ঘটনাবর্তের স্বপ্ন দেখতাম না। তখন হয়তো পাহাড় দেখতাম, পাহাড়ের চূড়োয় উঠবার চেষ্টা করছি দেখতাম, আবার সমুদ্র বা নদী দেখতাম। দেখতাম যে আমি তরঙ্গ ভেঙে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। তখনকার স্বপ্নেও বিপদ অতিক্রম করে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত ছিল। আমার মানসিকতাই এসব স্বপ্নে আমাকে সাহায্য করছিল কি না জানি না, কিন্তু এটা সত্য যে, আমি কখনও একটি কর্মসাধন ক্ষেত্রে চিরকাল আবদ্ধ থাকতে চাইনি এবং ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর কর্মব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চেয়েছি। আমার স্বপ্নগুলো এ স্বপ্নেরই ইঙ্গিত দেয়।

বিকেল বেলা জহুরুল হক সাহেব এসেছিলেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রচার বিভাগের প্রধান ছিলেন। তিনি তার একটা বিশেষ ভাবনা নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন। তাঁর প্রশ্ন হচ্ছে, প্রচারকর্মটি কাদের জন্য – সরকারের জন্য না জনসাধারণের জন্য? ইতিহাসে তিনি দেখেছেন যে প্রচারগুলো চিরকালই রাজন্যবর্গের জন্য ছিল। জনসাধারণের জন্য ছিল না। কিন্তু বর্তমানকালে মানুষ যখন গণতান্ত্রিকভাবে সজাগ তখন প্রচারের অধিকার জনসাধারণ কেন পাবে না। আমি তাকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার কারণ জানতে চাইলাম। তিনি বললেন যে, তার সঙ্গে সম্প্রতি ইরানে 'ইত্তেলাত'

www.pathagar.com

নামক সংবাদ সংস্থার প্রধানের আলোচনা হয়েছে। উক্ত ভদ্রলোক বলেছেন যে, ইরানের সংবাদ মাধ্যমটি পরিচালিত হয় শাহের নির্দেশে। এ খবরটি শুনে জহুরুল সাহেবের মনে প্রতিক্রিয়া জেগেছে। তিনি ভাবছেন যে জনসাধারণকে নিয়েই তো সংবাদ। তাদেরকে বাদ দিলে তো আর সংবাদ হয় না। কিছুক্ষণ আলোচনা করে জহুরুল হক চলে গেলেন।

সন্ধ্যায় আবু জাফর শামসুদ্দীন সাহেব এলেন। তিনি কবি বেনজীর আহমদ-এর ওপর একটা কিছু লিখবেন বললেন। তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন যে, বেনজীর আহমদের জীবনের কিছু ঘটনা আমি তাকে বলতে পারি কিনা। আমি বললাম, "বেনজীর আহমদকে আমি যতটা জানি আপনি তার চেয়ে বেশি জানেন। তার সঙ্গে পরিচয় আমার ১৯৪০-এর দিকে। কলকাতায় যখন চাকরি করতাম, তখন কখনও কখনও তার সাথে দেখা হয়েছে। কিন্তু গুরুতরভাবে তাকে জেনেছি, এ কথা কখনও বলতে পারব না। তাছাড়া আমাদের পরিচয়-ক্ষেত্র ছিল শুধু কবিতা। আমি বেনজীর আহমদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছুই জানি না।" আমার কথায় শামসুদ্দীন সাহেব অনেকটা হতাশ হলেন।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডিমকের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম। তিনি জানতে চেয়েছেন যে, আমি বর্তমানে কি করছি। ডিমকের সঙ্গে আমার দেখা হয় আমেরিকায়। তারপর থেকে মাঝে মাঝে আমরা পত্র বিনিময় করি। একবার আমার কয়েক মাসের জন্য শিকাগোতে বক্তৃতা করার কথা ছিল। কিন্তু কেন জানি তা হয়ে ওঠেনি। সম্ভবত তারা যাতায়াতের ভাড়া দিতে চায়নি। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ের সল্ট ট্যাকস নামক এক অধ্যাপককে জানি। তিনি একবার ঢাকায় এসেছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

৮-২-৭৫

কোরআন শরীফে সূরা 'আর রাহমান'টি বারবার পড়লেও আমার পড়া যেন শেষ হয় না। প্রতিবারের পাঠে আমি নতুন করে আনন্দ পাই এবং আশাবাদ ও উদ্বেলতাকে আবিষ্কার করি। আমার মনে হয়, প্রতি মানুষ জীবনে যা চায় অর্থাৎ স্বস্তি, স্বাচ্ছন্দ্য এবং সৌজন্যতার একটি অন্তঃসার – এই সূরাটির প্রতিটি শব্দ এবং পংক্তিতে তা আছে। আমাদের জীবন প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমাদের দিবস এবং রাত্রি, আমাদের মৃত্তিকা, বৃক্ষলতা, ফল-ফুল এবং নির্ঝরণীর পরিচ্ছন্ন পানি সব কিছুই আমাদের জীবনের জন্য সম্পদ। আমরা সব সময় আশা করি আমরা যেন চিরকাল এসব সম্পদের মধ্যে বাস করতে পারি। পৃথিবীতে সবকিছুই হারিয়ে যায়। কিন্তু মানুষের চিরকালিনতা পাবার ইচ্ছা কখনও হারিয়ে যায় না। এই চিরকালিনতার একটি বর্ণালি বিবরণ আমরা সূরা 'আর রাহমান'-এ পাই। যখন দুঃখ জাগে তখন এই সূরা পাঠে দুঃখকে ভুলে যাই। পার্থিব কর্মে যখন হতাশা জাগে, তখন এই সূরা পাঠে আমরা আশ্বস্ত হই। যে ব্যক্তি মৃত্যুর ভয়ে আতঙ্কিত, এই সূরা শ্রবণ করে সে শান্তি পায়। পৃথিবীর কোন ভাষায় এর মত মাধুর্যমণ্ডিত এবং লাবণ্যময় শব্দঝংকার আর নেই। আমি 'তালমুদ' পড়েছি, 'বাইবেল' পড়েছি, 'বেদ' পড়েছি কিন্তু এ সমস্ত ধর্মগ্রন্থে 'আর রাহমান'-এর মত

www.pathagar.com

অসাধারণ আশ্বাসের বাণী আমি পাইনি। অত্যন্ত সুন্দর কবিত্বময় কথা সব ধর্মগ্রন্থেই আছে। 'বাইবেল'-এর সুলায়মানের সঙ্গীত, 'বেদ'-এর মধুর স্তোত্র অসাধারণ মনোমুগ্ধকর। কিন্তু আমি 'আর রাহ্মান'-এর কাছে যা পেয়েছি এগুলোর কাছে তা পাইনি। পুরো কোরআন শরীফ ধারাবাহিকভাবে পর্যায়ক্রমে আমি পাঠ করি না। বেছে বেছে আমার প্রিয় কিছু সূরা আমি পাঠ করি। এর মধ্যে 'আর রাহ্মান'টাই আমি বেশি পড়ি। চিত্ত যদি কখনও খুব বিক্ষুব্ধ হয় তখন 'সূরা মোজ্জাম্মেল' পড়ি।

বহু আগে দেশ বিভাগের পূর্বে আবদুর রহমান সিদ্দিকীর সঙ্গে কোরআন শরীফের ধ্বনি প্রকরণ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি 'আর রাহ্মানকে' একটি সুন্দর কবিতা বলেছিলেন, যে কবিতা শব্দের পুনরাবৃত্তির কারণে একটি সুর ঝংকার নির্মাণ করে। আমি এর প্রতিবাদে বলেছিলাম কবিতা তো পার্থিব মানুষের ইচ্ছার উচ্চারণ, কিন্তু 'আর রাহ্মান' তো বিধাতা কর্তৃক উচ্চারিত আশ্বাস বাণী। আমরা বিধাতার বাণীকে মানুষের কবিতার সঙ্গে তুলনা করে তাকে ছোট করতে চাই না।

অনেক মানুষ আছে যারা সারাক্ষণ নানা রকম দোয়া-দরুদ পড়ে থাকেন, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু কোরআন শরীফ যেখানে আমাদের কাছে বিদ্যমান, সেখানে অন্য কোন দোয়া দরূদের প্রয়োজন আছে কি? সব কিছুর উৎসই তো কোরআন শরীফ। সুতরাং আনন্দে এবং শংকায় উভয় ক্ষেত্রেই আমরা কোরআন শরীফের কাছেই যাব এটাই বাঞ্ছনীয়। মিসরে দেখেছি তারা সকল প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কোরআন শরীফ পাঠ করে থাকেন। আমি কায়রো শহরে ১২ রবিউল আউয়ালের একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। আমি দেখেছিলাম সেখানে কোরআন শরীফ ছাড়া আর কিছু পাঠ হয়নি। এশার নামাজের পর থেকে সকাল পর্যন্ত বিভিন্ন ক্বারী বিভিন্ন ভঙ্গিতে কোরআন শরীফ পাঠ করলেন। সমস্ত লোক সময়ের কথা ভুলে গিয়ে তন্ময় হয়ে কোরআন শরীফের ক্বেরাত শুনল। সেদিনকার আনন্দের উপলব্ধি আজো আমি ভুলতে পারিনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যদি কোরআন শরীফকে যথার্থ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পাঠ করি তাহলে আমরা শান্তি এবং মাধুর্য লাভ করব।

আমার মনে হয়, ধর্মের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে মানুষের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে। মানুষে মানুষে ব্যবধান সৃষ্টি করে ধর্মগত আচার এবং প্রথা। ধর্মে মূলতত্ত্বটি সব সময়ই আচার এবং প্রথার অনেক ঊর্ধ্বে। হিন্দুদের বেদ পাঠ করতে আমার অসুবিধা হয় না। সেখানে যথার্থই মানুষের জন্য কল্যাণের বাণী আছে। কিন্তু যখনই আমি হিন্দু 'পুরাণ'-এর কাছে যাই তখনই অসুবিধা বোধ করি। তখন আমার একেশ্বরবাদে আঘাত লাগে। পুরাণটি হচ্ছে মূলত ভারত ভূখণ্ডের প্রাক্ আর্য মানব সম্প্রদায়ের আচারবিধি এবং মূর্তিপূজা। 'পুরাণ'-এর মধ্যে নানাবিধ গ্লানিকর আচার-আচরণের প্রশ্রয় আছে। আর্যরা এখানে এসে স্থানীয় অধিবাসীদের সন্তুষ্ট রাখবার জন্য তাদের 'পুরাণ' প্রকরণকে অংশত মেনে নিয়েছিল। ঠিক এ রকমই করেছিল খ্রিস্টানরা। রোমকরা যখন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করল তখন তারা রোমকদের অসংস্কৃত আদিম কিছু বিশ্বাসকে খ্রিস্টধর্মের অন্তর্গত করে নিল, যেমন ত্রিত্ববাদ এবং 'যিশুর আল্লাহ্‌র পুত্র' হওয়া। মুসলমানদের মধ্যে আচার-অনুষ্ঠানের প্রশ্রয় ঘটেছে অনেকক্ষেত্রে। বিশেষ করে শিয়া মতাবলম্বীদের মধ্যে আচারের অংশটি

www.pathagar.com

অনেক প্রবল। পয়গম্বরদের কাল্পনিক ছবি বানান, মহাপুরুষদের কবর স্পর্শ করে তার ধুলা গায়ে মাখা, বিভিন্ন উপলক্ষে বিশষ বিশেষ আচার অনুষ্ঠান করা এগুলো শিয়া মতাবলম্বীদের মধ্যে খুবই প্রবল। মহররম উপলক্ষে দেখা যায় তারা ইমাম হাসানের একটি প্রতীকী কবর তৈরি করে মাতম করতে করতে তা পানিতে বিসর্জন দিয়ে আসে। এ আচরণের মধ্যে একটি বিরাট দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তির একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখা যায় সত্য কিন্তু এতে পৌত্তলিকতার যে সমর্থন আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

এসব কারণেই আমি মনে করি যে, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে কোরআন শরীফকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা এবং কোরআনের নির্দেশ অনুসারে জীবনকে সুস্থ এবং সম্মানিত করবার চেষ্টা করা। কোরআন শরীফকে গ্রহণ করবার অর্থ হচ্ছে কোরআন শরীফের সঙ্গে যার নিকট কোরআন শরীফ নাজেল হয়েছিল তার আদেশ এবং আচরণকে গ্রাহ্য করা।

আমার স্ত্রী দোয়া দরুদ খুব পড়েন। প্রতিদিন সূর্য ডোবার কিছু আগে থেকে নিয়মিত প্রথা হিসেবে 'দালাল খায়রাত' পড়তে বসেন এবং সূর্যাস্তের সময় তা শেষ করেন। তিনি যার কাছে মুরিদ হয়েছেন তার নির্দেশেই এটা করেন। তিনি এটা পড়ে আনন্দ পেয়ে থাকেন। আমি তার আনন্দে বাধা দেই না। কিন্তু 'দালাল খায়রাত' পাঠটাকে নামাজের মত অবশ্য করণীয় বলে মনে করাটা আমার কাছে কেন যেন ঠিক মনে হয় না।

৯-২-৭৫

ঢাকায় বাংলা একাডেমীতে একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে নানান রকমের অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে বাংলা সাহিত্য বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন। আন্তর্জাতিক এই অর্থে যে বেশ কিছু সংখ্যক সাহিত্যিক এতে অংশগ্রহণ করছেন এদের মধ্যে অন্নদাশংকর রায় আছেন, শিবনারায়ণ রায় আছেন এবং উল্লেখযোগ্য-অনুল্লেখযোগ্য আরও অনেকে আছেন। অন্নদাশংকর রায় যে আসবেন, সে খবর তার কাছ থেকে আমি আগেই পেয়েছি। কয়েক দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠান চলবে। বাংলাদেশ হওয়ার পর অন্নদাশংকর রায় এ নিয়ে দু'বার ঢাকায় এলেন। চাকরি জীবনে এক সময় ঢাকায় ছিলেন। পরে কুষ্টিয়ায় চাকরি করেছেন। চাকরি করতে গিয়ে নিম্নবিত্ত দরিদ্র মুসলমানদের সাথে পরিচয় ঘটেছিল। এসব নিরীহ নির্বিরোধী মানুষগুলোকে তিনি আন্তরিকভাবে ভালবেসেছিলেন। মূলত এসব সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে তার জানবার আগ্রহ ঘটে এবং বেশ কিছু মুসলমানকে তিনি তার পরিচয়ের বৃত্তে নিয়ে আসেন। এরা হচ্ছেন মাহবুব উল আলম, মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন এবং জসীমউদ্দীন। তবে জসীমউদ্দীনের চাইতে অন্য দুজনের সাথে হৃদ্যতা বেশি ছিল এবং এখনও আছে। আমি অন্নদাশংকর রায়ের সঙ্গে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে বুঝেছি যে, তিনি যথার্থই মুসলমান সমাজের মানুষকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে চান। তিনি ইসলাম সম্পর্কে খুব যে বেশি পড়েছেন তা নয়, কিন্তু একটি কথা বিশ্বাস করেন যে, ইসলামের মূলতত্ত্বে মানুষকে স্বাবলম্বী হবার নির্দেশ আছে, মানুষকে ভালবাসার নির্দেশ আছে

www.pathagar.com

এবং সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতার নির্দেশ আছে। অন্নদাশংকর রায়ের সান্নিধ্যে থাকলে বুঝা যায় যে, তিনি যে কোন ধর্মাবলম্বীর কাছে মানুষ হিসেবে পরিচিত হতে চান, হিন্দু হিসেবে নয়। পাকিস্তান আমলে তার সাথে আমি পরিচিত হই প্রথম। পরে ১৯৫৭ সালে টোকিওতে তার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। জাপানের 'নারা' শহরে অথবা টোকিও হতে পারে মনে নেই। একটি বৌদ্ধ মন্দিরের সামনে একটি গাছের ডালে লোকেরা কাগজ বেঁধে ঝুলিয়ে দিচ্ছিল। এর কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, এভাবে কাগজে নিজের নাম লিখে ঝুলিয়ে দিলে আবার এই মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করবার সুযোগ ঘটবে। অন্নদাশংকরও কাগজে নাম লিখে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। এটা কেন করলেন। এ কথা জিজ্ঞেস করতে তিনি উত্তর দিলেন, "এটা তো খুব সুন্দর প্রথা। পুনরায় একই জায়গায় ফিরে আসা। আমি হিন্দু না বৌদ্ধ তাতে কিছু আসে যায় না, আমি মানুষ হিসেবেই এই বৃক্ষের কাছে আবার ফিরে আসতে চাই।" তার এই আচরণটুকু আমার খুব ভাল লেগেছিল। সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থেকে তিনি মানুষ হিসেবে নিজেকে পরিচিত রাখতে চান। এর চেয়ে আনন্দ ও কল্যাণের কথা আর কি হতে পারে?

১০-২-৭৫

আমার প্রজন্মের আগের প্রজন্মের লোকেরা মৃত্যুকে নতুন জীবনে প্রবেশের অনুমতি বলে মনে করতেন। আমি অবশ্য এখানে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কথা বলছি। সারা জীবন ন্যায়নিষ্ঠ থেকে ধর্মের প্রতিটি নির্দেশ আক্ষরিকভাবে পালন করে তাঁরা একটি বিস্ময়কর স্বস্তিতে অবস্থান করতেন। তারা একটি নিশ্চিন্ততায় ছিলেন যে পৃথিবীর জীবনটা হচ্ছে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতির কাল। পৃথিবীতে মানুষ আসে, পৃথিবী ছেড়ে যাবার জন্য। একজন মানুষ যেদিন জন্মগ্রহণ করে সেদিন তার মৃত্যুও জন্মলাভ করে। মৃত্যু মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। অবশেষে মৃত্যুই জয়ী হয়। এ পৃথিবীতে দেহধারী মানুষের বিজয় নেই। আমার পিতা-মাতার মধ্যে আমি কখনও সংশয় দেখিনি। তারা একটি বিশ্বাসকে বক্ষে ধারণ করে নিজেদেরকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করেছেন দেখেছি। অবশেষে মৃত্যু যখন এসেছে তখন হাসিমুখে পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। নিঃসঙ্গ তারা অনির্বাণ মৃত্যুকে বরণ করেছেন। দীর্ঘদিন আমার পিতা রোগশয্যায় ছিলেন, রোগের যন্ত্রণা তাঁকে এক মুহূর্তেও অসহিষ্ণু করেনি। মুখ দিয়ে একবারও ক্লেশের শব্দ উচ্চারণ করেননি। যন্ত্রণাকে সহ্য করেছেন এবং যখন একেবারেই অসহ্য হত তখন তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে উঠত এবং কপালে ঘাম দেখা দিত। তাঁর মৃত্যুর মুহূর্তে আমরা তাঁর সন্তানরা সকলেই উপস্থিত ছিলাম। আমরা প্রত্যেকেই তাঁর মুখে এক চামচ করে পানি দিয়েছি। তিনি শেষবারের মত চোখ মেলে তাকিয়ে আমাদের দেখেছেন। সে চোখে দুঃখের ভাব ছিল না। অবশেষে আস্তে আস্তে পরম শান্তিতে শেষবারের মত চোখ বুঝলেন। জীবিতকালে প্রায়ই তিনি বলতেন, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময় হচ্ছে মৃত্যুর পরে। এই সাক্ষাতটার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে এবং নিজেকে পরিচ্ছন্ন এবং উপযুক্ত রাখতে হবে।

আমাদের সময়ে আমরা পৃথিবীর জন্য বড়বেশি কাতর। এ পৃথিবীতে প্রচুর সমৃদ্ধি ঘটেছে, বৈজ্ঞানিক সুযোগ-সুবিধা এসেছে অনেক। আনন্দের অফুরন্ত সম্ভার এখন সর্বত্রই

www.pathagar.com

পাওয়া যায়। পৃথিবীর এই সমৃদ্ধি মানুষকে ধর্মের প্রবণতা থেকে দূরে সরিয়ে ফেলছে বলে মনে হয়। সমৃদ্ধির জগত এত প্রতাপী যে আমরা সে জগতে বিশ্রাম পাই না, অবকাশ পাই না। ধর্মের আচরণের জন্য কোন সময় আমরা বিশিষ্ট বলে নির্দিষ্ট করতে পারি না। কর্মব্যস্ততার দুর্ভাগ্য আমাদের নিপীড়িত রাখছে প্রতি মুহূর্তে। আজকের পৃথিবীতে আমরা অনুকরণ করার জন্য বড় বেশি ব্যাকুল। পাশ্চাত্যের শিক্ষা, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান, পাশ্চাত্যের বিবেচনা সব কিছুকে আমরা অনুকরণ করে চলেছি। অনুকরণ ছাড়াই যে একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র উপলব্ধি গড়ে উঠতে পারে তা আমরা ভুলে গিয়েছি। ইসলাম কখনও এই অর্থে পাশ্চাত্যের অনুকরণের কথা বলে না, বলে বিশ্বাসের কথা, বলে উপলব্ধির কথা। বহুযুগ আগে অ্যারিস্টোটল পাশ্চাত্য চিন্তার অনুকরণের যে বীজ বপন করে গিয়েছিলেন পাশ্চাত্য জগত সে অনুকরণকে এড়িয়ে যেতে পারছে না। এই অনুকরণের ফলে সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসহীনতা এসেছে। ইউরোপীয় জ্ঞানের অধিকারকে অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা বিশ্বাসের মধ্যে শিথিলতা এনেছি। প্লেটোকে গ্রহণ করলে অনুকরণবাদটি গুরুত্ব পেত না। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে খুবই বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে বলেছেন যে, সকল সত্যের মূলীভূত সত্য বিধাতার কাছে রয়েছে, সমস্ত আকৃতির অধিকার আর সমস্ত উপলব্ধির অধিকার তাঁর এবং সমস্ত বিস্ময়ের অধিকার তাঁর। মানুষ যখন বিধাতার সঙ্গে তার একাত্মতা নির্মাণের জন্য সচেষ্ট হবে তখন মানুষের কাছে অলৌকিক দরজাটা খুলে যাবে। মানুষ যা করে তা সে করে সত্য থেকে অনেক দূরে অবস্থান নিয়ে। প্লেটোর বিশ্বাসের সঙ্গে ইসলামের বিশ্বাসের একটি মিল আছে। ইসলামও বলছে, সকল বিশ্বাসের উৎস যিনি তাঁর কাছ থেকেই আমরা বিশ্বাসকে গ্রহণ করব এবং তাঁর কাছেই আমরা বিশ্বাসকে নিবেদন করব।

আমাদের মধ্যে বর্তমানে সংশয় প্রবেশ করেছে। সংশয়াতীত উপলব্ধি আমাদের নেই। যারা বিশ্বাসহীন নাস্তিক, তারা তাদের বিচার বিবেচনায় কি যে পান তা আমি জানি না। তাঁরা বলেন যে, সবই হারিয়ে যাবে সবই নিঃশেষ হবে। তারা আরও বলেন যে, মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা, চিন্তা এবং বিবেক সবকিছুই তার শরীরী অস্তিত্বের ফল। শরীর যখন থাকবে না, তখন এগুলোও থাকবে না এবং মানুষের শরীর প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে একাকার হয়ে যাবে। কবি কীটস তাঁর একটি কবিতায় এ ধারণার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মৃত্যুতে শরীর শেষ হবে কিন্তু উপলব্ধি শেষ হবে না। উপলব্ধি ছড়িয়ে যাবে। এ উপলব্ধি অন্য মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হবে এবং একজন মানুষ তার উপলব্ধি এবং বিশ্বাসের যে উপঢৌকন রেখে গেল তা তার পরবর্তী মানুষের মধ্যে নতুন স্পৃহা, নতুন বিবেচনা এবং নতুন বিশ্বাসের স্থিতি ঘটবে। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে পার্থিব শরীর বিনষ্ট হলেও উপলব্ধির একটি অবিনশ্বরতা আছে ইসলামে। একেই আত্মা বা রূহ বলা হয়।

আমার নানী অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ রমণী ছিলেন, আবার সংসারের প্রতি তার একটি অধিকারবোধ ছিল। তিনি ছিলেন জমিদারকন্যা এবং পিতার মৃত্যুর পর তাঁর কোন ভাই না থাকায় তিনি জমিদারির অধিকার পেয়েছিলেন। অধিকার সমস্যার সৃষ্টি করে এবং সমাধানের দাবি করে। সে কারণে আমার নানী পৃথিবীতে তাঁর থাকাটা খুব অনুভব করতেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি খুব অসুস্থ হয় পড়েন, পরে ভাল হয়ে জমিদারির

www.pathagar.com

কাজ-কর্মে আবার নিজেকে নিযুক্ত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল। তিনি বেঁচে উঠতে চাচ্ছিলেন। আমার নানার খলিফা যিনি ছিলেন তিনি ছিলেন আমাদের পরিবারের খুবই অন্তরঙ্গ। আমার নানীকে তিনি আম্মা বলতেন। নানীর অসুস্থতার সময় তিনি তাঁর পাশে ছিলেন। একদিন নানী তাঁকে বললেন, "আপনি আল্লাহর কাছে আমার জন্য দোয়া করুন যেন আমি সুস্থ হয়ে উঠি।" আমার নানাজান পীর ছিলেন। তাঁর এই সুযোগ্য খলিফার নাম ছিল গোলাম মুক্তাদীর। আমার নানীর অনুরোধ শুনে তিনি তাঁর শিয়রের কাছে ধ্যানস্থ হয়েছিলেন। ধ্যান ভাঙ্গার পর তিনি আমার নানীকে হাসিমুখে বলেছিলেন, "আম্মা, আপনার আপনজনদের সবাইতো আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। আপনার বাবা-মা, আপনার ছেলে তারা সবাই সেখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাদের ফেলে আপনি কতদিন এখানে থাকবেন?" আমার নানী এ কথায় স্থির হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন, "তবে তাই হোক। আপনি আমার জন্য দোয়া করুন – আমি যেন শান্তিতে চলে যেতে পারি।" চিরকালের জন্য চলে যাওয়াটাই তখন তাঁর জন্য শান্তির ছিল। মৃত্যুতে অধীর না হয়ে, মৃত্যুর জন্য ভীত না হয়ে শান্তিতে অন্তর্ধান – সেটাইতো সকলের কাম্য হওয়া উচিৎ। যারা যথার্থ বিশ্বাসী তারাই শান্তিকে কামনা করে এবং তারা এক প্রকার নিশ্চিন্ততায় সংসারকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে। যে অবস্থার পরিবর্তন কখনও হবে না, সে অবস্থার জন্য দুঃখ করে লাভ কি? জন্মের পর থেকে আমরা অবধারিত একটি সত্যের দিকে এগিয়ে চলছি– সেটি হল মৃত্যু। তারাশংকর তাঁর একটি উপন্যাসে লিখেছেন যে, একটি শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যুরও জন্ম হয়। শিশু বড় হতে থাকে, মৃত্যুও তার পাশাপাশি বড় হতে থাকে। অবশেষে একদিন মৃত্যু তাকে অধিকার করে নেয়। এটাই হচ্ছে মানুষের বিধিলিপি। সুতরাং যে সময়টুকু আমরা পৃথিবীতে থাকব সে সময়টুকু শোভায় মাধুর্যে এবং পবিত্রতায় পরিপূর্ণ করে রাখব, এটাই তো আমাদের প্রত্যাশা হওয়া উচিৎ।

১১-২-৭৫

কয়েক দিন হল ফরাসি ঔপন্যাসিক আলেকজান্ডার দুমার 'থ্রি মাসকেটিয়ার্স' বইটি আবার পড়ছি। স্কুলে থাকতে একবার বইটির সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ পড়েছিলাম। বইটি তখনই আমাকে খুব আকর্ষণ করেছিল। দ্বন্দ্ব-সংঘাত, গোপন অঙ্গীকার, অভিসার, চক্রান্ত, প্রেম ও ভালবাসা সব কিছু নিয়ে এ বইটি একটি অসাধারণ আকর্ষণীয় গ্রন্থ। নতুন করে বইটি পড়তে গিয়ে আমার ভাল লাগছে। ফরাসি রাজসভার নানাবিধ কূটনৈতিক তৎপরতা, রাজনৈতিক বিদ্বেষ এবং বিদ্বেষ প্রসূত কার্যাবলী একটি সময়ের সামাজিক উচ্ছৃংখলতার পটভূমিতে নরনারীর বিচরণ এবং সকল কর্মে অহমিকাকে প্রাধান্য দান এ সমস্ত বিপুল আবর্তের মধ্যে মানুষের জীবন যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তার একটি অসাধারণ চিত্র এ বইটিতে পাওয়া যায়। তিনজন মাসকেটিয়ার এই বিপুল ঘটনাবর্তের সাক্ষী হয়েছে। তারা দেখছে, বিভিন্ন ঘটনার অংশভাগী হচ্ছে এবং তাদের মধ্য দিয়ে একটি সময়ের সামগ্রিক চৈতন্য আমরা এই গ্রন্থে প্রত্যক্ষ করি।

আমি সাধারণত খুব সময় নিয়ে এই বই পড়ি না। অপ্রয়োজনীয় বিবরণ বাদ দিয়ে খুব দ্রুত পড়ে যেতে পারি। এভাবে পড়তে গিয়ে যদি কোন বই ভাল লাগে তাহলে

www.pathagar.com

দ্বিতীয়বার তার কাছে প্রত্যাবর্তন করি। তখন ধীরে ধীরে পড়ি এবং কোন একটি বাক্যই যেন বোধের আড়ালে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখি। এবার 'থ্রি মাসকেটিয়ার্স' যখন পড়লাম, তখন ধীরে ধীরে পড়লাম এবং ফরাসি দেশের একটি সময়ের পরিপ্রেক্ষিতকে ভালভাবে বুঝতে পারলাম। একটি উপন্যাস তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন কাহিনী, চরিত্র এবং জীবন দর্শন একত্রে উদ্ভাসিত হয়। 'থ্রি মাসকেটিয়ার্স' উপন্যাসের মধ্যে এই গুণটি আশ্চর্য রকমের বিদ্যমান। এই গ্রন্থপাঠে কোন মুহূর্তে কৌতূহল স্তিমিত হয় না। একটি ঘটনা পরবর্তী ঘটনার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করে। একটি চরিত্রের আবরণ ক্রমশ প্রকাশ পেতে থাকে এবং পাঠক হিসেবে আমার চৈতন্য ক্রমশ নতুন তথ্য এবং বিশ্বাসকে পাবার জন্য উদগ্রীব হয়। আমি এ বইটিকে বিশ্বসাহিত্যের একটি মহৎ সৃষ্টি বলে মনে করি।

রবীন্দ্রনাথের ওপর বইটি শেষ করার পর নতুন কোন বই লেখাতে এখন আর হাত দেইনি। আমার ইচ্ছা আছে রবীন্দ্রনাথের ওপর আরও ব্যাপকভাবে কাজ করা এবং রবীন্দ্রনাথের সবকটি কাব্যগ্রন্থ ধরে একটি ধারাবাহিক পর্যালোচনা করা। কতটা সফল হব জানি না। 'রবীন্দ্রনাথ কাব্য বিচারের ভূমিকা' বইটির মুখবন্ধে এ কথা আমি লিখেছি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার নিজস্ব কিছু চিন্তা-ভাবনা আছে। এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ওপর যতগুলো বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর কোনটাই আমাকে পুরোপুরি আনন্দ দিতে পারেনি। এ যাবত কেউ রবীন্দ্রকাব্যে শব্দ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেননি। এ আলোচনাটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কবিতার উপকরণের মধ্যে শব্দই তো মুখ্য। জীবনের বিশ্বাস বলি, দাহন বলি, অঙ্গীকার বলি, সবকিছুই তো শব্দের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়। সে কারণে একজন কবির শব্দ ব্যবহারকে নিরীক্ষণ করে সে কবির কাব্য প্রক্রিয়ার বিশিষ্টতা নিরূপণ করা যায়। একজন কবি তার শব্দাবলী যেখান থেকে গ্রহণ করুন না কেন, বিশেষ বিন্যাসে এবং ধ্বনি প্রকরণের সাহায্যে তা নতুন রূপ লাভ করে। কবিকে পেতে হলে কবিতায় তার শব্দ ব্যবহারের বিশিষ্টতার মধ্যে পাওয়া যাবে।

১২-২-৭৫

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অব্যাহতি নেবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন বিভাগে একজনমাত্র লোক আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযাগ রক্ষা করে চলেছেন-তিনি আরজ আলী। এভাবে যোগাযোগ রক্ষাটি তাঁর কর্মের দায়ভাগে পড়ে না, কিন্তু আমার প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার কারণে তিনি আমার কাছে বারবার আসেন। তাঁকে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে যিনি চাকরি দিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ডঃ সুরত আলী। আমার কর্মকালে সুরত আলীর সঙ্গে আরজ আলী যোগাযোগ রক্ষা করতেন। অতীতে যার যার অধীনে আরজ কাজ করেছেন তাঁদের সকলের সঙ্গে তিনি সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন– এই গুণটি সকলের থাকে না। আরজ আলী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানায় যেসব চিঠিপত্র এসেছে সেগুলো আমাকে দিলেন, কিন্তু বললেন যে, একটি বিদেশী দূতাবাসের ডিনারের নিমন্ত্রণ কার্ডটি তিনি আনতে পারেননি। এনামুল হক সাহেব নাকি বলছেন সে নিমন্ত্রণটি উপাচার্যের,

www.pathagar.com

ব্যক্তিগতভাবে কারও নয়। আমি আরজ আলীকে বললাম, "বিদেশী দূতাবাসের রিসেপশনের নিমন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের প্রধানরাই পেয়ে থাকেন, কিন্তু ডিনার অথবা লাঞ্চে নিমন্ত্রণ ব্যক্তিগতই হয়ে থাকে। খুব ঘনিষ্ঠ না হলে তারা ডিনার অথবা লাঞ্চে কাউকে দাওয়াত করেন না।" আমি আরজ আলীকে কার্ডটি নিয়ে আসতে বললাম।

১৩-২-৭৫

একুশ উপলক্ষে বাংলা একাডেমী আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের অতিথিরা একে একে আসতে শুরু করেছেন। শিবনারায়ণ রায় ইতিমধ্যেই এসেছেন। তিনি অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি হিসেবে এসেছেন এবং আমারই নিমন্ত্রণে। একুশের অনুষ্ঠানেও তিনি যোগ দেবেন। তিনি ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়েছেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'মেরুদণ্ডী মানুষ'। অর্থাৎ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। শিবনারায়ণ এরকম চমক লাগান নাম ব্যবহার করে থাকেন। আমি অবশ্য অনুষ্ঠানে যাইনি। কিন্তু অনুষ্ঠানের বিবরণ পাঠ করেছি। শিবনারায়ণ যুক্তিবাদী মানুষ, বিশ্বাসী মানুষ নন। কোন প্রকার ধর্মীয় বিশ্বাস তাঁর নেই। তিনি হিন্দু সমাজের রীতিনীতিও মেনে চলেন না। তিনি মার্কসীয় নাস্তিক নন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন তিনি স্বীকার করেন না। তিনি আমার সঙ্গে চট্টগ্রামের প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করলেন। বললেন, "যেহেতু আপনার আমন্ত্রণে আমি ঢাকায় এসেছি, আর এদিকে আপনি চট্টগ্রামে চলে যাচ্ছেন, সুতরাং আমি চট্টগ্রামে যাব এবং সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু বক্তৃতা করব। আপনি চট্টগ্রামে আমাদের প্রোগ্রামের একটি ব্যবস্থা করবেন।" ঢাকায় শিবনারায়ণ বাংলা একাডেমীতেও বক্তৃতার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। আমি জানতে চাইলাম যে তাঁর সঙ্গে ঢাকায় কবে কার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি বললেন যে, আবু রুশ্‌দের বাসায় তিনি গিয়েছেন। আরও জানালেন যে আবু রুশ্‌দ্ তাঁর কলেজ-জীবনের সহপাঠী। বিশ্ববিদ্যালয় গেস্ট হাউজে যেখানে তিনি অবস্থান করছেন, সেখানে শামসুর রাহমান তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। শিবনারায়ণ রায় কবিতাও লিখে থাকেন এবং বাংলাদেশের কবিদের প্রতি তাঁর আগ্রহ আছে। তিনি যখনই ঢাকায় আসেন বাংলাদেশের অনেক কবি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমি শিবনারায়ণকে জানালাম যে আমি সিণ্ডিকেটের মিটিং-এ যোগ দিতে ২৩ ফেব্রুয়ারি রোববার চট্টগ্রাম যাব, তিনি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যেতে পারেন। শিবনারায়ণ জানালেন যে তিনি ২৪ তারিখে যাবেন। ২৩ তারিখে ঢাকায় তাঁর একটি অনুষ্ঠান আছে।

১৪-২-৭৫

আজকের জুম্মার নামাজ আদায় করলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে। এ মসজিদটি বেশ খোলামেলা। আবরিত স্থানের বাইরে অনেক জায়গায় ছাদ দেয়া হয়নি। সেখানে দাঁড়ালে উপরের আকাশকে দেখা যায়। মসজিদটির গঠন রীতি অত্যন্ত সরল, একেবারেই কোন অলঙ্করণ নেই। এখানে এলে অনেকের সঙ্গে দেখা হয় এবং নামাজের শেষে কুশল বিনিময় হয়।

www.pathagar.com

বিকেলে সিকান্দার এল। তার সঙ্গে কিছুটা সময় কাটালাম। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বোর্ডের একজন সদস্য সরকারী কাজে ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ভারতীয় দূতাবাসের ডঃ জালাল আহ্‌মেদ এলেন। ভদ্রলোক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের শিক্ষক ছিলেন। ভূগোল ছাড়াও অর্থনীতি বিষয়ে তার পাণ্ডিত্য আছে। কথাবার্তায় তা বুঝলাম।

বোম্বে থেকে এ.বি. শাহ্-র একটি চিঠি পেলাম। সে আর একবার ঢাকায় আসতে চায়। লিখেছে যে আমি যদি এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেই তাহলে সে খুশি হবে। বাংলাদেশ হওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই এ.বি. শাহ ঢাকায় এসেছিল এবং অতিথি হিসেবে আমার বাসগৃহেই ছিল। তার সঙ্গে বোম্বের সাংবাদিক দিনকর সাক্রিকরও ছিল। এদের উভয়ের কথা আগেই আমি বলেছি। এরা উভয়েই আমার বন্ধু এবং স্বজন। এ. বি. শাহ বাংলাদেশের পুনর্গঠনের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে কিছু করে আমি জানি, তবে একজন ভারতীয় হিসেবে নয়, একজন মানুষ হিসেবে আমার কাছে যখনই সে চিঠিপত্র লেখে তখনই সে বাংলাদেশের পুনর্গঠনের ব্যাপার বিষয়ে কিছু দিক নির্দেশনা দেবার চেষ্টা করে। এটা তার একটি অভ্যেস। তার উপদেশ কেউ গ্রহণ করল বা না করল তাতে তার কোন আসে যায় না। সব সময়ই সে কিছু না কিছু পরিকল্পনা করতে চায়।

১৫-২-৭৫

অনেক দিন পর আজ আবু রুশ্‌দ্ মতিনউদ্দিনের বাসায় গেলাম। সে একা বসে কাজ করছিল। আমাকে দেখে খুশি হল। অনেকক্ষণ বসে তার সঙ্গে কথা বললাম। আবু রুশ্‌দ্ সকল ব্যাপারে তার নিজস্ব নীতি এবং আদর্শ মেনে চলে এবং সেটা মেনে চলার ব্যাপারে সে অটল। তার নীতির সঙ্গে সব সময় আমি খাপ খাওয়াতে পারি না। কিন্তু তার দৃঢ়তাকে আমি প্রশংসা করি। তার নিজের লেখা সম্পর্কে তার নিজস্ব কিছু বিবেচনা এবং বিশ্লেষণ আছে যার সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না। একমত না হলেও আমি প্রতিবাদ করি না। প্রত্যেক লেখকের নিজের লেখা সম্পর্কে একটি অভিমান থাকে। এই অভিমান থাকাটি গর্হিত নয়, বরঞ্চ প্রয়োজন। আমার নিজের কবিতা এবং গদ্য লেখা বিষয়ে নিজস্ব কিছু বক্তব্য আছে, তবে আমি অন্যের বক্তব্যকেও মূল্য দেই এবং বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করি সেই বক্তব্য কতটা সমীচীন।

১৬-২-৭৫

মাঝে মাঝে লোকেরা আমাকে জিজ্ঞেস করে সংস্কৃতি কি। সংস্কৃতির পরিভাষা বিদ্বান লোকেরা বিভিন্ন প্রকারে দিয়েছেন। তবে তাদের সকল বক্তব্যের মূলকথা হচ্ছে যা মানুষকে সুসংস্কৃত করে তাই হচ্ছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতি হচ্ছে সেই জীবন পদ্ধতি, যে জীবন পদ্ধতিতে মানুষ সংস্কৃত হয়। জন্মের পরপরই মানব-শিশু অজ্ঞান থাকে। পশুর চেয়েও নিম্নস্তরে থাকে। বাহ্য ব্যবহার, কর্তব্য এবং অকর্তব্যের ভেদাভেদ তার থাকে না। অগ্নি স্পর্শ করলে শরীর যে জ্বলে যাবে তা সে জানে না। সে জানে না যে পানিতে পড়লে কাপড় ভিজবে, সাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞান থেকে সে অনভিজ্ঞ থাকে। ধীরে ধীরে মানব-শিশু বড় হয়,

www.pathagar.com

সমাজে অবস্থান করে সে অনেক কিছু শেখে, সে আপন-পর সম্পর্ক নির্ণয় করতে শেখে, জীবন পদ্ধতি নির্মাণ করতে শেখে। বিশ্বের গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত হয় এবং আপন কর্তব্য এবং অকর্তব্য সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করে। পৃথিবীকে দেখে পৃথিবীর সংস্কার এবং আচরণ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে এবং এভাবেই মানুষ পশুত্ব থেকে সরে এসে সংস্কৃত হয়ে মানবতাপ্রাপ্ত হয়। এভাবে সংস্কৃতি হচ্ছে জ্ঞানবান মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধ।

মানুষকে অনুকরণ করে শিখতে হয়। শৈশবের অজ্ঞানতা থেকে পূর্ণ মানবরূপে প্রতিপন্ন না হওয়া পর্যন্ত সে অজ্ঞানই থাকে, জীবনের দৃশ্যমানতা তাকে জীবন সম্পর্কে সচেতন করে। বুদ্ধিবৃত্তি যখন জাগে তখন বুদ্ধির সাহায্যে বস্তুর স্বভাব সে নিরূপণ করে এবং একটি বিশ্বাসের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ যখন শুভ-অশুভ নির্ণয় করতে শেখে তখন তার আচরণের মধ্যে সংস্কৃতি চর্চা দেখা দেয়। এ সংস্কৃতি তার জীবনযাপন তার জীবনকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে, পোশাক-পরিচ্ছদের বিশিষ্টতার মধ্যে গড়ে ওঠে এবং ধর্মীয় বিশ্বাস এবং নীতির আশ্রয়ে লালিত হয়। এক কথায়, একজন মানুষের একটি সম্পূর্ণ অস্তিত্বের পরিস্ফুটনের মাধ্যমে তার সংস্কৃতির রূপটি ধরা পড়ে। সংস্কৃতি শুধু মানুষের বর্তমান অবস্থান নিয়ে নয়, সংস্কৃতি নির্ণয়ের জন্য তার অতীতকেও বিচারে আনতে হয় এবং ভবিষ্যতের ইচ্ছাকে মান্য করতে হয়। একজন মানুষের অতীত এবং বর্তমান তার দেশগত সত্তার সঙ্গে জড়িত, তার ধর্মীয় সংস্কারের সঙ্গে জড়িত, নৈতিক বিবেচনার সঙ্গে জড়িত, ভাষার সঙ্গে জড়িত এবং আনন্দ-উল্লাসের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে জড়িত। সাধারণত একজন মানুষ তার প্রকাশ্য কর্মের শৃংখলার মাধ্যমে নিজের অবস্থানকে প্রকাশ করে। এই অবস্থানটি হচ্ছে তার সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি। সংস্কৃতি মানুষকে নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার অধিকার এবং ক্ষমতা প্রদান করে। আমরা যে বিশেষভাবে যুক্তিবাদী মানুষ, মানুষের বিচার-বুদ্ধি আছে এবং ন্যায়ের প্রতি আনুগত্য আছে তা আমরা অনুভব করতে পারি সংস্কৃতির মাধ্যমে। সংস্কৃতির মাধ্যমে আমরা নিজের মূল্য নিরূপণ করি এবং ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্বাচন করতে শিখি। সংস্কৃতির মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে, আত্মসচেতন হয়, নিজের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে বোধ জন্মে, নিজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শেখে, অনবরত নিজের সীমা অতিক্রম করে দক্ষতা অর্জন করে।

অনেকে সংস্কৃতি বিচারে মানুষের অস্তিত্বগত নৃতত্ত্বকেও টেনে আনেন। বর্তমান পৃথিবীতে নৃতত্ত্বগত পরিশুদ্ধ জাতিগত অস্তিত্ব বলতে কিছু নেই। অতীতকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সকল দেশেই মানুষের মধ্যে মিশ্রণ ঘটেছে এবং এই মিশ্রণের ফলে মানুষের পরিশুদ্ধ জাতিগত রূপাভিব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং সংস্কৃতি শুধুমাত্র জাতিগত সত্তায় সীমাবদ্ধ নয়।

১৭-২-৭৫

বেলা ২টায় অন্নদাশংকর রায় দেখা করতে এলেন। আমি খুবই সন্তুষ্ট হলাম এবং অভিভূত হলাম। অন্নদাশংকর রায় অত্যন্ত বিনয়ী। কথায় কথায় বললেন, "ঢাকায় এসেছি, অথচ আপনার সঙ্গে দেখা করে যাব না, এতো হতেই পারে না। খুব কম লোকের সঙ্গে আমার মানসিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে আপনি

www.pathagar.com

একজন। আপনি যখন করাচী ছিলেন তখন থেকেই আপনার সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ প্রথম হয়। তারপর জাপান। জাপানের কথা ভুলিনি। ঢাকায় এসেই শুনলাম যে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। এজন্য আমি খুব খুশি হয়েছি। প্রশাসনিক দায়িত্বটা এমন যে আপনি প্রাণান্ত পরিশ্রম করে যাবেন কিন্তু তার প্রতিদানে কারও কাছ থেকে কণামাত্রও কৃতজ্ঞতা পাবেন না। একজন লেখকের জন্য এটা খুবই বেদনাদায়ক। লেখক সব সময় কৃতজ্ঞতা চায়। তাঁর পাঠক তাঁকে কৃতজ্ঞতা দিয়ে থাকে। উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করতে এসে আপনি আপনার পাঠকদের কয়েক বছর বঞ্চিত করেছেন, এখন আপনি সময় পেলেন। এখন নতুন করে লেখায় হাত দেবেন আশা করি।" আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে তিনি নতুন কিছু লিখছেন কি না। তিনি একটি বড় উপন্যাসে হাত দেবেন বলে ইচ্ছে করেছেন। তিনি বিশেষ করে বললেন যে জীবন ও জগত সম্পর্কে তাঁর যত কিছু চিন্তা সেগুলো তিনি উপন্যাসের মাধ্যমেই প্রকাশ করে থাকেন। এভাবেই তাঁর 'সত্যাসত্য' উপন্যাসটি সৃষ্টি হয়েছিল। 'সত্যাসত্য'-এ তিনি সব কথা বলে উঠতে পারেননি। তাছাড়া তাঁর বয়সও ছিল কম। 'রত্ন ও শ্রীনতি' উপন্যাসে তিনি নতুন একটি অঙ্গনে প্রবেশ করেছিলেন। এবার শেষ পর্যায়ের পালা।

অন্নদাশংকর রায় আমার বাসায় বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত থাকলেন। তাঁর বিদায়ের পর আমি কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলাম যে, অন্নদাশংকরের মত মানুষ পৃথিবীতে ক্রমে ক্রমে কমে আসছে। তাঁর মত উদার, নির্মল, অসাম্প্রদায়িক এবং মুক্ত চেতনার মানুষ এখন আর দেখা যায় না।

১৮-২-৭৫

চর্যাগীতিকার পাণ্ডুলিপি সংশোধন আরম্ভ করেছি। এই বইটি বাংলা একাডেমী ছাপছে। ইউনেস্কোর মিস বালতাদসি-র চিঠির উত্তর দিলাম। তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে আমি বর্তমানে কি করছি এবং নতুন কিছু করার সুযোগ পেলে সে কাজে হাত দেব কি না।

১৯-২-৭৫

শান্তিনিকেতন থেকে ডঃ প্রবোধচন্দ্র সেনের দীর্ঘ একটি পত্র পেলাম। আমার 'রবীন্দ্রনাথ ঃ কাব্য বিচারের ভূমিকা' বইটি পেয়ে তিনি চিঠিটা লিখেছেন। এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং সমর্থন আমি আমার জীবনে কারও কাছ থেকে পাইনি। তাঁর চিঠির তারিখ ১২.২.৭৫। চিঠিতে তিনি আমাকে 'সাহিত্যাচার্য' বলে সমর্থন করেছেন। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "আপনার সব পত্র পেয়েছি। যথাসময়ে উত্তর দেয়া সম্ভব হয়নি। সে জন্য নিজেকেই অপরাধী বোধ করছি। কয়েক মাস পূর্বে 'মধুমালতী' পেয়েছিলাম। তখন অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় পড়বার সময় হয়নি। আমার আত্মীয় ও অতি প্রিয় ছাত্র এবং সহকর্মী শ্রীমান অমিয়কুমার সেন ঢাকায় আপনার সঙ্গে দেখা করেছিল। তাকে বলে দিয়েছিলাম বই-এর প্রাপ্তিসংবাদ ও আমার ব্যস্ততার কথা আপনাকে জানাতে। ফিরে এসে সে আমাকে দেখা হবার কথা বলাতে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। 'মধুমালতী'

www.pathagar.com

পাবার আগেই আমার 'ছন্দ জিজ্ঞাসা' এক কপি পাঠিয়েছিলাম সঙ্গীতাধ্যক্ষ শৈলজানন্দ মজুমদারের সহায়তায়। পরে জানলাম সে-বইটি শ্রীমতি সনজীদাকে দেওয়া হয়েছে আপনাকে দেবার জন্য। শ্রীমতি সনজীদাও এক পত্রে আমাকে জানিয়েছিল বইটি শীঘ্রই আপনাকে দেয়া হবে। কিন্তু ছয় সাত মাসেও জানতে পারলাম না বইটি আপনাকে দেওয়া হয়েছে কি না। আমি সে সংবাদের প্রতীক্ষাতেও ছিলাম দীর্ঘকাল। পরে হতাশ হয়েছি। তারও পূর্বে আমি নিজ ব্যয়ে বিশ্ব-ভারতী প্রকাশিত ও প্রবোধ বাগচী মহাশয়ের সম্পাদিত এক কপি 'চর্যাপদ' বই আপনাকে পাঠিয়েছিলাম রেজিস্ট্রি ডাকযোগে– নতুন কেনা বই। তাই মনে হয়েছে ডাক বিভাগেই কোথাও কোন গোল ঘটেছে। ফলে ডাক বিভাগের উপরেও আস্থা হারিয়েছি।

'রবীন্দ্রনাথ ঃ কাব্য বিচারের ভূমিকা' বইটি সম্বন্ধে হয়েছে আর এক রকম অভিজ্ঞতা। আপনার ২৫.১১.১৯৭৪ তারিখের চিঠিতে আপনার এই বইটির কথা জানলাম। কিন্তু চিঠিখানি আমি পেলাম ৯.১২.১৯৭৪ তারিখে। বইটি পেলাম মাত্র কয়েকদিন আগে গত সপ্তাহে। অর্থাৎ বইটি পেতে সময় লাগল দু'মাসেরও বেশি সময়। .....

আমাদের জাতীয় কর্মতৎপরতার চমৎকার নিদর্শন। বই না পেয়েও আমি আপনার চিঠির জবাব দেবার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু দুই কারণে তাও দেওয়া হয়নি। আমি তো এক চোখেই দেখি না, দুই চোখেই ছানি পড়েছিল। একটারই ছানি কাটা হয়েছে। কিন্তু তাতে ভাল কাজ হয় না। তাছাড়া শীতকালে এক কাটা চোখেও কতকগুলো কষ্টকর উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। তাই চোখের কাজ বেশি করতে পারতাম না। তাছাড়া আমার একটা পুস্তিকা ও একটা অতি ছোট প্রবন্ধের অতি-মুদ্রিত কপি আপনাকে পাঠাব ভেবেছিলাম। কলকাতা থেকে পুস্তিকাটি পেলাম কয়েক দিন আগে আর প্রবন্ধটি পেলাম মাত্র কাল। তাই আজ চিঠি লিখতে বসেছি।

রেডিওতে ও সংবাদপত্রে জেনেছিলাম আপনি হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাছাড়া আমার এক প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ওই সম্মেলনে গিয়েছিল। সে এসে জানাল আপনার ভাষণ অতি চমৎকার হয়েছিল, তাতে সকলেই মুগ্ধ। সে নিজে হিন্দীভাষী, কিন্তু বাংলায় এম.এ., পিএইচডি। তাই আপনার ভাষণ সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধার মূল্য আছে।

এই কয়দিনে আপনার 'রবীন্দ্রনাথ' বইটি অনেকখানি পড়া হয়েছে। পড়ে আমি বিস্মিত, মুগ্ধ, অভিভূত, এটা অত্যুক্তি নয়। রবীন্দ্র সাহিত্যের এমন বিচার এর পূর্বে আমি পড়িনি। সব বিচারই যেন মস্তিষ্কপ্রসূত, সাহিত্যিক ন্যায়সূত্রের ছকে ফেলে পরিমাপ করার প্রকাশ অথবা নিছক উচ্ছ্বাস নয়। আপনার এই বিচার যেন এক কবিসত্তা দিয়ে আর এক কবিসত্তাকে প্রকাশ করা। এ বিচার লজিকের বিচারও নয়, ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস তো নয়ই।

আপনার 'মধুমালতী' বইটি পড়েছি খুব যত্ন করে দাগ দিয়ে। এটি আপনার প্রতিভার আর এক পরিচয় উদঘাটিত করেছে আমার কাছে। অতি শ্রমসাধ্য গবেষণার প্রতিভা। নানা ভাষায় আপনার অধিকার খুঁটিয়ে পাঠ নিরূপণ, ইতিহাসের দৃষ্টি, প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার বিশেষ পদ্ধতি সবই একত্র সমাবিষ্ট হয়েছে এই বইটিতে। এই বইটি সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না। এটা সম্পূর্ণ নতুন আবিষ্কার। বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

নতুন সংযোজন। আর আপনার সম্পাদনাও অনবদ্য। তাছাড়া সত্যি বলতে কি, এই বই সম্পাদনার যোগ্যতা কারও আছে বলে আমার জানা নেই। আমাদের সাধারণ সাহিত্যরসিক ও সাহিত্য সমালোচকের দৃষ্টিতে এ কাজটা অকিঞ্চিৎকর মনে হতে পারে। কিন্তু এ কাজটা যে পর্যায়ে সে পর্যায়ে বেশি লোক বিচরণ করেন না– তাই তাঁদের কাছে এই বইয়ের যথার্থ মূল্যবোধ প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু যাঁরা সে ক্ষেত্রের সঙ্গেও পরিচিত তাঁরা সবাই স্বীকার করেছেন এ কাজটাও এক অসাধারণ দক্ষতার পরিচায়ক এবং আপনার মত গবেষকের উপযুক্ত কাজ। এই বইটি আপনার কোন কোন লেখায় কাজে আসতে পারে। তাই বিশেষভাবে দাগ দিয়ে রেখেছি। এই বই পড়ে আমার অনেক জ্ঞান লাভ হয়েছে। সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আপনার চর্যাপদাবলীর সংস্করণ কি প্রকাশিত হয়েছে? সে বই দেখতেও উৎসুক আছি। এক প্রান্তে চর্যাপদ, অপর প্রান্তে রবীন্দ্রকাব্য।

আশা করি আপনি এখন সম্পূর্ণ নিরাময় হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব বহন আপনার স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। আপনার প্রকৃতিগত প্রবণতার সহায়কও নয়। আপনি চট্টগ্রামে পূর্বতম কর্মে যোগ দেবেন এই সংবাদ আমার কাছে আশ্বাসজনক বলেই মনে হয়েছে। এর চেয়ে বড় কাম্য আর কি হতে পারে? আপনি কবে ঢাকা ত্যাগ করে চট্টগ্রাম যাবেন তা জানতে পারিনি। যদি এই চিঠি পাবার আগেই আপনি চলে যান তাহলে এটি ডি-ইনডাইরেক্ট হয়ে আপনার কাছে যাবে আশা করি।

শ্রীমতি সনজীদা যদি 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' বইটি এখনও না দিয়ে থাকে তবে আপনি যদি ওটি ওর কাছ থেকে আনিয়ে নেন তাহলে ভাল হয়। বইতে আমি আপনার নাম লিখে দিয়েছি আমার স্বাক্ষরসহ কয়েক মাস আগে।

কবির নতুন সৃষ্টি আমাদের নতুন দৃষ্টি দেয়। সে নতুন দৃষ্টিতে একদিকে আমরা নিজেদেরই যেন নতুন করে দেখি। নতুন করে চিনি। কবিদের দেওয়া এই নতুন দৃষ্টিতে আমরা জগৎ জীবন ও সাহিত্যকে নতুন করে পাই। তাতে নতুন তাৎপর্য উপলব্ধি করি। অর্থাৎ কবির সৃষ্টি আমাদেরও নতুন করে সৃষ্টি করে নবনব জন্মদান করে। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে এ কথা সত্য। কিন্তু তবে একটা অন্তরায় আছে। তা আমাদের আলোক-গ্রহণের অক্ষমতা। সূর্যের আলো হীরকখণ্ডের উপরে পড়ে প্রতিচ্ছুরিত হয়। মৃৎখণ্ড সে আলোক প্রতিচ্ছুরিত করতে পারে না। আমাদের অক্ষম হৃদপিণ্ডও তেমনি কাব্যের আলোক প্রতিফলিত করতে পারে না। যার হৃদয় কাব্যের আলোকে হীরকখণ্ডের মত প্রতিচ্ছুরিত করতে পারে তিনিই যথার্থ সমালোচক। শ্রেষ্ঠ কবির ন্যায় শ্রেষ্ঠ সমালোচকও দুর্লভ। কালিদাসকে দেড় হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে গেটে ও রবীন্দ্রনাথের মত সমালোচকের জন্য। এখন আমরা কালিদাসকে যেভাবে বুঝি এই দু'জনের আবির্ভাবের পূর্বে সেভাবে বোঝা সম্ভব ছিল না। আলোক প্রতিচ্ছুরিত করাও এক প্রকার সৃষ্টি। অন্ধকারে প্রদীপশিখা তিমিরাচ্ছন্ন পথকে নতুন করে সৃষ্টি করে। যথার্থ সমালোচকের হাতের দীপশিখাও তেমনি কাব্যের পথকে সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিগোচর করে, তাদের চোখে নতুন দৃষ্টি দিয়ে কাব্যের সৌন্দর্যলোককে অভাবিত আভায় উদ্ভাসিত করে। আপনার এই বইখানিও সঞ্চারিণী দীপশিখার মতই পাঠকচিত্তকে রবীন্দ্রসাহিত্য সরণিতে চালিয়ে নিয়ে চলছে অপূর্ব নন্দনলোকের আশায়, অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে।

www.pathagar.com

পথের এদিকে ওদিকে কত হীরের টুকরো পড়েছিল সাধারণ নুড়ির মত। আপনার হাতের দীপশিখা থেকে আলো পড়তে সেগুলো ঝকঝক করে উঠল; বোঝা গেল সেগুলো সাধারণ নুড়ি নয়, হীরের টুকরো। আর কোন সমালোচনা পড়েই আমার চমক লাগেনি। তখনই বুঝতে পারলাম কবি সত্তাই অন্য কবি সত্তাকে উদঘাটিত করতে পারে। আমার পরম সৌভাগ্য আমি এমন একখানি বই পড়বার সুযোগ পেয়ে গেলাম। দীর্ঘ জীবনলাভের এই সার্থকতায় অন্য সব ব্যর্থতাবোধ তুচ্ছ হয়ে গেল। আর এই অমূল্য বইখানি আমাকেই উৎসর্গ করেছেন আপনার অন্তরের প্রীতিবশে, ভেবে আমি আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়েছি। আপনার এই প্রীতির নিদর্শনকে শিরোধার্য করলাম। আমার রবীন্দ্র-সমালোচনা সংগ্রহের পুরোভাগে হবে এটির স্থান।

আপনি আমার আন্তরিক প্রীতি ও সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন। ইতি –

প্রীতিমুগ্ধ
প্রবোধচন্দ্র সেন

২০-২-৭৫

বেলা ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্তির জন্য নির্বাচনী উপসংঘের সভা ছিল। ভাইস চ্যান্সেলর মতিন চৌধুরী আমার কুশল জিজ্ঞেস করলেন এবং ভবিষ্যৎ দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমি হেসে উত্তর করলাম, "যেখানেই নিযুক্ত হব সেখানকার কর্ম সাধনে তৎপর হব – এটাই তো মানুষের বিধিলিপি।" মতিন চৌধুরী অত্যন্ত দক্ষ মানুষ। অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন এবং অতি দ্রুত হাঁটেন ও কথা বলেন। সবচেয়ে বড় কথা, কোন সিদ্ধান্ত ত্রুটিপূর্ণ হলেও তিনি তার দায়-দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেন। অন্য কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দেন না।

সন্ধ্যে ৬টায় ধানমণ্ডির এক নম্বর সড়কে ভারতীয় দূতাবাসের সভাকক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত সাহিত্যিকদের সংবর্ধনা ছিল। বাংলাদেশের অনেকেই ছিলেন। ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার দীক্ষিতের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা হল। কথায় কথায় উপজাতীয়দের বিষয়ে তিনি মন্তব্য করলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, "কোন প্রকার দমননীতি অবলম্বন করে উপজাতীয়দের অস্থিরতা দূর করা যাবে না। ভারতের অনেক অঞ্চলে এই সমস্যাটি আছে। আমরা এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি।"

সন্ধ্যার পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার দেখা করতে এল। সে বলল যে, আমি যে নন-ফরমাল এডুকেশন কমিটির সভাপতি ছিলাম এনামুল হক সাহেব ভেবেছেন ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে এখন তিনি উক্ত কমিটির সভাপতি। তিনি এই মর্মে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে পত্র দিয়েছিলেন। সচিবালয় সেই পত্রটি পরিকল্পনা কমিশনে পাঠিয়ে দেয়। পরিকল্পনা কমিশন উত্তরে এনামুল হক সাহেবকে জানিয়ে দিয়েছে যে, উক্ত কমিটির সভাপতি ব্যক্তিগতভাবে আমি ছিলাম এবং কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমিই থাকব। আমি ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে বললাম, "এনামুল হক এসব কেন করছেন আমি বুঝতে পারছি না। তুমি এ সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।"

www.pathagar.com

২১-২-৭৫

আজ শহীদ দিবস। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছরের মত এবারও সকালবেলা আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পকাতা উত্তোলন এবং বক্তৃতা ছিল। নুতন কর্তৃপক্ষ অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানাননি। আমি বাসায় ছিলাম এবং নিচের তলায় আমার ব্যক্তিগত পাঠাগারে বইগুলো সেলফ থেকে নামাচ্ছিলাম। এর মধ্যে শিবনারায়ণ রায় এলেন। এগারোটা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন। এম. এন. রায়ের কথা উঠল। আমি বললাম, এম. এন. রায় ছিলেন অত্যন্ত যুক্তিবাদী পুরুষ। তাঁর মধ্যে সাম্প্রদায়িক বোধ তিলমাত্র ছিল না। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের কার্যকারিতা নেই এটা সত্য। কিন্তু তার মানবতাবোধ হারিয়ে যাবার নয়। ইসলাম সম্পর্কে তার যে ছোট বইটি আছে তাতে তিনি বিশ্ব-সভ্যতায় ইসলামের দান সম্পর্কে যে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন তার তুলনা হয় না। আমরা যাকে এক সময় এম. এন. রায়ের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত ছিলাম আমাদের উচিত নতুন প্রজন্মের কাছে সে সব চিন্তাধারা পৌঁছে দেয়া। এ ব্যাপারে আপনার সুযোগ বেশি। আপনি কিছু করলেও করতে পারেন। শিবনারায়ণ বললেন, "আমি রায়ের সমস্ত রচনা সংগ্রহ করে প্রকাশ করবার চিন্তা-ভাবনা করছি। রায়ের গ্রন্থাবলী যদি প্রকাশিত হয় তাহলে নতুন সময়ের মানুষরা রায়ের বক্তব্য জানতে পারবে এবং হয়তোবা উদ্বুদ্ধ হতে পারবে।" শিবনারায়ণ থাকতে থাকতে হালিমা খাতুন এল। সে ইউনেস্কোর একটি চাকরি পাবার সম্ভাবনার কথা বলল।

২২-২-৭৫

আজ সারাদিন জিনিসপত্র গোছাতেই সময় গেল। দু'একদিনের মধ্যে চট্টগ্রামে মালপত্র পাঠিয়ে দেব।

২৩-২-৭৫

আজ দুপুরে ভারতীয় দূতাবাসের মিলিটারি এ্যাটাচি বোরার বাসায় ডেপুটি হাইকমিশনার দীক্ষিতের বিদায় উপলক্ষে মধ্যাহ্নভোজ ছিল। বোরা নিরামিষাসী। সে সব্জির পোলাও করেছিল, সব্জির কোরমা এবং সব্জির চপ করেছিল। সঙ্গে দহি বড়া ছিল। দহি বড়াটি অত্যন্ত সুস্বাদু হয়েছিল। মিষ্টি ছিল নানা প্রকারের, তবে সেগুলো ছিল দোকানের। মধ্যাহ্ন ভোজে কলিম শরাফীকে দেখলাম। কথাবার্তা জানলাম যে, দেশ বিভাগের পূর্ব থেকেই বোরার পরিবার-পরিজনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব আছে। বিকেল ৪টায় চট্টগ্রামের সিন্ডিকেটের সভায় যোগ দেবার জন্য বাংলাদেশ বিমানে চট্টগ্রামে গেলাম। এয়ারপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি নিয়ে কোরেশী এসেছিল। রাত্রিবেলা কোরেশীর মামা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক আলম সাহেবের ওখানে খেলাম। আলম সাহেবের স্ত্রী খুব ভালভাবে রান্না করতে পারেন। কচি লাউয়ের পাতা দিয়ে ইলিশ মাছ রান্না করেছিলেন, খুব সুস্বাদু হয়েছিল।

www.pathagar.com

২৪-২-৭৫

সকাল বেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট মিটিং ছিল। সিন্ডিকেট মিটিং শেষে বাংলা বিভাগে বসে শিবনারায়ণের অনুষ্ঠানসূচী নিয়ে আলাপ-আলোচনা হল। আজ শিবনারায়ণের চট্টগ্রামে আসার কথা ছিল, কিন্তু তার স্ত্রী হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে এ মাসে শিবনারায়ণ আসছেন না।

সন্ধ্যে ৬টায় আবুল ফজলের বাসায় চা খেলাম। সৈয়দ মোহাম্মদ শফির বাসায় রাতের খাবার খেলাম।

২৫-২-৭৫

সকাল ১০টায় সকল ছাত্র-ছাত্রীদের একটি মিলিত সভায় বক্তৃতা করলাম। বক্তৃতার বিষয় অবশ্য সাহিত্য ছিল না। আমি যে আবার ছাত্রদের মধ্যে ফিরে এলাম, আমার জীবনে এর তাৎপর্য কি, তা নিয়ে আমি কিছু কথা বললাম। আমাকে পেয়ে ছাত্রদের খুব উৎফুল্ল মনে হল। তাদের মধ্যে দু'একজন আমাকে স্বাগত জানিয়ে তাদের আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ করল। একটি মেয়ে আমাকে একটি ফুলের তোড়া উপহার দিল। দুপুরে আমার ছাত্র আবদুল মান্নানের ওখানে খেলাম। মান্নান এখন চট্টগ্রামের সিটি কলেজের অধ্যাপক। মান্নানের স্ত্রীও আমার ছাত্রী। মান্নানের বাসা থেকে সরাসরি পতেঙ্গা বিমানবন্দরে এলাম। সেখান থেকে ৫টা ৪৫ মিনিটের ফ্লাইটে ঢাকায় রওয়ানা দিলাম।

২৬-২-৭৫

আজ ঢাকায় আমার শেষ দিন। সারাদিন আত্মীয়-স্বজন বাড়িতে আসা-যাওয়া করছে। দুটি ট্রাকে গতকালই আমার স্ত্রী মাল বোঝাই করে রেখেছিলেন। আজ সকালে ট্রাক দুটি চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা হল।

রাত ১০টায় চট্টগ্রাম মেইলে ঢাকা থেকে রওয়ানা হলাম। স্টেশনে আত্মীয়-স্বজনরা উপস্থিত ছিল। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কয়েকজন উপস্থিত ছিল। প্রশাসন বিভাগ থেকে আরজ আলী উপস্থিত ছিলেন এবং শিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র সালাহউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। আরজ আলীকে খুব মর্মাহত দেখলাম, সে বারবার করে চোখ মুছছিল। স্টেশনে কবি গোলাম মোস্তফার বড় মেয়ে জ্যোস্নাকে দেখলাম। সে এসেছিল তার কোন আত্মীয়কে বিদায় জানাতে। আমার বড় ছেলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। সে আগে থেকেই চট্টগ্রামে আছে। আমার ছোট ছেলে সিমাবকে হোসেনী দালানে আমার ছোট ভাই রেজার ওখানে রেখে এলাম। সে ঢাকায় পড়াশোনা করছে। আমার স্ত্রী, আমি এবং আমাদের ছোট মেয়ে নাসরিন চট্টগ্রামে চললাম। আমাদের একটি কুকুর ছিল। কুকুরটি রেল কর্তৃপক্ষের কাছে সোপর্দ করেছিলাম। ওকে সম্ভবত কোন মালের কম্পার্টমেন্টে রাখা হয়েছে। ট্রেন ছাড়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ভাবছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত শিক্ষককে আমি নিযুক্তি দিয়েছিলাম তাদের মধ্যে যারা ঢাকা থাকেন তারা হয়তো বিদায় জানাতে আসবেন। কিন্তু তাদের কাউকে দেখলাম না। মন একটু বিষণ্ন হল। বিদায় নেয়াটা এমন কিছু নয়, চাকরি জীবনে

www.pathagar.com

স্থানান্তরের সমস্যা সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু মানব নির্মাণের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সুতরাং আশা করেছিলাম যে, সেখানকার অধ্যাপকরা মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ থাকবে, হয়তোবা কিছুটা কৃতজ্ঞতাবোধেও। এ কথাটা আমার স্ত্রীকে বলতেই তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, "তুমি তোমার নিজের কথা ভাববে, নিজের কর্তব্যের কথা ভাববে, মানুষের কথা কেন ভাবছ? যারা সুবিধা পাবার, তারা তোমার কাছ থেকে সুবিধা নিয়েছে, এখন তারা নতুন মানুষের কাছে সুবিধা নেবে। মানুষ গাভীকে ততদিন পর্যন্ত দোহন করে যতদিন পর্যন্ত সে দুধ দেয়। কিন্তু যখন তার দুগ্ধ দেবার ক্ষমতা থাকে না, তখন আর দোহন করে না।" আমি হেসে বললাম, "মানুষের জীবনে বোধ হয় গাভীর উপমা আনাটা ঠিক হল না।"

ট্রেনে আমার সাধারণত ঘুম হয় না। আমি চলমান ট্রেনের শব্দ শুনি, বিভিন্ন স্টেশনে চিৎকার শুনি এবং এ সমস্ত শব্দের কোলাহলের মধ্যে সবকিছু ভুলে যেতে চাই। মানুষ হিসেবে আমরা কখনও সময়কে ধরে রাখতে পারি না। আমরা সময় হারিয়ে হারিয়েই চলি। মানুষ সর্বদা সময়ক্ষেপণ করে এবং সময়ক্ষেপণের মধ্যে মানুষের জীবনের সিদ্ধি অথবা ব্যর্থতা।

২৭-২-৭৫

সকালে চট্টগ্রামে পৌঁছলাম। স্টেশনে কোরেশী উপস্থিত ছিল। আজ এবং আগামীকাল আমার ছুটি রয়েছে। পহেলা মার্চ আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগ দেব। কোরেশীর বাসায় বাংলা বিভাগের শিক্ষকরা এলেন। তারা আমাকে আজ রাতে তাইওয়া নামক চীনা রেস্তোরাঁয় অভ্যর্থনা দেবে বলল। আমি দিনের বেলা খুব ক্লান্ত ছিলাম বলে কোথাও গেলাম না। দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে কাটালাম। কেন যে ঢাকায় একমাস ছুটিতে কাটালাম জানি না। দেশের প্রধান ব্যক্তির আশ্বাস পেয়েছিলাম যে, এই ছুটির মধ্যে তিনি আমার জন্য কিছু করবেন। কিন্তু তার কাছ থেকে কোন সাড়া পাইনি। একদিন ক্যাপ্টেন মনসুর আলী আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েই আমাকে রাখার ব্যবস্থা করা উচিৎ ছিল, কিন্তু তা করা গেল না বলে তিনি খুব দুঃখিত। তবে তিনি আমার বিষয়ে বঙ্গবন্ধুকে বলবেন বললেন। তিনি হয়তো বলেছিলেন, কিন্তু হয়তো তাঁর নেতার কাছ থেকে তিনি সাড়া পাননি।

সারা দুপুর ঘুমিয়ে কাটালাম। রাতে 'তাইওয়াতে' খেতে গেলাম। সেখানে আবুল ফজল সাহেব ছিলেন এবং ইংরেজি বিভাগের প্রফেসর মোহাম্মদ আলী ছিলেন। চট্টগ্রামের চীনা খাবার ঢাকার চেয়েও উন্নতমানের বলে আমার মনে হল।

২৮-২-৭৫

শিল্পপতি এ. কে. খান সাহেবের বাসায় গেলাম। তাঁর সঙ্গে আমার একটি আন্তরিক সম্পর্ক আছে। এ সম্পর্কটি হৃদয়ের এবং পারস্পরিক শুভ বুদ্ধির। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি তাঁর নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের জন্য। এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে সুশৃংখলাবোধ এবং বিচার-

www.pathagar.com

বিবেচনা-বুদ্ধি। তাঁর ও আমার কর্মধারা এক নয়, কিন্তু আমরা একটি সহানুভূতির প্রেক্ষাপটে মিলিত হতে পেরেছি। সেই প্রেক্ষাপটটি হচ্ছে মমতা এবং মানুষের প্রতি সম্মানবোধ এবং বিশ্বাস। আমি আমার স্ত্রী এবং কন্যা নাসরিনকে সঙ্গে নিয়ে তার ওখানে গেলে তিনি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলেন। পাহাড়ের ওপর প্রচুর বৃক্ষরাজির আড়ালে তাঁর বাসভবন। সব সময় ছায়াঘেরা থাকে। তিনি অতিথি আপ্যায়নে সিদ্ধহস্ত। বাক-চাতুর্যেও অত্যন্ত দক্ষ। অনেকক্ষণ নানা বিষয়ে আমরা আলোচনা করলাম। খান সাহেব আমাদের দেশের বিশৃংখল অর্থনীতির কথা বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন যে, অতি অল্পসময়ের মধ্যে নিষ্ঠা ও সততার সাহায্যে দেশ গড়ার কাজে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ কোরিয়া একটি শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত হয়েছে। অথচ আমরা আমাদের দেশে আমাদের জনসমষ্টিকে শুধু আবেগে উদ্বেলিত করেছি, কিন্তু কর্মের নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারিনি। কর্মে অবহেলা, শিথিলতা এবং অনিচ্ছার প্রদাহ আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ হতে দিচ্ছে না।

খান সাহেবের বাসা থেকে বেরিয়ে আমার ছাত্র মান্নানের বাসায় গেলাম। মান্নান সিটি কলেজের কাছে একটি বাসায় থাকে।

১-৩-৭৫

গতকাল পর্যন্ত আমার ছুটি ছিল। আজ বাংলা বিভাগে নতুন করে যোগ দিলাম। প্রথমে বাংলা বিভাগের শিক্ষকদের নিয়ে একটি সভা করলাম। সভায় পাঠক্রম নিয়ে আলোচনা হল এবং গবেষণা কর্মে কি কি প্রকল্প গ্রহণ করা যায় তা নিয়ে মতবিনিময় হল।

চারুকলা বিভাগটি বাংলা বিভাগ সংলগ্ন ছিল, এখনও আছে। রশীদ চৌধুরী আমাকে সে বিভাগে নিয়ে গেল। সেখানকার ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটালাম। যখন এ বিভাগটি প্রথম খোলা হয় তখন এই বিভাগে আমি নিয়মিত ক্লাস নিতাম। আমি বললাম যে, এবার আগের মত নিয়মিত ক্লাস নিতে পারব না। তবে কয়েকটা বিষয়ে মাঝে মাঝে বক্তৃতা দেব, তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের উপকার হবে বলে বিশ্বাস। রশীদ চৌধুরী সে দিনই সন্ধ্যায় চারুকলা বিভাগের একটি ছাত্রের বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অনুরোধ করল। সন্ধ্যা ৭টায় বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম। অনুষ্ঠানে চারুকলা বিভাগের রশীদ চৌধুরী, জিয়া হায়দার এবং মুর্তজা রশীদ উপস্থিত ছিলেন।

২-৩-৭৫

সকালে বাংলাদেশ বিমানের ৪২২ নং ফ্লাইটে ঢাকায় এলাম। আগামীকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি সভা আছে। একটি এফিসিয়েন্সি বার কমিটি, অপরটি বাংলা বিভাগের জন্য নির্বাচন কমিটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে উঠলাম। সারা দিনের মধ্যে ডঃ মনিরুজ্জামান এল, আবু জাফর এল এবং আবুল কাসেম ফজলুল হক এল। রাতে ফজলে রাব্বির বাসায় গেলাম।

www.pathagar.com

৩-৩-৭৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অফিস কক্ষে প্রথমে এফিসিয়েন্সি বার কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হল এবং বাংলা বিভাগের দুজন প্রভাষকের জন্য নির্বাচকের সভা অনুষ্ঠিত হল। এফিসিয়েন্সি কমিটিতে আমার সঙ্গে ছিলেন শামসুল হক। ইনি ইয়াহিয়ার মার্শাল 'ল আমলে পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। এঁর একটি বিশেষ প্রতিভা হচ্ছে ইনি সব বিষয়ে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের সঙ্গে সুষ্ঠু সম্পর্ক বজায় রাখেন এবং কথা-বার্তায় খুবই বিবেচনার পরিচয় দিয়ে থাকেন, যাকে বলা যায় ডিপ্লোমেটিক। তিনি কারো সঙ্গে খুব বেশি ঘনিষ্ঠ হন না, কিন্তু সাক্ষাতে প্রমাণ দিয়ে থাকেন যে, তিনি অত্যন্ত আন্তরিক।

সভার শুরুতে তিনি আমাদের কুশল জিজ্ঞেস করলেন এবং এক পর্যায়ে মন্তব্য করলেন যে, অনানুষ্ঠানিক বা নন-ফর্মাল শিক্ষা কমিটিতো ডঃ এনামুল হক দেখবেন। আমি তাঁকে সবিনয়ে জানালাম যে, সরকারের নির্দেশক্রমে উক্ত কমিটির দায়িত্বভার আমার ওপরই ন্যস্ত থাকছে।

নির্বাচনী উপ-সংঘের সভায় মিসেস নীলিমা ইব্রাহিম, ডঃ এনামুল হক এবং ডঃ আহমদ শরীফ সদস্য ছিলেন। এই সভা চলাকালে এক পর্যায়ে আহমদ শরীফের সঙ্গে নীলিমা ইব্রাহীমের কথা কাটাকাটি হয়। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হয় যে, নীলিমা ইব্রাহীম অপমানিতবোধ করে সভা ত্যাগ করবার চেষ্টা করেন। যাই হোক শেষ পর্যন্ত তাকে শান্ত করে সভার কার্য সম্পাদন করতে সমর্থ হই।

দুপুর বেলা আবু জাফরের বাসগৃহে এলাম। আবু জাফর এখন ফজলুল হক হলের হাউজ টিউটর।

৪-৩-৭৫

সকালে বিমানে চট্টগ্রামে ফিরে গেলাম। বাংলা বিভাগে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ওপর একটি বক্তৃতা দিলাম। মধুসূদন নিয়ে আমার চিন্তা-ভাবনা দীর্ঘদিনের। মধুসূদনের সব কটি কাব্যগ্রন্থের ওপর আমার লিখিত আলোচনা আছে। তাঁর দুটি প্রহসনের ওপরও আমার দুটি বই আছে। কিন্তু নাটক নিয়ে কোন কাজ আমি এ পর্যন্ত করিনি। বাংলা ভাষায় নাট্যক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ট্রাজেডির অনুকরণে প্রথম ট্রাজেডির উদ্ভাবনা মাইকেল মধুসূদন দত্তের। অবশ্য তখনও নাটকের সংলাপের ভাষা যথার্থভাবে গড়ে ওঠেনি। মধুসূদন তাঁর প্রহসনে সংলাপ নির্মাণে যে চাতুর্য দেখিয়েছেন, ট্রাজেডিতে তা দেখাতে পারেননি। ট্রাজেডিতে তিনি ভাষাগত গাম্ভীর্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ এবং সন্ধি প্রকরণে তার সংলাপগুলো আড়ষ্ট হয়েছিল। ট্রাজেডিতে তার সংলাপগুলো ছিল দীর্ঘ এবং বিস্তারিত। অনেকটা মার্লোর নাটকের মত। বক্তৃতা শেষে আমি ভাবলাম যে মধুসূদনের ট্রাজেডি নিয়ে একটি নতুন প্রবন্ধ লিখব।

৫-৩-৭৫

আজ বাংলা বিভাগে রবীন্দ্রনাথের কাব্য কুশলতা নিয়ে একটি বক্তৃতা দিলাম। রবীন্দ্রনাথের ওপর যে বইটি আমি লিখেছি, সে বইটি সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্র কাব্য

www.pathagar.com

প্রতিভার ভূমিকাস্বরূপ। ওখানে রবীন্দ্রনাথের শব্দ ব্যবহার এবং রচনাশৈলীর ওপর কোন বিশ্লেষণ নেই। এখন নতুন কর্মে শিক্ষকতা কর্মে যোগ দিয়ে মনে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক কাব্য-কর্মের ওপর বিস্তৃত একটি গ্রন্থ লেখার প্রয়োজন আছে এবং আমার উচিত সে কাজে হাত দেয়া।

৬-৩-৭৫

আজ সকাল ১০টায় বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে একটি আন্তরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপন করল। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া চারুকলা, ইংরেজি এবং দর্শন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরাও ছিল। বিভাগের চাত্র-ছাত্রীরা একটি মানপত্র দিল, কিছু পুষ্প সম্ভার দিল এবং সর্বোপরি তাদের আনন্দ প্রকাশ করল। একটি ছাত্র তার বক্তৃতায় বলল যে, একজন শিক্ষক শুধু যে পড়ানোর গুণে জনপ্রিয় তা নয়, ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নির্মাণেই তিনি জনপ্রিয় হয়ে থাকেন। আমি উত্তরে বললাম, "ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অবস্থান করতে আমি আনন্দ পাই। আমার বর্তমান বয়স সব সময় আমাকে বলে যে, এক সময় আমিও যুবক ছিলাম এবং ছাত্র হিসাবে শিক্ষকদের কাছে থেকে পাঠ গ্রহণ করেছি। সুতরাং এখন সর্বক্ষণ আমার চেষ্টা ছাত্র-ছাত্রীদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করবার চেষ্টা। যে গ্রন্থ বা যে বিষয় আমি পড়াব তার মধ্যে আমি সীমাবদ্ধ থাকব না, সেগুলোর মধ্যে দিয়ে আমি জীবনের একটি চৈতন্যকে স্পর্শ করবার চেষ্টা করব। আমি আমার বক্তৃতায় লাফকাদিও হার্ন-এর কথা বললাম। হার্ন একজন বিখ্যাত সমালোচক এবং গল্প লেখক ছিলেন। তিনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ক্লাসে তার ছাত্ররা তার বক্তব্য লিখে রাখবার চেষ্টা করত। হার্নের মৃত্যুর পর এ বক্তব্যগুলো মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। তাতে আমরা দেখি যে, শুধুমাত্র পঠিত বিষয়ের মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিনি তার আলোচনার অনুষঙ্গে মানুষকে টেনে এনেছেন।

আমি আমার শিক্ষকতা জীবনে হার্নকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছি।

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটির একটি সভার নোটিশ সদস্যদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে ২৭ মার্চ সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে সবাইকে জানালাম। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটির এ. কে. খান সাহেবের কাছে একটি চিঠি দিলাম। তাঁর একটি সাক্ষাৎকারের সময় আমার সঙ্গে থাকবেন জনাব শামসুল হক এবং কমিটির সচিব ডঃ সেলিম। একদিন কথা প্রসঙ্গে এ. কে. খান সাহেব অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছিলেন। সেই সূত্র ধরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আয়োজন করেছি।

নতুন দিল্লীতে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে বাংলা সাহিত্য বিষয়ে একটি সেমিনার হবে। সেই সেমিনারে যোগদানের জন্য আমি এবং ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম নির্বাচিত হয়েছি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে আজ এ বিষয়ে একটি চিঠি পেলাম। সেমিনার হবে ১৯, ২০, ২১ ও ২২ এপ্রিল।

www.pathagar.com

৭-৩-৭৫

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিলাম যে, দিল্লী সেমিনারে যোগ দেব, আর একটি ব্যক্তিগত চিঠি দিলাম শিক্ষা মন্ত্রী ইউসুফ আলীকে। ইউসুফকে আমি লিখলাম যে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অবস্থানের সময় তাঁর কাছ থেকে যে সহানুভূতি এবং সমর্থন আমি পেয়েছিলাম তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এ চিঠি অবশ্য না লিখলেও চলত। তবে কতকগুলো ক্ষেত্রে প্রথা মানতেও হয়। তাই এ চিঠি লেখা।

নিউইয়র্কে আমার বড় মেয়ে জিনাতের কাছে একটি চিঠি দিলাম। তার সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করতে চাই। কিন্তু বিভিন্ন কাজের ব্যস্ততায় সব সময় পেরে উঠি না। জিনাতের গল্প পড়ার আগ্রহ খুব বেশি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রিয় লেখক। তার ধারণা যে 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র মত বই আর হয় না। আমার কোন বই প্রকাশিত হলে তার কাছে সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দেই। বিকেলে অর্থনীতি বিভাগের সালমা খান দেখা করতে এল।

৮-৩-৭৫

আজকে বাংলা বিভাগের সাহিত্য সমালোচনার একটি ক্লাস নিলাম। এ বিষয়টি আমার একটি প্রিয় বিষয়। এক সময় পঞ্চাশের দশকের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এই কোর্সের সূত্রপাত আমিই করেছিলাম।

৯-৩-৭৫

আজ ঘুম ভাঙলো প্রচণ্ড ঝড়ের শব্দে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাটি একটি অর্ধ উপত্যকার মত। যখন ঝড় আসে এবং বাতাস প্রবল হয় তখন তা প্রবল আবর্ত রচনা করে। সে সময় এত ধুলো ওড়ে যে, প্রায় কোন কিছু চোখে দেখা যায় না। তবে বৃষ্টি নামলে সব কিছু নতুন করে পরিচ্ছন্ন হয় এবং জায়গাটি ঢালু বলে পানি জমে থাকে না। বৃষ্টিতে ঢাকা শহর যেমন বিমূঢ় হয়ে থাকে ক্লেদ পংকিলতায়, চট্টগ্রামে তেমন কখনো হয় না। বৃষ্টি চট্টগ্রামকে পরিচ্ছন্ন করে তোলে। বৃষ্টির পর ভেজা কাকগুলো খাবারের সন্ধানে উড়ে আসে। ভেজা কাকগুলো দেখতে কিন্তু ভালই লাগে। তাদের কালো পালকগুলো চিক চিক করে এবং তাদের ডাকগুলো তখন কর্কশ মনে হয় না। আমি বন্ধ কাঁচের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে এবং পরে বৃষ্টির সরঞ্জাম লক্ষ্য করলাম। চট্টগ্রামে এই বৃষ্টি এবং ঝড়ের দুর্যোগ একটি সুন্দর দৃশ্য নির্মাণ করে যা তন্ময় হয়ে চেয়ে দেখার মত। মনে হয় প্রকৃতি এক প্রকার ক্ষুব্ধতা নির্মাণ করে শান্তিকে গ্রহণ করেছে। এটা যেন মানুষের জন্য একটি আদর্শের মত। মানুষের জীবনে ক্ষোভ এবং বিভক্তি জাগতেই পারে, কিন্তু ক্ষোভকে প্রশমিত করার মধ্যেই মনুষ্যত্ব। প্রকৃতির মত আমাদেরও ক্রোধ জীবনকে বিশৃংখল করে এবং স্থিরতা এক প্রকার কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে। আমি কখনও কারো প্রতি কোন প্রকার অসদ্ভাব লালন করতে শিখিনি। আমার নানাজান একজন ধর্মপ্রাণ সূফী সাধক ছিলেন। কখনও কোন কারণে তার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হলে তিনি তাড়াতাড়ি অজু করে মসজিদে চলে যেতেন এবং যতক্ষণ না ক্রোধ প্রশমিত হত

www.pathagar.com

ততক্ষণ বাসায় ফিরে আসতেন না। বাসায় যখন ফিরে আসতেন তখন তাকে দেখা যেত ধৈর্যশীল একজন সৌম্য পুরুষ। আমার জীবনে আমি যে সব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি সেগুলো আমাকে ধ্বংস করতে পারেনি। আমি নিজেকে কর্মের মধ্যে, পাঠ্যক্রমের মধ্যে এবং বিশ্বাসের মধ্যে এমনভাবে সম্পূর্ণ করেছি যে, আমার মনে কোন প্রকার অশান্তি স্থায়ী হতে পারেনি।

দুপুর বেলা রশীদ চৌধুরী এল এবং তার শহরের বাসায় রাত্রে আমাদের খেতে বলল। সন্ধ্যার পর আমি আমার স্ত্রী ও কন্যা নাসরিন এবং কোরেশী একসঙ্গে দেব পাহাড়ের কাছে রশীদ চৌধুরীর বাসায় গেলাম। রশীদ চৌধুরী এবং তার স্ত্রী মাটন রোস্ট করেছিল। এটাই ছিল প্রধান খাবার। প্রচুর রসুনের কোয়া কাঁচা মাংসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে এবং মাংসপিণ্ডটাকে দই-এর মধ্যে ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল। স্বাদের অনুপানগুলি দই-এর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল যেমন আদা পেঁয়াজ এবং লবণ। ফরাসিরা সাধারণত এভাবে রোস্ট তৈরি করে থাকে। খাবার শেষে রশীদ চৌধুরীর স্ত্রী আমাদের সামনে দু'ধরনের পনির পরিবেশন করলেন- এক ধরনের পনির ছিল সবুজ, তার মধ্যে পুদিনা পাতার মিশ্রণ ছিল। খাবার পর আমরা কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করলাম। রশীদ চৌধুরী বলল যে, তার টেপেস্ট্রীর ডিমান্ড ঢাকা শহরে বেশ বেশি। সে ভাবছে যে, কিছুদিনের ছুটি নিয়ে ঢাকায় পূর্ণোদ্যমে একটি কারখানা চালু করবে কি-না। আমি তাকে বারণ করলাম। আমি বললাম, "তুমি চাকরির প্রতি গুরুত্ব না দেখিয়ে ব্যবসার প্রতি গুরুত্ব দেবে এটা আমি কোনক্রমেই ভাবতে পারি না। তোমাকে আমি চট্টগ্রামে এনেছিলাম শুধু এই ভরসায় যে, তুমি এখানে একটি নতুন শিল্পধারা প্রবর্তন করবে এবং কিছু নতুন ছাত্র গড়ে তুলবে।" রশীদের স্ত্রী এ্যানি আমার কথায় সায় দিল। কিন্তু রশীদ বিমর্ষ হয়ে চুপ করে রইল। এরপর আমি আর কিছু বললাম না।

১০-৩-৭৫

আবুল ফজল সাহেবের সঙ্গে তার কক্ষে দেখা করলাম। আবুল ফজল সাহেবের সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই, কিন্তু লক্ষ্য করেছি আমার সামনে তিনি খুব সহজ হতে পারেন না। কেমন যেন বিব্রত বোধ করেন। তার কারণ সম্ভবত একটাই, কেউ কেউ তার মনে এই ধারণা দিয়েছে যে, ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে এককভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার তার আছে। তার এ রকম দু'একটি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ আমি সিণ্ডিকেটের সভায় করেছি। আমি তাকে বলেছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার একমাত্র সিণ্ডিকেটের এবং ভাইস চ্যান্সেলর সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত কার্যকর করবেন মাত্র। আমার কথা তিনি মেনে নিতে পারেননি। এর ফলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে অব্যবস্থা দেখা দিয়েছে। আবুল ফজল সাহেবের যুক্তি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে প্রয়োজনবোধে ভাইস চ্যান্সেলর এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, পরে তা তিনি সিণ্ডিকেটে রিপোর্ট করবেন।

বিকেল বেলা বিপণী বিতানে গেলাম একটি স্টুডিওতে ফটো তুলবার জন্য। সন্ধ্যায় শফির ওখানে গেলাম।

www.pathagar.com

১১-৩-৭৫

মান্নান খবর দিল যে, শিক্ষামন্ত্রী ইউসুফ আলী এবং একজন এমপি আজ রাতে তার বাসায় খাবে। সে আশা করছে যে, আমিও সেই নৈশভোজে যোগ দেব। আমি বিনয়ের সঙ্গে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলাম। আমি অবশ্য কোন কারণ দেখালাম না, শুধু বললাম আমার ইচ্ছে হচ্ছে না তাই আমি যাব না।

লন্ডন থেকে আমার বন্ধু ইভান জেলেনিক একটি পত্র দিয়েছে। জেলেনিক আমার ওপর খুব ক্ষুব্ধ। তার অভিযোগ আমি নিয়মিত পত্র দেই না এবং বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে চাই না। আসলে কথাটা হচ্ছে চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারে আমি খুব অলস। ইভানের সঙ্গে এক সময় আমি ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো শহরে একসঙ্গে কাটিয়েছিলাম। আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনের শেষে আমরা কোপাকাবানা সমুদ্র সৈকতের নিকটে একটি হোটেল কক্ষে সাতদিন ছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধুই সমুদ্র দেখা। বিক্ষুব্ধ, বিপুল, উদ্বেলিত আটলান্টিককে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সকাল থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যে পর্যন্ত। এ সাত দিনের অধিকাংশ সময় আমরা কাটিয়েছিলাম সমুদ্র সৈকতে। সমুদ্রই আমাদের মধ্যে একটি নিগূঢ় বন্ধন সৃষ্টি করেছিল। আমি ইভানের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রাখি না, কিন্তু অকস্মাৎ কখনও দীর্ঘ একটা পত্র লিখে আমার খবর তাকে জানাই। সে কিন্তু প্রায়ই চিঠি লেখে। উত্তর না পেলেও লেখে।

১২-৩-৭৫

আজ ঢাকায় যাবার কথা ছিল। আর্ট ইন্সটিটিউটের সিলেবাস সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি সভা হবার কথা ছিল, কিন্তু সভাটি বাতিল হয়ে গেছে।

রশীদ চৌধুরী আমার কাছে একটি প্রস্তাব আনে। বলল যে, কামরুল হাসানকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করার কথা সে ভাবছে। আমি বললাম যে, প্রস্তাবটি ভাল, কিন্তু সম্ভবত কামরুল হাসানকে আনা যাবে না। এক সময় আমি জয়নুল আবেদীনকে চট্টগ্রামে আনতে চেয়েছিলাম। তিনিও প্রথম প্রথম আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু ঢাকা ছেড়ে আসতে পারেননি। কামরুলেরও সেই অবস্থা। কখনই ঢাকা ছেড়ে আসতে পারবে না। আমি তবু তাকে বিষয়টি আবুল ফজল সাহেবের কাছে উত্থাপন করতে বললাম।

১৩-৩-৭৫

আজ অনেক দিন পর আবার বেনেদত্ত ক্রোচের 'আমার জীবন দর্শন' বইটি নতুন করে পড়া আরম্ভ করলাম। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় আমার চিত্তকে বিক্ষুব্ধতা থেকে রক্ষা করবার জন্য বইটি আমি প্রথম পড়ি। নওরোজ কিতাবিস্তান থেকে বইটি কিনেছিলাম আমার মনে আছে। মানবচিত্তের স্বাধীন অনুভূতির প্রতি ক্রোচের একটি আবেগময় বিশ্বাস ছিল। সে বিশ্বাসকে তিনি এ গ্রন্থে রূপ দিয়েছেন। যারা শুধুমাত্র মেটাফিজিক্স নিয়ে চিন্তা করে, এ বইটি তাদের জন্য নয়। যারা তাদের

www.pathagar.com

সময়কালের- বুদ্ধিবৃত্তির দ্বন্দ্ব এবং এক প্রকার অসহায়তার মধ্যে নিমজ্জিত এ বইটি তাদের জন্য। ক্রোচে তাঁর সময়কালের নৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা এ বইটিতে আছে। ক্রোচে যদিও বইটি তার সময়কালের মানুষের জন্য লিখেছেন, কিন্তু আজকের দিনের মানুষের কাছেও বইটির সমান মূল্য আছে।

১৪-৩-৭৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টস কমিটির সভার নতুন তারিখ ঠিক করে সবাইকে জানাবার জন্য সৈয়দ শফিকুল হোসেনের নিকট একটি পত্র দিলাম। কলকাতার কবি এবং সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্যের কাছে একটি চিঠি দিলাম। তাকে জানালাম যে, আমি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে যোগদান শেষে কলকাতায় আসব এবং রামকৃষ্ণ মিশনে অবস্থান করব। তিনি যদি তখন সাক্ষাৎ করেন তবে আমি খুশি হব। জগদীশ ভট্টাচার্য দীর্ঘকাল ধরে একটি কবিতা পত্রিকা সম্পাদনা করে আসছেন যে পত্রিকায় আমার কিছু কবিতাও ছাপা হয়েছে। 'নিমগ্ন মৈনাক' নামক আমার একটি কবিতা কলকাতার অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

বিকেল ৫টায় চট্টগ্রামের ইউসিসের একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করলাম। রবার্ট ফ্রস্টের ওপর আলোচনা ছিল। আমাকে সভায় সভাপতিত্ব করতে হল। সভাপতির ভাষণে আমি ফ্রস্টের শব্দ ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করলাম। আমি বললাম যে, ফ্রস্টের কবিতাগুলো সর্বৈবভাবে নিষ্কন্টক এবং সহজ। কিন্তু আশ্চর্যরকম তীক্ষ্ণ লাবণ্যে মণ্ডিত। ফ্রস্টের কবিতায় প্রতিদিনের সহজ শব্দগুলো বিস্ময়করভাবে দ্যুতিমান হয়েছে এবং অনিবার্য অর্থকে উপস্থিত করেছে। আলোচনায় অনেকেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। কোরেশী তার বক্তব্যে ফরাসি কবিতার বাক্-কৌশলের সঙ্গে ফ্রস্টের বাক্-কৌশলের তুলনা করেছিল। সব দিক থেকে আলোচনা সভাটি মনোজ্ঞ হয়েছিল। আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং চট্টগ্রাম কলেজের অনেক ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিল।

১৫-৩-৭৫

আজ তৃতীয় বর্ষ সম্মান শ্রেণীর ক্লাসে কবিতার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করলাম। বিভিন্ন সময় কবিতার বিষয়বস্তু নিয়ে বিভিন্ন রকমের আলোচনা হয়েছে। অতীতে কবিতার বিষয়বস্তু নিয়ে বিশেষ ধরনের সীমাবন্ধন ছিল, সবকিছুই কবিতায় আলোচ্য হতে পারত না। কিন্তু এখন পৃথিবীতে নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে এবং চতুর্দিকে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবার ফলে বিষয়বস্তুর কোন সীমাবন্ধন নেই। এর ফলে সমস্ত কিছুই কবির বিবেচনায় আসতে পারে। উত্তাপ যেমন আসতে পারে নিরুত্তাপ নিশ্চলতাও তেমনি আসতে পারে। সর্বপ্রকার আবেগ কবিতার বিষয়বস্তু হতে পারে। আবার যুক্তি ও বিশ্লেষণও কবিতার জন্য কাম্য হতে পারে। জগতের সকল সামগ্রী সকল ইতিহাস এবং সকল সম্ভাবনা কবিতার বিবেচনায় আসতে পারে। কবিতা এখন এমন একটি স্বাধীনতা ভোগ করছে, যে স্বাধীনতাকে ভবিষ্যতে আর খর্ব করা সম্ভব হবে না।

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট চারুকলা বিষয়ক কমিটির সভা ডাকার জন্য চিঠি দিলাম। একই ধরনের চিঠি সৈয়দ শফিকুল হোসেনকে গতকাল দিয়েছি। সন্ধ্যার সময় বাসা থেকে বেরুব ভাবছি এমন সময় হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে একজন মাওলানা সাহেব আমার সঙ্গে পরিচিত হতে এলেন। ভদ্রলোকের চুল-দাড়ি সবই শুভ্র, মুখের চামড়া শিথিল এবং কপালে প্রচুর রেখা। ভদ্রলোক এসেই বললেন যে, আমি চট্টগ্রামে এসেছি এতে তিনি খুব খুশি হয়েছেন এবং তাঁর মাদ্রাসার সকল শিক্ষকরা খুশি হয়েছেন। আমি যদি একদিন সময় করে মাদ্রাসায় যাই তাহলে তিনি খুব আপ্যায়িত হবেন। চট্টগ্রামে এই ধরনের অনুরোধ প্রায়ই আসে। প্রথমবার যখন চট্টগ্রাম এলাম তখন এ ধরনের আমন্ত্রণ অনেক পেয়েছিলাম। আমি মাওলানা সাহেবকে বললাম যে, আমি ধর্মীয় বিষয়ে, খুব অভিজ্ঞ ব্যক্তি নই, সে কারণে যেসব সভায় ধর্ম বিষয়ে আলোচনা হয় সে সব সভায় উপস্থিত হতে আমি খুব দ্বিধাবোধ করি। নিজেকে আমার তখন অনুপযুক্ত মনে হয়। কিন্তু আমার কথায় মাওলানা সাহেব তাঁর অনুরোধ তুলে নিলেন না। তিনি বললেন যে, আমার জ্ঞান-গরিমা সম্পর্কে তিনি খুব ওয়াকিবহাল। আমি যতই বিনয় করি না কেন আমার পাণ্ডিত্যের খবর সকলেই জানেন। মাওলানা সাহেবের অনুরোধ করবার এই পদ্ধতিটা শেষ পর্যন্ত আমাকে দুর্বল করে ফেলল এবং আমি সময় করে মাদ্রাসায় যাব বলে কথা দিলাম। কথা বলতে বলতে মাগরেবের সময় এসে গেল। মাওলানা সাহেব ওজুর পানি চাইলেন। তিনি খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে ওজু করলেন। তিনি অজু করে যখন উঠলেন তখন আমার কাছে মনে হল আমি যেন পরিচ্ছন্নতার একটি স্বরূপ দেখছি। মাওলানা সাহেব শুধু যে একটা রীতি মেনে অজু করলেন তা নয়, তিনি খুবই আস্তে আস্তে হস্তমুখ প্রক্ষালন করলেন, একবিন্দু পানিও যেন অপব্যয় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সমস্ত মুখমণ্ডল কনুই পর্যন্ত দুটি হাত এবং দুটি পা একটি আশ্চর্য পরিপূর্ণতার সঙ্গে ধৌত করলেন। মাগরেবের নামাজের পর আমি কিছু দূর এগিয়ে তাঁকে বিদায় জানালাম।

১৬-৩-৭৫

'মধু মালতী'র একটি ফারসি পাণ্ডুলিপি আবদুস সাত্তার মাস্টার আমাকে দিয়েছেন। পাণ্ডুলিপিটির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করছি। ফারসি কাব্যটির নাম 'কিস্সা এ মধুমালত ওয়া কুনওর মনোহর' (মূল গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে) এবং যে পাণ্ডুলিপিটি আমার হাতে এসেছে সেটি লিপিকৃত হয়েছে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে। লিপিকার হিসাবে ফকির মোহাম্মদের নাম পাওয়া গেল। আমাকে সাহায্য করবার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের ইমাম সাহেবকে ডেকেছিলাম। তিনি আমাকে কোনভাবেই সাহায্য করতে পারলেন না, বরঞ্চ ভুল ব্যাখ্যা দিলেন। শেষ পর্যন্ত আমাকে নিজের ক্ষমতার ওপরই নির্ভর করতে হল। শৈশবে পিতামাতার কাছে ফারসি ভাষার পাঠ নিয়েছিলাম এবং স্কুলে ফারসি ভাষার একটি শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। কিন্তু একেবারে চর্চা না থাকায় এখন একটু অসুবিধা হচ্ছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছোট মসজিদ আছে, তবে আবুল ফজল সাহেব একটি কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণ করেছেন তাতে বড় জামাত হতে পারে। স্থানীয়

www.pathagar.com

লোকদের অর্থানুকূল্যে এবং এককালীন কিছু অনুদান সরকারের কাছ থেকে নিয়ে এ মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। কিছু কাজ বাকি আছে। ২৬ মার্চ তারিখে কেন্দ্রীয় মসজিদটি উদ্বোধন করা হবে। ২৬ মার্চ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ দিনটি আমাদের স্বাধীনতা দিবস, আবার এ বছর ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী এ দিনই পড়েছে। সুতরাং উদ্বোধনের দিন হিসেবে এ দিনটি সমীচীন হয়েছে।

১৭-৩-৭৫

মোহিতলাল মজুমদারের 'স্মর গরল' কাব্য গ্রন্থটির ভূমিকা স্বরূপ কিছু কথা বাংলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষ সম্মান শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বললাম। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়তাম তখন মোহিতলাল মজুমদার আমার শিক্ষক ছিলেন। তাঁর কণ্ঠে তার অনেক কবিতার আবৃত্তি আমি শুনেছি। আমি সময় পেলে তার নীলক্ষেতের বাসায় যেতাম। তিনি আমার মধ্যে একজন মুগ্ধ শ্রোতা পেয়েছিলেন। সত্যিই মোহিতলাল মজুমদারের আবৃত্তি ছিল অসাধারণ। তন্ময় হয়ে তিনি আবৃত্তি করতেন এবং তার কণ্ঠস্বরে পরিপূর্ণ অর্থ নিয়ে আবৃত্তি উচ্চারিত হত। তাঁর সকল কবিতার মধ্যে আবৃত্তিযোগ্য উপকরণ ছিল। আজকের ক্লাসে কবিতা বিশ্লেষণ না করে মোহিতলাল মজুমদারের একটি পরিচিতি দিলাম বিশেষ করে ছাত্র হিসেবে আমি যে তার সান্নিধ্য পেয়েছিলাম সে বিবরণটি বিশেষভাবে দিলাম।

১৮-৩-৭৫

আজ এম. এ. দ্বিতীয় বর্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ভাষার বিশিষ্টতা নিয়ে আলোচনা করলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা কিভাবে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে অভিব্যক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল আমি আমার আলোচনায় তার একটি বিবরণ তুলে ধরলাম।

১৯-৩-৭৫

আজ সকালে.শামিম এসেছে ঢাকা থেকে। চট্টগ্রাম থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় সকলকে নিয়ে দেশত্যাগ যখন করেছিলাম তখন শামিম আমার সঙ্গে ছিল। শামিম আমার স্ত্রীর খালাতো ভাই। সে তার মার হাতে বানানো কিছু পিঠা নিয়ে এসেছিল।

শিকাগো থেকে ডঃ দিমকের চিঠি পেলাম। তিনি জানতে চেয়েছেন ভবিষ্যতে আমার আমেরিকায় যাবার কোন প্রোগ্রাম আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে সে সময় তিনি আমাকে তার বিভাগে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে বলবেন। ডঃ দিমক বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ নিয়ে চর্চা করেছেন। 'শ্রী চৈতন্য' ছিল তাঁর বিশেষ বিবেচনার বিষয়। মূলত মধ্যযুগের হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্য তিনি গভীরভাবে পাঠ করেছেন এবং আজীবন সেই চর্চাতেই নিমগ্ন রয়েছেন। তিনি সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্য চর্চায় আগ্রহী নন। তার একান্ত বিষয়গুলো হচ্ছে শ্রী চৈতন্যের জীবনী 'শ্রী কৃষ্ণ কীর্তন' এবং 'বৈষ্ণব পদাবলী'। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তার বিভাগে বাংলার যে কোর্সের ব্যবস্থা করেছেন সেটাই তাই ধর্মভিত্তিক সাহিত্য হয়েছে। এ ব্যাপারে তার স্বাধীনতা কম এটা তিনি একবার

www.pathagar.com

আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন। বাংলা বিভাগটি বাঁচিয়ে রাখার জন্য তিনি যে সমস্ত ক্ষেত্র থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন তার মধ্যে প্রধান হচ্ছেন ভারত সরকার। সেজন্য তিনি তাঁর সিলেবাসকে বাংলাদেশের অনুকূলে আনতে পারছেন না।

আজ দুপুরে চারুকলা বিভাগে শিল্পী মুর্তজা বশীরের একটি সংবর্ধনা ছিল। মুর্তজা বশীর শিল্পকলা একাডেমীর একটি প্রদর্শনীতে জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত হয়েছে, সে জন্য তাকে এ সংবর্ধনা দেয়া হচ্ছে। চারুকলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকবৃন্দ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। আমিও উপস্থিত ছিলাম। মুর্তজা বশীর তার শিল্পকর্মে ফর্মের বহুবিধ বৈচিত্র্য সম্পাদনের চেষ্টা করেছে। এ ক্ষেত্রে তার দক্ষতা সত্যিই প্রশংসনীয়।

২০-৩-৭৫

আজকে এম. এ দ্বিতীয় পর্বের মডারেশন ছিল। বহিরাগত সদস্য হিসাবে ডঃ আহমদ শরীফ ছিলেন। মডারেশনের পর বাংলা বিভাগে আমরা দুপুরের খাবার খেলাম। আমাদের একটু তাড়াতাড়ি করতে হল, তার কারণ আহমদ শরীফ আমাদের সঙ্গে পটিয়া যাবেন বললেন।

বিকেলবেলা হঠাৎ কয়েকজন বৌদ্ধ ছাত্র এসে উপস্থিত। তারা চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র। তাদের সমস্যা হচ্ছে যে, তারা পালি পড়তে চায় না, তারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চায়। পালি পড়ে তাদের কি লাভ হবে এই ছিল তাদের জিজ্ঞাসা। আমি বললাম, দেখ পালি হচ্ছে তোমাদের ধর্মীয় ভাষা। বৌদ্ধ গৃহী হিসাবে তোমাদের ধর্মের কোন পরিচিতি নেই। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্ম ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে সেজন্যই আমি মনে করি, বৌদ্ধ ছাত্রদের উচিত পালি ভাষায় শিক্ষা লাভ করা এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করা। এগুলোর চর্চা যদি তোমাদের মধ্যে থাকে তাহলে তোমরা যে আধুনিক হতে পারবে না তা কিন্তু নয়।"

২১-৩-৭৫

আজ বাংলা বিভাগের কার্যধারা নির্ধারণ এবং নিমন্ত্রণ সংক্রান্ত একটি আলোচনা সভা ছিল। বিভাগের সকল শিক্ষকই উপস্থিত ছিলেন।

এ. কে. খান সাহেব টেলিফোন করে নন-ফরমাল এডুকেশন কমিশন সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলেন।

২২-৩-৭৫

আজ বিকেল ৪টায় স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিলাম। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল এক ধরনের সান্নিধ্য থেকে। ১৯৫০ সালে আমি গোপীবাগে থাকতাম। তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার পথে প্রতিদিনই রামকৃষ্ণ মিশন ভবনটি আমার বাঁ হাতে পড়ত এবং ফেরার পথে ডান হাতে। এ মিশন সম্পর্কে তখন আমার

www.pathagar.com

কৌতূহল জাগে। ক্রমশ মিশনের অধ্যক্ষের সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং মিশনের পাঠাগারটি ব্যবহার করতে আরম্ভ করি। এই পাঠাগারে তখন পুরনো পত্র-পত্রিকা অনেক ছিল– 'বসুমতী', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'মানসী ও মর্মবাণী' এবং আরও অনেক। এ পত্রিকাগুলোর প্রতি আমার আগ্রহ ছিল। প্রায়ই অবসর সময়ে মিশনে গিয়ে এসব পত্রিকা আমি দেখতাম। এভাবে মিশনের কর্মীদের সঙ্গেও আমার পরিচয় ঘটে। এরা সবাই গৃহী-জীবন ছেড়ে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেছে এবং লোক-সেবাকে ব্রত হিসাবে নিয়েছে। আমার কাছে এদের ব্যবহারটি খুব ভাল লাগত। এরা সত্যিকারের আদর্শ পুরুষ কিনা তা আমি জানি না। কিন্তু এদের বাহ্যিক আচরণে আমি বিনয় লক্ষ্য করেছি। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি কলকাতায় ছিলাম, তখন রামকৃষ্ণ মিশন আয়োজিত গোল পার্কের সভায় আমি কয়েকটি বক্তৃতাও দিয়েছি এবং দু'একদিন সেখানে আমি খেয়েছিও। মিশনের যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন তাকে সবাই 'মহারাজ' বলত। ভদ্রলোক জ্ঞানী ছিলেন এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করতে পারতেন।

চট্টগ্রামের রামকৃষ্ণ মিশনটি ছোট, কর্মপরিধিও খুব ব্যাপক নয়। আমি যতক্ষণ সেখানে ছিলাম পরিবেশটি ভালই লেগেছিল। চট্টগ্রামের স্থানীয় কিছু সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোককে সেখানে দেখলাম। রামকৃষ্ণ মিশন সাধারণভাবে হিন্দুদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আলোচনার সুযোগ করে দিয়ে থাকে। ঢাকায় পূজোর সময় দেখেছি হিন্দুদের একটি প্রধান পূজামণ্ডপ রামকৃষ্ণ মিশনে স্থাপিত হত।

মিশন থেকে ফেরার পথে শহরের মধ্যস্থলে বৌদ্ধ মন্দিরে কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করেছিলাম।

২৩-৩-৭৫

আজ দুপুরে রাউজানে একটি সাহিত্য সভায় গেলাম। রাউজান কবি হামিদ আলীর জন্মস্থান। স্থানীয় সাহিত্যামোদীরা প্রতি বছর হামিদ আলীর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে থাকেন। আমাকে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে হল। আবুল ফজল ছিলেন প্রধান অতিথি। কয়েকজন স্কুল ও কলেজ শিক্ষক হামিদ আলী সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেন। বক্তব্যগুলো খুবই নিম্নমানের ছিল। হামিদ আলী কয়েকটি কাব্য উপাখ্যান রচনা করেছিলেন। সেগুলো হচ্ছে 'কাসেম-বধ কাব্য', 'জয়নাল-উদ্ধার কাব্য' এবং 'সোহরাব-বধ কাব্য'। যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবায় ব্রতী হন সে সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, 'হিন্দু দেবদেবীর উপাখ্যান ও অর্চনাবিহীন কোন একটি প্রসিদ্ধ চিত্তাকর্ষক ঘটনা অবলম্বনে মুসলমান পাঠকদের জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্য সৃষ্টি ও মনোরম কাব্য গড়নই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমি আমার সভাপতির ভাষণে চট্টগ্রামের সাহিত্য-সেবীদেরকে হামিদ আলীর কাব্যপ্রতিভা নিয়ে গবেষণা করতে বললাম।

২৪-৩-৭৫

আজ বিকেলে একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিং ছিল। আবুল ফজল সাহেব সভা পরিচালনায় খুব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। অসুবিধা হবারই কথা। সবাই কথা বলতে চায়। আবার কখনও কখনও একসঙ্গে কথা বলতে চায়। একটু সচেতনতা এবং বুদ্ধিমত্তার

www.pathagar.com

অভাব ঘটলে এসব সভায় বিশৃংখলা দেখা দেয়। আবুল ফজল সাহেব জীবনে কোন দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেননি এবং সে কারণে বিশ্ববিদালয়ের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাও গড়ে ওঠেনি। শুধুমাত্র বয়েসের অধিকারে তিনি কর্তৃত্ব প্রকাশের চেষ্টা করেন। কিন্তু এখনকার দিনের কেউ বয়সের দাবি মানতে চায় না।

২৫-৩-৭৫

আজ বেলা ১১টায় বাংলা বিভাগে শিবনারায়ণ রায় একটি বক্তৃতা করলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল – 'রেনেসাঁ ও বাঙালী'। তিনি ইউরোপের রেনেসাঁর বিশিষ্টতা ব্যাখ্যা করলেন এবং সেই রেনেসাঁর আলোকে বিংশ শতকের বাঙালির চারিত্রিক পরীক্ষার প্রয়াস পেলেন। সভার পর আমার গাড়িতে করে শিবনারায়ণকে নিয়ে রাঙামাটি গেলাম। সঙ্গে ছিল কোরেশী এবং লাইব্রেরিয়ান শামসুল আলম। রাঙামাটিতে এক ছাত্রের বাড়িতে দুপুরের খাবার খেলাম।

শিবনারায়ণের ইচ্ছায় আমরা রাঙামাটিতে এলাম। তিনি রাঙামাটি দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু হাতে সময় কম ছিল, তাছাড়া দুপুর বেলা রোদের তাপের মধ্যে ঘোরাফেরারও অসুবিধা ছিল। সেজন্য আমার মনে হয় না যে, শিবনারায়ণ ভ্রমণটি উপভোগ করেছিলেন। আমরা বিকেল ৪টার মধ্যে শহরে ফিরে এলাম।

বিকেল ৫টায় আমাকে যেতে হল বোয়ালখালী আদর্শ বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে। প্রদান অতিথি হিসেবে আমাকে বক্তৃতা করতে হল এবং ছেলেমেয়েদের হাতে পুরস্কার তুলে দিতে হল। চট্টগ্রামে এসে এই এক ধরনের অদ্ভুত কর্মকাণ্ডে আমি জড়িয়ে পড়েছি– বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাওয়া এবং বক্তৃতা করা। এগুলো আমি এড়াতে পারি না। এড়াতে গেলে স্থানীয় লোকরা অসন্তুষ্ট হয়।

২৬-৩-৭৫

আজ আমার জন্মদিন। আমার স্ত্রী দুপুরে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। এতে যোগ দিয়েছিলেন শিবনারায়ণ রায়, কোরেশী, সামসুল আলম, আবদুল আউয়াল এবং আবু হেনা মুস্তাফা কামাল। আমার স্ত্রী এবং কন্যা নাসরিন উভয়ে মিলে নানা রকমের খাবারের আয়োজন করেছিলেন। মাছ ছিল কয়েক রকমের। মাংসের পদও ছিল কয়েকটি, সব্জির মিশ্রণ ছিল কয়েকটি এবং তিন রকমের মিষ্টি ছিল। অতিথিরা সবাই তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন এবং প্রথাগতভাবে আমার দীর্ঘজীবন কামনা করলেন। শিবনারায়ণ একটি কথা বললেন যা আমার খুব ভাল লাগল। "জন্মদিন আসে আর যায়, কিন্তু জন্মদিন উদযাপিত হয় বলে জন্মদিনের মানুষটি অনুভব করে যে, সে জীবিত আছে।"

আজ স্বাধীনতা দিবস। আজকের দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের উদ্বোধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবুল ফজল সাহেব উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনের আগে আমরা একটি ট্রানজিস্টার নিয়ে মসজিদের চত্বরে বসলাম জাতির উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনবো বলে। আজ আবার ঈদ-ই-মিলাদুন্নবীও ছিল। আমরা ভাবছিলাম বঙ্গবন্ধু মিলাদুন্নবী উপলক্ষে মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করবেন এবং মুসলিম

www.pathagar.com

দেশসমূহের রাষ্ট্রনায়কদের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করবেন। পরে নিশ্চয়ই তিনি আমাদের দেশের স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য শুনে আমরা ক্ষুব্ধ ও হতাশ হলাম। তিনি যা বললেন তার সঙ্গে মুসলিম উম্মাহর কোন সম্পর্ক নেই এবং দেশের স্বাধীনতারও কোন সম্পর্ক নেই। তিনি শুধু তার দলের এমপিদের সমর্থনে সম্পূর্ণ ভাষণটি ব্যবহার করলেন। সে সময় দেশব্যাপী রিলিফের মাল আত্মসাৎ করা নিয়ে প্রচুর সমালোচনা করা হচ্ছিল এবং একটি প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধতা ছিল। এই বিক্ষুব্ধতা এবং সমালোচনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু যেভাবে তার দলীয় এমপিদের সমর্থনের কথা বললেন তাতে আমরা খুবই অবাক হলাম এবং দুঃখও পেলাম। তার মত একজন নেতা দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে পারবেন না এটা আমি কখনও ভাবতে পারিনি।

রেডিও'র ভাষণের শেষে মসজিদে মিলাদ পড়ান হল। আবুল ফজল সাহেব একটি বক্তৃতা করলেন। এই বক্তৃতার মাধ্যমে এই মসজিদটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পূর্ণ হল।

২৭-৩-৭৫

আজ ঢাকায় এসেছি চারুকলা ইনস্টিটিউটের সিলেবাস এবং পাঠ্যক্রম বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদানের জন্য। আমি উঠেছি এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে। বিকেল ৪টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের একটি কক্ষে, আমার সভাপতিত্বে চারুকলা বিষয়ক একটি মিটিং বসল। মিটিং-এ ছিলেন জয়নুল আবেদীন, শফিউদ্দিন, রশীদ চৌধুরী এবং শফিকুল হোসেন। আর্ট ইনস্টিটিউটে এম.এফ.এ কোর্স খোলা হবে সেজন্য সিলেবাস তৈরির উদ্দেশ্যে এই সভা ডাকা হয়েছে। মিটিং আগামীকালও হবে। মিটিং-এর মাঝখানে এক সময় জয়নুল আবেদীন বললেন – "আলী আহসান সাহেব, যেভাবে আপনি সিলেবাস করেছেন তাতে আপনাকেই সব ক্লাস নিতে হবে।" শফিউদ্দিন এ কথায় একটু মনঃক্ষুণ্ন হলেন। তিবি ভাবলেন যে, আবেদীন সাহেবের কথায় ইঙ্গিত করা হয়েছে ইনস্টিটিউটের শিক্ষকরা মাস্টার্স পড়ানোর যোগ্যতা রাখেন না। আমি হাসিমুখে শফিউদ্দিনকে বুঝিয়ে বিষয়টির নিষ্পত্তি করলাম।

দুপুরে এবং রাতে আমি আমার বোন সাদেকার ওখানে খাবারের ব্যবস্থা করেছিলাম।

২৮-৩-৭৫

আজ সকালে দেখা করতে এসেছিল মুস্তফা নূরউল ইসলাম, আরজ আলী, হালিমা খাতুন এবং বেবী জামান। বিকেল ছ'টায় শামসুল হক সাহেবের বাসায় চা খেলাম। সেখান থেকে শিল্পকলা একাডেমীতে এলাম। ভারতের বিখ্যাত শিল্পী এবং শিল্পতত্ত্বজ্ঞ চিন্তামনিকর আধুনিক শিল্পকলা বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করলেন। তিনি আধুনিক শিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আলোচনা করলেন। তিনি বিশেষ করে চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যের ফর্ম নিয়ে আলোচনা করলেন। পাশ্চাত্য জগতে ফর্মের বিশ্লেষণ নিয়ে যে সমালোচনা হচ্ছে, সেগুলোর বিশিষ্টতা নিয়ে তিনি আলোচনা করলেন এবং প্রাচ্যের ধারণার সঙ্গে পাশ্চাত্যের ধারণার একটি তুলনামূলক আলোচনা করলেন।

www.pathagar.com

চিন্তামনিকরের বর্ণনাটি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সাবলীল ছিল। সভাপতির ভাষণে আমি চিন্তামনিকরের শিল্প প্রতিভা সম্পর্কে কিছু বললাম এবং ফর্ম সংক্রান্ত তাঁর বক্তব্যকে নতুন করে বললাম। সভা শেষে চিন্তামনিকর এবং জয়নুল আবেদীন আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন।

বিকেল ৪টায় চরুকলা বিষয়ক সভা হয়েছিল। সভায় এম.এফ.এ'র সিলেবাস চূড়ান্ত করে আমরা সবাই স্বাক্ষর করলাম এবং তা অনুমোদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটে প্রেরণ করলাম।

আজ দুপুরে ও রাত্রে আমার খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল আলী নকীর বাসায়।

২৯-৩-৭৫

সকালে দেখা করতে এল এখলাসউদ্দিন এবং সৈয়দ শফিকুল হোসেন। বেলা ১১টায় আমার বোন সাদেকার বাসায় গেলাম। ১-৩০ মিঃ মুস্তফা নুরউল ইসলামের বাসায় দুপুরের খাবার খেলাম। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় দূতাবাসের ডঃ জালাল আহমেদ এবং ডঃ সালাহউদ্দিন আহমদ।

বিকেল ৪টায় বাংলাদেশ বিমানে চট্টগ্রাম ফিরে এলাম। রাতে তুংফু রেস্তোরাঁয় শিবনারায়ণের সম্মানে নৈশভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাংলা বিভাগের সকল অধ্যাপক ছিলেন, ইংরেজি বিভাগের প্রফেসর মোহাম্মদ আলী ছিলেন এবং আবুল ফজল সাহেব ছিলেন। খেতে খেতে শিবনারায়ণ রায় বললেন যে, আমাদের দেশেও চীনা রান্না হয়ে থাকে। আমি বললাম, "খেতে সুস্বাদু হলেই হল, অবশ্য খাবারটা স্বাস্থ্যকর হতে হবে।"

৩০-৩-৭৫

আজ বাংলা বিভাগের দ্বিতীয় পর্ব এম.এ-র ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে রামগড়ে পিকনিকে গেলাম। শিবনারায়ণ রায় আমাদের সঙ্গে ছিলেন। চট্টগ্রামের রামগড় অঞ্চলটি অত্যন্ত মনোরম। সেখানকার মাটি সমতল নয়, উঁচু-নিচু। সেখানে অনেক গাছ আছে। চট্টগ্রাম থাকতে আমি প্রায়ই রামগড়ে এসেছি। বহু আগে একবার সানাউল হককে সঙ্গে নিয়ে রামগড়ে এসেছিলাম। সেটা সম্ভবত ১৯৬৫ সাল ছিল। তখন রামগড় অঞ্চলটি প্রচুর সময় নিয়ে ঘুরে ঘুরে আবিষ্কার করেছিলাম। সেখানে অনেক পাখি ছিল। ছোট বড় অনেক পাখি – হরিয়াল, ঘুঘু এবং আরও অনেক পাখি। পাখিগুলো ছিল নানা বিচিত্র রঙের। কোনটা সবুজ, কোনটা খয়েরী, কোনটা কালো, আবার কোন কোনটা মিশ্রিত রঙের। দুপুর বেলা বনভূমির নির্জনতার মধ্যে পাখি ডাকার শব্দ সেদিন খুব ভাল লেগেছিল। সেদিনের পর আরও অনেকদিন রামগড়ে এসেছি, মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের অভ্যন্তরে রামগড়েই আমার শেষ আশ্রয় ছিল। শিবনারায়ণ রামগড় ভ্রমণটি খুব উল্লেখ করলেন। ফেরার পথে আমাদের বাসটি বিকল হয়। সেটাকে সারিয়ে তুলতে বেশ সময় লাগে। এর ফলে চট্টগ্রামে পৌঁছতে রাত ১০টা হয়ে যায়। আমাদের বিলম্ব দেখে বাসায় লোকেরা অস্থির হয়ে রেজিস্ট্রার খলিল সাহেবকে খবর দেয়। ভদ্রলোক আমাদের জন্য একটি গাড়ি পাঠালেন কিন্তু এই গাড়ির প্রয়োজন হয়নি। ফেরার পথে গাড়ির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল।

www.pathagar.com

৩১-৩-৭৫

আজ সকাল ১০টায় বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা শিবনারায়ণ রায়কে সংবর্ধনা দিল। বাংলাদেশে অবস্থানকালে শিবনারায়ণ রায়কে আমরা যেভাবে সংবর্ধিত করেছি শিবনারায়ণের সেটা দীর্ঘদিন মনে থাকবার কথা। আমরা যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের মনীষীদের এবং সাহিত্যিকদের সংবর্ধনা জানিয়ে থাকি সে রকম সংবর্ধনা আমরা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে পাই না। কলকাতার মানুষ সাধারণত প্রথাগতভাবে হিসেব করে কাজ করে। বাংলাদেশের আমরা একটু বেহিসেবী। শিবনারায়ণ তাঁর বক্তৃতায় আমার সঙ্গে তার বহুদিনের পরিচয়ের কথা বললেন এবং আমার আমন্ত্রণে তিনি বাংলাদেশে আসার সুযোগ পেয়েছেন এবং এজন্য আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। তিনি আরো বললেন যে, তিনি এবং আমি একই মানুষ। পার্থক্য শুধু এখানে যে, আমি যেখানে বিশ্বাসী তিনি সেখানে নাস্তিক। তিনি তার নাস্তিক্যবাদের সমর্থনে দু-একটি কথাও বললেন। শিবনারায়ণের পর আবু হেনা মোস্তফা কামাল কিছু বলল। সবশেষে সভাপতি হিসেবে আমি আমার ভাষণ দিলাম।

দুপুরবেলা বাংলার অধ্যাপক দিলওয়ার হোসেনের বাসায় শিবনারায়ণ এবং আমি খেলাম। বিকেল ৪টায় শিবনারায়ণ রায় ঢাকার উদ্দেশে বাংলাদেশ বিমানে চট্টগ্রাম ত্যাগ করলেন।

১-৪-৭৫

আজ আমি দ্বিতীয় পর্ব এম. এ ক্লাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করলাম। 'দুর্গেশ নন্দিনী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যে গদ্যশৈলীর প্রস্তাবনা করেছিলেন 'সীতারাম' উপন্যাসে তা পূর্ণতা পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম ব্যক্তি যিনি আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রবৃত্তিগুলো যথার্থভাবে উন্মোচন করেছিলেন। তিনি ভাষার মধ্যে একই সঙ্গে আবেগ এবং যুক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। বাংলা গদ্যের গতিবিধির মধ্যে তিনিই প্রথম একটি অসাধারণ সাবলীলতা নির্মাণ করেন। তিনি ভাষাকে বর্ণনার উপযোগী করেছেন, চিন্তার উপযোগী করেছেন এবং সংলাপের উপযোগী করেছেন। তৃতীয় বর্ষ অনার্স ক্লাসে মোহিতলাল মজুমদারের 'স্বপনপসারী' কাব্যগ্রন্থটি নিয়ে আলোচনা করলাম।

দুপুরে বিভাগীয় শিক্ষকদের নিয়ে বিভাগের সম্ভাব্য গবেষণা ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করলাম।

২-৪-৭৫

আজ চট্টগ্রামে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। ঢাকা থেকে সদস্যরা এসেছেন – অধ্যাপক শামসুল হক এবং মাহবুবুল আলম চাষী এসেছেন। সচিব হিসেবে ডঃ সেলিমও উপস্থিত ছিলেন। আমরা মিটিং শেষে চট্টগ্রাম ফিসারিজ কো-অপরেটিভের অফিসে মৎস্য সমবায়-এর কাজকর্ম দেখতে গেলাম। আমরা কয়েকজন সমবায়ীর সঙ্গেও কথা বললাম। আমার ধারণা ছিল যে, সমবায়ের সদস্যরা যথার্থ মৎস্যজীবী। কিন্তু দেখা গেল যে, ব্যাপারটা তা নয়। মাছ ধরার ট্রলার এবং বড় বড়

www.pathagar.com

নৌকার মালিক যারা তারাই মৎস্যজীবী সেজে সমবায়ের সদস্য হয়েছে এবং যথার্থ মৎস্যজীবীরা বঞ্চিত হয়েছে। আমরা একজন জেলের সঙ্গে আলোচনা করলাম। সে তাদের অবস্থার যা বর্ণনা দিল তা সত্যি দুঃখজনক। যারা যথার্থ জেলে তারা তাদের প্রাণসংশয় করে সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় এবং নৌকার মালিকদের কাছে তাদের শ্রমের বিনিময়ে টাকা পায়, কিন্তু মাছের অংশ পায় না। জেলেদের অবস্থা ভাল করার জন্য সমবায় সমিতি স্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু জেলেরা সমবায়ের সদস্য হতে পারেনি। কো-অপারেটিভ থেকে ফেরার সময় সমবায় সমিতির পরিচালক ইসহাক সাহেব আমাকে একটি বড় কোরাল মাছের শুটকি উপহার দিলেন। ওখান থেকে ফিরে আমরা অনানুষ্ঠানিক কমিটির পক্ষ থেকে ভাইস চ্যান্সেলরের সাক্ষাৎকার নিলাম।

বিকেল ৫টায় ২ নং দেব পাহাড় লেনে মাহবুবুল আলম চাষীর বাড়িতে গেলাম সাক্ষাতের জন্য। সেখানে সমবায় সমিতি নিয়ে আলোচনা হল। একপর্যায়ে মাহবুবুল আলম চাষী জানালেন যে, সমবায় পদ্ধতি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশক্রমে সমবায় গঠন কমপলসরি বা আবশ্যিক করা হয়েছে। চাষী সাহেব বললেন যে, সমগ্র বিশ্বেই কো-অপারেটিভটা হচ্ছে স্বেচ্ছাভিত্তিক সমবায়। জোর করে মানুষকে সমবায়ী করা যায় না। আমি চাষী সাহেবকে বললাম, "সমবায় অনুশীলনের বুদ্ধি তো আপনি দেবেন। এ ব্যাপারে আপনি তো একমাত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তি।" চাষী সাহেব জানালেন যে, এ ব্যাপারে তার পরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি।

৩-৪-৭৫

গতকালই ঠিক হয়েছিল যে, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে আমরা এ. কে. খানের সঙ্গে আলোচনা করব। তিনি আমাদের সকাল ১০টায় তাঁর বাসায় যেতে বলেছিলেন এবং তাঁর সাথে দুপুরের খাবার দাওয়াতও দিয়েছিলেন। আমরা দীর্ঘসময় ধরে তার সঙ্গে আলোচনা করলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে খান সাহেব দেশের বিবিধ সমস্যা নিয়ে ভাবেন এবং দেশকে কিভাবে স্বাবলম্বী করা যায় সে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন। তিনি একজন বিত্তবান ব্যবসায়ী সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি ব্যবসায়ী হিসেবে নিজের অর্থাগমের কথা ভাবেন না। তিনি ভাবেন কি করে আপন ব্যবসার সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে দেশকেও সমৃদ্ধির পথে টানতে হবে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়। তিনি একজন যুগোপযোগী পুরুষ। শিক্ষায় অগ্রসর এবং বুদ্ধিতে অগ্রগণ্য।

এ. কে. খান সাহেবের বাসায় খেয়ে খুব তৃপ্তি পেলাম। তিনি একজন খাদ্য-রসিক। কয়েক ধরনের শুটকি মাছ ছিল– মাগুর মাছ ছিল, রুই মাছ ছিল, মুরগী ছিল, গরুর গোস ভুনা এবং খাসির রেজালা ছিল। সবজি ছিল অঢেল। আমরা খাবারের প্রশংসা করায় তিনি বললেন যে, তাঁর ওখানে দেশী-বিদেশী সব রকমের রান্না করার লোক আছে।

রাত ৮টায় অধ্যাপক শামসুল হক সাহেবের সম্মানে আবু ফজল সাহেব তুংফু রেস্তোরাঁয় একটি নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে আমরা যোগ দিলাম। অনানুষ্ঠানিক কমিটির সদস্যরা ছাড়া সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, ডীন এবং প্রভোস্টরা ছিলেন।

অনানুষ্ঠানিক কমিটির সকল সভা শেষ হয়েছে। এখন একটি রিপোর্ট নিয়ে সরকারের কাছে দাখিল করতে হবে। সেক্রেটারি হিসেবে ডঃ সেলিম রিপোর্টের একটি খসড়া তৈরি করবেন ঠিক হল। রিপোর্ট তৈরি হলে রিপোর্ট নিয়ে কমিটির আরেকটি বৈঠক বসবে।

www.pathagar.com

৪-৪-৭৫

আজ মাগুরা থেকে আমাদের পরিবারের অনুগত দুজন লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে গেল। গ্রামের অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করায় তারা একটি ভয়ের চিত্র তুলে ধরল। তারা বলল, গ্রামে এখন শুধু মেয়েরা এবং বয়স্ক লোকেরা আছে, যুবকরা হয় নিহত হয়েছে, আর কেউ যদি বেঁচে গিয়েছে তারা আত্মরক্ষার জন্য আত্মগোপন করেছে। তারা বলল যে, সরকারের লোকজন এই ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। সর্বপ্রকার প্রতিবাদের সম্ভাবনাকে বিলুপ্ত করার জন্য যুবকদের প্রতি পুলিশ এবং রক্ষীবাহিনীর রোষ। এ কথাগুলো আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে কি করে মানুষ ক্ষমতার দর্পে প্রতিবাদের সকল কণ্ঠস্বরকে চিরকালের জন্য রুদ্ধ করবার চেষ্টা করে।

বিকেলবেলা লাইব্রেরিয়ান শামসুল ইসলামের বাসায় গেলাম। আমি বসে থাকতেই সেখানে রেজিস্ট্রার খলিলুর রহমান এল, আবু হেনা মোস্তফা কামাল এল, কোরেশী এল, খায়রুল বাশার এল। আমরা দেশের অবস্থা আলোচনা করলাম। সকালে আমার কাছে মাগুরার দুটি লোক যে খবর দিয়েছিল, আমি তা সবার গোচরে আনলাম। সবাই নানা রকম মন্তব্য করল। সবার কথার মধ্য থেকে একটি অভিমত বেরিয়ে এল যে দেশের সামনে ভয়ানক দুর্দিন আসছে এবং দুর্দিনের সম্মুখে আমরা সবাই অসহায়। ক্ষমতার দর্প যদি প্রচণ্ড হয় তাহলে ক্ষমতাদর্পী পুরুষ অন্ধ হয়ে যায়। সে তার অন্যায়কে দেখতে পায় না। সে শুধু ভাবে দেশকে শাসন করবার একমাত্র অধিকার তারই আছে এবং যারা তার বিরুদ্ধাচরণ করবে তারা দেশদ্রোহী বলে গণ্য হবে।

সন্ধ্যায় বাসায় যখন ফিরে এলাম তখন দেখলাম আবদুল আউয়াল এসে বসে আছে। সে বলল যে, আমি যদি বাংলা এম. এ মৌখিক পরীক্ষা নিতে কুমিল্লা এবং সিলেট যাই তাহলে ভাল হয়। সেখানকার কিছু প্রতিষ্ঠান আমাকে তাদের মধ্যে পেতে চেয়েছে। সুতরাং কিছু একটা উপলক্ষ করে সেখানে গেলে ভালই হবে। আমি কেন জানি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। সম্ভবত সকাল বেলা আমার গ্রামের কথা শুনে মনটা ভারাক্রান্ত ছিল। সে জন্যই একটি কর্মব্যস্ততা আমি খুঁজছিলাম। আউয়াল খুব খুশি হল। সে বলল যে, আগামীকাল বিভাগে বসে আমার সঙ্গে আলোচনা করে কুমিল্লা এবং সিলেটে যাবার দিন তারিখ ঠিক করবে। আউয়াল চলে গেলে আমার স্ত্রী শুধু একবার বললেন, "এভাবে বাইরের কলেজে পরীক্ষা নিতে যাওয়া আমার মত লোকের কি মানায়?" আমি তার কথায় শুধু হাসলাম, উত্তর দিলাম না।

৫-৪-৭৫

আজ সকাল সাড়ে ৯টায় সিণ্ডিকেটের মিটিং। আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের পক্ষ থেকে সিণ্ডিকেটের সদস্য। অনেক দিন ধরেই আমি সদস্য রয়েছি। নতুন সিণ্ডিকেট গঠন হলে আমি হয়তো আর থাকব না। সিণ্ডিকেটে উপাচার্যের কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়ে তুমুল বিতর্ক উঠল। উপাচার্য আবুল ফজল সাহেব সিণ্ডিকেটের

www.pathagar.com

পরামর্শ না নিয়ে এবং কোনরূপ বিজ্ঞাপিত না করে এডহকভিত্তিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কয়েকজনকে নিয়োগ দিয়েছেন। এটা তিনি পারেন, কিন্তু সিণ্ডিকেট উপস্থিত থাকতে এটা করা উচিত নয় – সদস্যদের সকলেই একথা বললেন। আবুল ফজল সাহেব বারবার বলতে লাগলেন ঃ তাঁর কি কোন ক্ষমতা নেই? যে ক্ষমতা তাঁর আছে, সে ক্ষমতার প্রয়োগ তিনি কেন করবেন না? আমি আবুল ফজল সাহেবের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।

৬-৪-৭৫

আজকে আমার ক্লাস ছিল না। সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কিছু বই দেখলাম।

বিকেলবেলা গাড়ি নিয়ে পরিবারের সকলের সঙ্গে ফৌজদারহাট এলাম। বর্তমানে পতেঙ্গা সৈকতটি ভ্রমণের জন্য এখন খুব পরিচ্ছন্ন। সমুদ্রের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খুব নিবিড়। আমি সুযোগ পেলেই সমুদ্রের কাছে চলে আসি। করাচী যখন ছিলাম তখন ক্লিফটন এবং হক্‌স বে-তে প্রায়ই যেতাম। বিদেশেও সমুদ্র তীরে সময় কাটাবার সুযোগ পেয়েছি অনেক। সমুদ্রের পাশে দাঁড়িয়ে একটি বিরাট এবং মহিমময়কে দেখা যায়। অন্য কোন ক্ষেত্রে মহিমময়কে অনুভব করা আমাদের হয় না। একমাত্র সমুদ্রই আমাদেরকে সে সুযোগটি এনে দেয়।

৭-৪-৭৫

আজ অনার্স তৃতীয় পর্ব ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে গ্রীক নাটক 'ইডিপাস'এর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করলাম।

৮-৪-৭৫

আজ সন্ধ্যায় মুসলিম ইনস্টিটিউট মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যটি অভিনীত হল। প্রধান অতিথি হিসেবে আমি 'চিত্রাঙ্গদা'র বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করলাম। আলোচনা সূত্রে বললাম যে চিত্রাঙ্গদা একই সঙ্গে নাটক এবং কবিতা। প্রমথ চৌধুরী 'চিত্রাঙ্গদা'কে একটি রাগিনী বলেছেন। সুর ও ঝংকারের সমন্বয়ে এবং রসাবেশের পরিপূর্ণতা নিয়ে 'চিত্রাঙ্গদা' সত্যি একটি রাগিনী। 'চিত্রাঙ্গদা'য় প্রেমের যে ব্যঞ্জন আছে তা সময় এবং কালের সীমা অতিক্রম করে সর্বকালীন হিসেবে পরিস্ফুটিত।

৯-৪-৭৫

আজকে দুটি ক্লাস ছিল, দুটিই এম.এ দ্বিতীয় পর্বের। একটি ক্লাসে সুধীন্দ্রনাথ নিয়ে আলোচনা করলাম এবং অন্যটি রবীন্দ্রনাথ।

বিকেলবেলা এ. কে. এম. আহসান কোনরূপ পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই জীপে করে আমার বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। সরকারী কাজে চট্টগ্রামে এসেছেন এবং সেখান থেকে

www.pathagar.com

কিছুক্ষণের জন্য আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তাকে পেয়ে খুব খুশি হলাম। তার কাছে সিকান্দার, সানাউল হক এবং ঢাকার অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের খবর পেলাম। কথায় কথায় এ. কে. এম. আহসান বললেন, "সিকান্দার এখন আর পারফেকশনিস্ট নেই, সে এখন বিধ্বস্ত।" সিকান্দার যেভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল সেভাবে আর পারেনি এবং বর্তমানে দেশের প্রশাসনিক অব্যবস্থা দেখে সে খুব পীড়িত বোধ করছে।

১০-৪-৭৫

আজ বাসায় বসে এফ.আর. লিভিস এর ডি. এইচ লরেন্স এর উপর একটি সমালোচনামূলক বই পড়লাম। বইটি আগেই আমি পড়েছিলাম। দ্বিতীয়বার আবার চোখ বুলালাম। লরেন্স আমার একজন প্রিয় ঔপন্যাসিক। তাই তার সম্পর্কে কোন গ্রন্থ পেলে আমি আগ্রহের সঙ্গে পড়ি।

১১-৪-৭৫

আজ সকালে আমার গাড়ি নিয়ে আমি কুমিল্লায় গেলাম। সরাসরি কুমিল্লা কলেজে উপস্থিত হলাম। কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত কিছু লোক আমাকে সংবর্ধনা জনাল। আমি আসব শুনে তারা আগে থেকেই কলেজে জড়ো হয়েছিলেন। দুপুরবেলা কলেজে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কলেজ কর্তৃপক্ষ নানা রকম মাছের আয়োজন করেছিলেন। বড় রুই ছিল, পাবদা মাছ ছিল, মাগুর মাছ ছিল– এসব মাছই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁরা মুরগী ও খাসিরও ব্যবস্থা করেছিলেন। দুপুরে খাবার পর আমার ছাত্র এবং বর্তমানে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মোবাশ্বেরের বাসায় গেলাম। সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে বাংলা বিভাগে এলাম মৌখিক পরীক্ষা নিতে। ছাত্র-ছাত্রী বেশি ছিল, অল্পক্ষণের মধ্যে পরীক্ষা-পর্ব শেষ হল। বিকেল ৪-৩০ মিঃ বাংলা বিভাগের শিক্ষক এবং ছাত্ররা আমাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করল। এদের আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ হলাম। এরা আমাকে মানপত্র দিল, অনেকেই বক্তৃতা করলেন এবং আমিও উত্তরে কিছু বললাম।

সন্ধ্যে ৭টায় অলক্ত সাহিত্য পরিষদ নামে একটি পরিষদ আমাকে সংবর্ধনা দিল। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা উপস্থিত ছিল। এখানে আমি আন্তরিকতার স্পর্শ পেলাম। কুমিল্লায় এর আগে আমি কখনও আসিনি। মনে হল এসে ভালই করেছি। এখানকার মানুষ আগে আমাকে কখনও দেখেনি, কিন্তু আমাকে দেখার তাদের আগ্রহ ছিল। এক সময় যখন বাংলা একাডেমীতে ছিলাম তখন সানাউল হকের সঙ্গে চট্টগ্রামে যাওয়ার পথে কুমিল্লায় কিছুক্ষণের জন্য থেমেছিলাম। সে সময় স্থানীয় খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে এক থান খদ্দরের কাপড় নিয়েছিলাম। তাছাড়া চট্টগ্রামে প্রথমবার যখন আমি ছিলাম কুমিল্লা হয়ে ঢাকায় আসতে হত। কুমিল্লা একাডেমীতে দুপুরের খাবার খেতাম। পাকিস্তান আমলে কুমিল্লায় একটি আন্তর্জাতিক পরিবার পরিকল্পনা সম্মেলন হয়েছিল। সে সম্মেলনে আমি এসেছিলাম প্রধান অতিথি হয়ে। এভাবে কুমিল্লায় কয়েকবার আমার যাতায়াত ঘটেছে সত্যি, কিন্তু কুমিল্লার ছাত্র-শিক্ষক এবং আপামর জনসাধারণের সঙ্গে মেশার সুযোগ পাইনি।

www.pathagar.com

১২-৪-৭৫

আজ সকাল ৯টায় কুমিল্লা মহিলা কলেজে আমার একটি সংবর্ধনা সভা ছিল, এখানকার অনুষ্ঠানে সকলের আন্তরিকতা এবং আগ্রহ আমাকে মুগ্ধ করল। একটি ছাত্রী আমাকে সংবর্ধনা দিতে গিয়ে একটি সুন্দর কথা বলল। সে বলল, "সকলেই মনে করে মেয়েদের জন্ম হয়েছে গার্হস্থ্য কর্মের জন্য। কিন্তু জীবনের সকলের কর্মেই যে মেয়েরা আসতে পারে সে কথা কেউ স্বীকার করতে চায় না এবং আমরাও সে কথা ভাবতে ভুলে গিয়েছি। আজ আপনার সান্নিধ্যে এসে মনে হচ্ছে আপনার কর্মজীবনে আমরা সকলেই যেন আপনার সঙ্গীনি। আপনার যে পরিচয় আমি জানি তাতে আমাদের এই বিশ্বাস জেগেছে যে আপনি পুরুষ এবং রমণীর মধ্যে কোন পার্থক্য মানেন না।" অনুষ্ঠানের পর মেয়েটিকে কাছে ডেকে নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বললাম।

বিকেল ৪টায় চট্টগ্রামে ফিরে এলাম।

১৩-৪-৭৫

আজ বিকেল ৪টায়, কুণ্ডেশ্বরীতে নতুনচন্দ্র সিংহের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ ছিল। সভাপতি হিসেবে আমাকে সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে হল। মুক্তিযুদ্ধের সময় কুণ্ডেশ্বরীতে আমি আমার পরিবার পরিজনসহ আশ্রয় নিয়েছিলাম। পরে এখান থেকে রামগড় যাই এবং ১৫ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে রামগড় থেকে ভারতে আশ্রয় নেই। রামগড়ে থাকাকালীন নতুনচন্দ্র সিংহের নিহত হবার খবর পেয়েছিলাম। আমরা যখন কুণ্ডেশ্বরী ছেড়ে যাই তখন নতুনচন্দ্র সিংহকে আমাদের সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি তার মন্দির ছেড়ে কিছুতেই রাজি হননি। ন্যায়পরায়ণতা কর্তব্য কর্মে নিষ্ঠা এবং আদর্শবাদিতায় তিনি একজন অনন্যসাধারণ পুরুষ ছিলেন। আমি যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম চাকরি নিয়ে আসি তখন তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি আমাকে সংবর্ধনা জানিয়ে ছিলেন।

রাত ১০ টায় ট্রেনে সিলেট রওয়ানা দিলাম।

১৪-৪-৭৫

আজ সকাল ১০টায় এবং বিকেল ৪টায় মৌখিক পরীক্ষার সময় নির্দিষ্ট ছিল। দুপুরে অধ্যক্ষের গৃহে গেলাম। পরীক্ষা শেষে বিকেলে সন্ধ্যার একটু আগে শাহজালালের মাজারে গেলাম। এখানে আমি আগেও এসেছি। মাজারে আমি আসি আল্লাহকে ডাকার উপলক্ষ করে। মাজারে যিনি শায়িত আছেন সেই সাধকের কাছে আমার কোন প্রার্থনা নেই। তা ছাড়া আরেকটি কথা আছে। মাজারে এলে পৃথিবীর অনস্তিত্ব সম্পর্কে বোধ জাগে। মানুষ হিসেবে আমি যে কত অসহায় এবং পার্থিব সম্পদ যে আমাকে ধরে রাখতে পারবে না – এই সত্যটা আমি জানি। কিন্তু প্রতিদিন কর্মব্যস্ততার মধ্যে এ সম্পর্কে ভাবতে পারি না। তাই সমাধিস্থলে এলে নিজেকে সত্যই আল্লাহর কাছে নিবেদন করতে ইচ্ছে হয়। মাজারের নিকটে মিঃ আবদুল্লাহর বাড়ি। তিনি পুরুষানুক্রমে

www.pathagar.com

মাজারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। এখন তিনি জীবিত নেই। এক সময় দেশ বিভাগের পূর্বে কলকাতায় থাকতে তাঁকে চিনতাম। বাড়িতে কে আছে খোঁজ করতে গেলাম। কিন্তু পুরুষ মানুষ কাউকে পেলাম না। স্থানীয় লোকেরা এ বাড়িকে 'ছরকুম সাহেব'-এর বাড়ি বলে জানে। 'সরে কউম' শব্দটি উচ্চারণ বিভ্রাটে স্থানীয় লোকের মুখে 'ছরকুমে' পরিণত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে জাতির শিরোমণি। শাহজালালের সঙ্গে অনুচর হিসেবে যারা এখানে এসেছিলেন তাঁদের বংশধরগণ স্থানীয় জনগণের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। মরহুম আবদুল্লাহ এক সময় বাংলা সাহিত্য চর্চা করতেন। তার লেখা প্রবন্ধ মাসিক 'মোহাম্মদী'তে প্রায়ই ছাপা হত।

১৫-৪-৭৫

আজ সকালে সিলেট মুসলিম সাহিত্য সংসদের অফিসে গেলাম। আগে থেকেই কথা ছিল যে, আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এবং সাহিত্যসেবীরা এখানে আসবেন। এই সাহিত্য সংসদটি দীর্ঘকাল বাংলাদেশের একটি প্রাচীন গ্রন্থাগার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারীভাবে গ্রন্থাগারটি সাহায্য পেয়ে থাকে। স্থানীয় জনগণও সাহায্য দিয়ে থাকেন। বিশেষ করে এতদঞ্চলের জমিদার আমিনুর রশীদ চৌধুরী সাহিত্য সংসদটিকে নানাভাবে সাহায্য করে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। বাংলা একাডেমীতে যখন আমি ছিলাম সে সময় আমি সিলেটে এসেছিলাম এবং আমিনুর রশীদ চৌধুরীর আতিথ্য দু'বার গ্রহণ করেছিলাম। দুপুরে স্থানীয় একটি হিন্দু হোটেলের মালিক কলেজের অধ্যক্ষ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ আমাকে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে খেতে ডেকেছিলেন। এখানকার আপ্যায়নের কথা আমার দীর্ঘদিন মনে থাকবে। বিরাট রুই মাছের পেটি ছিল। একেকটি পেটি ১৮ ইঞ্চির মত লম্বা এবং আড়াই ইঞ্চির মত চওড়া, সরষে বাটা দিয়ে রাঁধা হয়েছিল। রান্নাটি সুস্বাদু হয়েছিল। এরপর ছিল চিতল মাছ। চিতল মাছের পেটিগুলো ছিল আরও বড়। রুই মাছ ভাজা ছিল, আমি হোটেলের মালিক হিন্দু ভদ্রলোকের রুচির খুব প্রশংসা করলাম এবং সুস্বাদু খাবারের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম।

বিকেলে বাংলাদেশ বিমানে ঢাকায় এলাম। রাত্রে রফিকের বাসায় খেলাম।

১৬-৪-৭৫

নন ফরমাল এডুকেশন কমিটির চূড়ান্ত সভা আজ বিকেল ৪টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর-এর একটি সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হল।

১৭-৪-৭৫

চট্টগ্রাম যাব বলে বাংলাদেশ বিমানে উঠলাম বটে। কিন্তু কিছুক্ষণ ওড়ার পর কি একটা যান্ত্রিক অসুবিধা দেখা দেয়ায় কুমিল্লা বিমানবন্দরে অবতরণ করতে বাধ্য হল। বিমান যখন আর উড়তে পারবে না জানান হল তখন আমি উপায়হীন অবস্থায় চট্টগ্রামগামী কোচে করে চট্টগ্রাম এলাম। চট্টগ্রামের বাসায় এসেই জানতে পারলাম ১৯

www.pathagar.com

তারিখ শনিবার আমাকে দিল্লী যেতে হবে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগটি একটি সেমিনারের আয়োজন করেছে। সেই সেমিনারে বাংলাদেশ থেকে আমি এবং ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম যাচ্ছি। ভারতীয় দূতাবাসের চট্টগ্রামের যে শাখা অফিস আছে সেখানকার একজন লোক চিঠি দিয়ে গেছে যে, ঢাকায় পৌঁছেই আমি যেন ডঃ জালালের কাছ থেকে বিমানের টিকেট এবং ভিসা নিয়ে নেই।

১৮-৪-৭৫

ঢাকা পৌঁছে রফিকের বাসায় উঠলাম। সেখান থেকে ডঃ জালালের সঙ্গে যোগাযোগ করে যাত্রার কাগজপত্র সব পেলাম।

১৯-৪-৭৫

আজ বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সে ঢাকা থেকে দিল্লী এলাম। এয়ারপোর্টে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে এবং মিসেস নীলিমা ইব্রাহীমকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউজে নিয়ে এলেন। এখানে আমরা থাকব। আগেও আমি এ গেস্ট হাউজে ছিলাম। গেস্ট হাউজের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে যে শীর্ণকায়া পার্সি মহিলাকে আগের বার পেয়েছিলাম, এবারও তাকে দেখলাম। তিনি আমাদের সঙ্গে বসে আমাদের জন্য খাবারের মেন্যু ঠিক করলেন।

২০-৪-৭৫

আজ সকাল ৯টা ৩০ মিঃ টেগোর হলে বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে সেমিনারের উদ্বোধন করলেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। সভাপতিত্ব করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। প্রধান বক্তা ছিলাম আমি। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। আমি আমার বক্তৃতায় বাংলা সাহিত্যের ধারাক্রমে যে বৈচিত্র্য আছে তা নিয়ে আলোচনা করলাম। আমি বিশেষভাবে বললাম যে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র সত্তা এ অঞ্চলে গড়ে উঠবে এটা অবধারিত। আমাদের ভূ-প্রকৃতি এবং নদীমাতৃকতা পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভিন্ন। আমাদের বিশ্বাস এবং চিন্তার উপকরণগুলো পশ্চিবঙ্গের সঙ্গে সমার্থক নয়। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ এবং প্রধানত কলকাতার মানুষদের সমস্যা ও আমাদের সমস্যা এক নয়। সুতরাং আমাদের অঞ্চলের যে সাহিত্য সৃষ্টি হবে তা সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে। আলোচনা শেষে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। আমরা পূর্ব থেকে উভয়ে উভয়কে জানতাম। আমাদের একে অন্যের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ আছে। ডঃ রায় দীর্ঘকায় এবং পরিচ্ছন্ন চরিত্রের মানুষ। তাঁর বাকভঙ্গি অত্যন্ত সুমার্জিত এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

বিকেল ২-৩০ মিঃ দ্বিতীয়বারের মত সভা বসল। এবারের সভায় আমি হলাম সভাপতি এবং প্রধান বক্তা হলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সুভাষ তার বক্তৃতায় আধুনিক বাংলা কবিতার ভাষা নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন যে, কবিতার ভাষা আনতে হবে মানুষের যথার্থ কর্মের প্রহর থেকে। কর্মী মানুষের শ্রেণীসত্তা থেকে যে

www.pathagar.com

শব্দগুলো জেগে উঠবে সেই শব্দই ভাষার নিয়ামক হবে। যারা কৃষক এবং মজুর বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে তাদের সংখ্যাই তো সবচেয়ে বেশি। তারা কবিতা লেখে না কিন্তু তাদের ভাষায় তাদের নিয়েই তো কবিতা লিখতে হবে।

রাত্রে নীলিমা ইব্রাহীম তার এক আত্মীয়ার বাসায় নিয়ে গেলেন। সেখানেই রাতের খাবার খেলাম। এ বাড়ির দম্পতির কোন ছেলেমেয়ে নেই। সন্তানের অভাব পূরণের জন্য দুটি কুকুর পোষেণ এবং কুকুর দুটিকে লেপ-তোষকের মধ্যে শোয়ান এবং সন্তানের মত আদর করেন। কুকুর দেখলাম তাদের কথাবার্তা এবং ইশারা বেশ বোঝে।

২১-৪-৭৫

আজ সকালে বাংলাদেশের ভাষা নিয়ে আলোচনা ছিল। নীলিমা ইব্রাহীম এই বিষয়ে তার মন্তব্য রাখেন, আমিও কিছু বললাম। আমরা উভয়ই বললাম যে বাংলাদেশের বাংলা ভাষা নতুন একটি ভাষা হিসেবে গড়ে উঠছে না। তার প্রকৃতিতে পরিবর্তন আসছে এবং তার অর্থ-ব্যক্ততায় পরিবর্তন আসছে। বাংলাদেশের মানুষের বিশ্বাস, আচরণ এবং স্পৃহাকে অবলম্বন করেই এ অঞ্চলের মানুষের ভাষার অর্থবোধ গড়ে উঠবে, যেমন গড়ে উঠেছে আমরিকার ইংরেজি ভাষায়। আমেরিকার ইংরেজি কিন্তু অবিকল ইংল্যাণ্ডের ইংরেজি নয়। আমাদের বলার পর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক কিছু মন্তব্য করলেন। মূলত তিনি আমাদের বক্তব্যে কিছুটা সংশয় প্রকাশ করলেন। বিকেলবেলা সেমিনারের শেষ অধিবেশনে আমার আবার বক্তৃতা ছিল। এবারের আলোচনা ছিল বাংলাদেশের কবিতার গতি-প্রকৃতি নিয়ে। এ আলোচনায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় অংশ নিলেন। দেখলাম যে তিনি বাংলাদেশের কবিতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। তিনি ফররুখের কবিতা এবং আমার কবিতা নিয়ে বেশ কিছুটা সময় বললেন। ফররুখের প্রতি তাঁর একটি মতত্ববোধ আমি লক্ষ্য করলাম।

২২-৪-৭৫

আজকে আমরা পুরনো ও নতুন দিল্লীর বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখলাম। আমি দিল্লীর জামে মসজিদে গেলাম এবং মসজিদের নিচের চত্বরের একটি দোকান থেকে পাঞ্জাবি এবং কিস্তি টুপি কিনলাম। দিল্লীতে বস্তিবাসী লোকদের অধিকাংশই মুসলমান। তাদের দুর্দশা দেখে আমার খারাপ লাগল। আমার কেন জানি মনে হল যে ভারতের মানুষের শক্তিশালী মূলস্রোতে মুসলমানকে প্রবাহমান করবার কোন চেষ্টা সরকারের নেই। এসব বস্তিবাসী মুসলমানরা সংকীর্ণ পরিবেশে কুসংস্কারের বেড়াজালে আচ্ছন্ন থাকে এবং ভারতীয় জীবনের সমৃদ্ধিকে কখনই চোখে দেখে না। আমাদের সঙ্গে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার ছিলেন। তিনি আমাদেরকে মাওলানা আজাদের সমাধি ক্ষেত্রে নিয়ে গেলেন। আমরা রাজঘাতে গান্ধীর সমাধি মন্দিরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করলাম।

শেষ দিন যতটা সম্ভব দিল্লী ঘুরে দেখলাম। হযরত নিজামুদ্দিনের মাজারে গেলাম। মাজারে হট্টগোল এবং অপরিচ্ছন্নতা আমার ভাল লাগল না। এ মাজার প্রাঙ্গণে দুজন বাংলাদেশীকে দেখলাম। তারা আজমীর শরীফে যাবার জন্য দিল্লীতে অবস্থান করছেন।

www.pathagar.com

২৩-৪-৭৫

আজ ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে দিল্লী থেকে কলকাতায় এলাম। এয়ারপোর্টে আকস্মিকভাবে জাস্টিস মাসুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি বোম্বাই অথবা মাদ্রাজ কোথায় যাবেন বলে বিমানবন্দরে এসেছেন। তিনি ব্যস্ত থাকায় কথা হল না বেশি। আমরা একে অন্যকে সম্ভাষণ করে নিজ নিজ পথে চলে গেলাম। বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে একটি গাড়ি এসেছিল। সেই গাড়িতে চড়ে রামকৃষ্ণ মিশন-গোলপার্কে এলাম। এখানে আমি থাকব। মিশনে উঠেই সুশীল ভদ্রকে টেলিফোন করলাম। তিনি অল্পক্ষণের মধ্যে এসে গেলেন। আমরা অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললাম। পরে পার্ক স্ট্রীটে কে ওয়ালিটি রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার খেলাম।

২৪-৪-৭৫

বেলা ১১টার দিকে ডক্টর বরুণ দে এলেন। তাঁর সঙ্গে বালিগঞ্জে কয়েকটি দোকানে গেলাম। প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র কিনলাম। ফেরার পথে একটি চায়ের দোকানে আমরা কিছুক্ষণ বসলাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন আমরা কলকাতায় ছিলাম তখন ডক্টর বরুণ দে আমাদের সাহায্যের জন্য নানা রকম পরিকল্পনা করেছিলেন। কার্যত কোন পরিকল্পনা সফলকাম হয়নি, যদিও ডক্টর দে-র আন্তরিক চেষ্টার কোন কমতি ছিল না। সমাজতত্ত্ববিদ এবং ইতিহাসবেত্তা হিসেবে আধুনিক ভারতে ডক্টর বরুণ দে-র সুনাম আছে। ভারতীয় হিন্দুদের ইতিহাস চর্চায় যে সাম্প্রদায়িক ধারাটা বিদ্যমান, বরুণ দে সেই ধারার মধ্যে নেই। তিনি একটি অসাম্প্রদায়িক বস্তুবাদী ধারার প্রবর্তকদের একজন। বিকেল পাঁচটায় সুশীল ভদ্র এলেন। তাকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ধারে হাঁটতে গেলাম। সুশীল ভদ্রের বন্ধুত্ব আমি খুব সম্মানের চোখে দেখি। তার মমতা এবং আন্তরিকতার মধ্যে কোন খাদ নেই। একাত্তর সালে কলকাতা অবস্থানকালে আমার ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার জন্য সুশীলের উপর নির্ভর করতাম সবচেয়ে বেশি। কলকাতায় সুশীলের বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন শিবনারায়ণ রায়, অম্লান দত্ত ও গৌরকিশোর ঘোষ।

রাত ৮টায় মিশনে ফিরে দেখি যে ডক্টর ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। ভক্তিপ্রসাদ নৃতত্ত্ববিদ হিসেবে বেশ খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর কয়েকটি বই আছে। তার একটি হচ্ছে সন্ত্রাসবাদীদের সন্ত্রাস সংক্রান্ত ভাষার একটি অভিধান। যারা সন্ত্রাসী তারা তাদের সন্ত্রাসের কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে কিছুটা হেঁয়ালি এবং রূপকের ভাষায় কথা বলে। এসব শব্দের একটি সংকলনে ডঃ ভক্তিপ্রসাদ অনেক পরিশ্রম করেছেন। শব্দগুলোর অর্থ এবং ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন। ভদ্রলোক নৃতত্ত্ব বিষয়ে পূর্ব জার্মানির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন।

২৫-৪-৭৫

আজকে আমার কোন কাজ ছিল না। সারা দিন বিশ্রামে কাটালাম। বিকেলের দিকে মিশনের সভাকক্ষে একটি ধর্মবিষয়ক আলোচনা সভা ছিল সেখানে গিয়ে বসলাম। আলোচনা সভাটি ছিল রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে। যারা বক্তৃতা করলেন তাঁরা সবাই খুবই ভক্তি আপ্লুত কণ্ঠে তাঁদের বক্তব্য পেশ করলেন। শ্রোতারাও ছিলেন ভক্ত। সুতরাং জমেছিল ভাল।

www.pathagar.com

২৬-৪-৭৫

আজ সকাল ১০টায় কবি জগদীশ ভট্টাচার্য এলেন। ভদ্রলোক অত্যন্ত বিনয়ী এবং নিরহঙ্কার। তিনি অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি কবিতার সঙ্গে মানুষের অন্তরাত্মার যে একটি যোগসূত্র আছে সে কথা বললেন। তিনি বলছেন যে কবিতা একই সঙ্গে আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আবার যুক্তির দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। আবেগ এবং যুক্তির সমন্বয় না ঘটলে কবিতা যথার্থ রূপলাভ করে না। তিনি আরও বললেন যে, তিনি মনে করেন কবিতার প্রচুর উপকরণ হিন্দু পুরাণ এবং সংস্কৃত সাহিত্যে রয়েছে। বাংলা কাব্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এ সত্যটি স্পষ্ট হয়। জগদীশ বাবু ঘন্টাখানেক আমার সঙ্গে থাকলেন।

এগারোটার সময় জাস্টিস মাসুদ এলেন। এই ভদ্রলোকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অশেষ। মুক্তিদ্ধের সময় তিনি আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন। আমাদের বাসস্থান, খাদ্য সমস্যা তিনি সমাধানের জন্য চেষ্টা করেছেন। তিনি শুধুমাত্র যে একজন আইনজ্ঞ বিচারপতি ছিলেন তাই নয়, সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ে তার আগ্রহ রয়েছে প্রচুর। তিনি রবীন্দ্রনাথের একজন ভক্ত এবং রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কোন আলোচনা হলে সেখানে তিনি যোগ্যতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন।

বিকেল ৩-৩০ মিনিটে সুশীল ভদ্রের সঙ্গে 'আনন্দবাজার' পত্রিকা অফিসে গেলাম। সেখানে সাগরময় ঘোষ আমাকে স্বাগত জানালেন। সেখানে গৌরকিশোর ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজন লেখকের সঙ্গে দেখা হল। সন্ধ্যে ৬টায় সুশীল ভদ্রের সঙ্গে রঙ্গন থিয়েটারে ব্রেখটের 'ভাল মানুষ' নাটকের অভিনয় দেখলাম।

২৭-৪-৭৫

আজ বেলা এগারোটায় পার্ল রোডে আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে দেখা করলাম। আমাদের আলোচনার সময় গৌরী আইয়ুবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের অবস্থা জানতে চাইলেন। তিনি শুনেছেন যে, বাংলাদেশে নানা রকম অশান্তি রয়েছে। এসব শুনে তিনি খুব চিন্তিত। আমি বললাম যে, আমাদের দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যতদিন না আসবে ততদিন অশান্তি থাকবেই। আমি আইয়ুব সাহেবের ওখানে বেশিক্ষণ বসিনি। চিকিৎসকের নির্দেশে তিনি একনাগাড়ে বেশিক্ষণ কথা বলেন না। আইয়ুব সাহেবকে খুব শীর্ণ এবং ক্লান্ত মনে হচ্ছিল।

রাত্রে ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের সঙ্গে পার্ক স্ট্রীটে ওয়ালডর্ফ রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার খেলাম। রেস্তোরাঁটি বেশ ভাল এবং পরিচ্ছন্ন।

২৮-৪-৭৫

আজ বিকেল সাড়ে ৩টায় সংস্কৃত কলেজে শিক্ষক এবং ছাত্রদের সমাবেশে একটি বক্তৃতা করলাম। আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল বাংলাদেশের ভাষা ও সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি। বক্তৃতা শেষে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ আমার খুব প্রশংসা করলেন। তিনি বললেন যে, তিনি আমার বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়েছেন, বিশেষ করে এ কারণে যে, দীর্ঘ এক

www.pathagar.com

ঘন্টার বক্তৃতায় তিনি ব্যাকরণের অসঙ্গতি পাননি এবং একটিও বিদেশী শব্দের প্রয়োগ পাননি। আলোচনা সভায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও কয়েকজন অধ্যাপক ছিলেন। সুশীল ভদ্রও অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। সভাশেষে সুশীল ভদ্র চৌরঙ্গির কফি হাউজে আমাকে নিয়ে গেলেন। সেখানে গৌরকিশোরও উপস্থিত ছিলেন।

২৯-৪-৭৫

আজ ঢাকায় ফিরলাম। ঢাকায় টিএসসিতে অবস্থান করছি। আমার আসার খবর পেয়ে কয়েকজন দেখা করতে এল। তাদের মধ্যে ছিল হালিমা খাতুন, আবু জাফর, ফজলে রাব্বি এবং ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটের কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী। ঢাকায় আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করলাম। আমার শ্যালক বাবলু দেশের অবস্থার কথা আলোচনা করতে গিয়ে হতাশার ভঙ্গি করল। সে বলল যে, এ দেশে যারা প্রশাসনের দায়িত্বে আছে একটি স্বাধীন দেশের প্রশাসন সম্পর্কে তাদের কোন বোধ নেই, অহঙ্কার এবং আত্মগরিমার সঙ্গে তারা দেশ শাসন করতে চায়। কিন্তু সেভাবে কি দেশ শাসন করা চলে? একটি স্বাধীন দেশের আন্তর্জাতিক একটা প্রেক্ষাপট থাকে। সেই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে দেশকে গড়ে তুলতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে একটি রাজনৈতিক দলের প্রতাপ এবং উত্তেজনা দিয়ে দেশ শাসন করা হচ্ছে। এটা একটি সর্বনাশের খেলা।

বিকেলে এম. আই. চৌধুরী দেখা করতে এলেন। তার সঙ্গে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। ভাইস চ্যান্সেলর একজন স্কুল মাস্টারের অভিজ্ঞতা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছেন সে কথা তিনি বলছেন। আমি এম. আই. চৌধুরীকে বললাম, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে এখনও ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন দেননি। তাঁরা অনুসন্ধান করে দেখছেন আমার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পাওনা আছে কিনা। থাকলে তা কেটে তারপর বেতন দেবেন। চৌধুরী সাহেব এ কথা শুনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি বললেন "এটা তো ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করবার চেষ্টা।"

৩০-৪-৭৫

আজ সকালে বিমানে চট্টগ্রামে ফিরলাম। বাসায় এসে দেখি পড়ার চশমাটি একটি চামড়ার মোড়কসহ এয়ারপোর্টে রেখে এসেছি। পরে ড্রাইভার পাঠিয়ে চশমাটি আনিয়ে নিলাম। আজ সন্ধ্যায় আমার মেয়ে নাজ্জুর ওখানে খেলাম। সে তার মামা শ্বশুর সামসুল আলমকে সস্ত্রীক ডেকেছিল। সামসুল আলম সাহেব খুব খোলামেলা লোক। যা মনে আসে বলে বসেন কোনরূপ সংকোচ করেন না। তিনি ব্রিটিশ কাউন্সিলের লাইব্রেরি সংক্রান্ত একটি সেমিনারে ঢাকায় গিয়েছিলেন বললেন। সেখানে সিকান্দারের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বললেন। সিকান্দারের স্ত্রী এশিয়া ফাউন্ডেশনের গ্রন্থাগারিক হিসেবে কাজ করছেন। তার কাছে তিনি শুনলেন, সিকান্দার নাকি অসুস্থ। মাঝখানে একবার হাসপাতালেও ছিল। দীর্ঘকাল ধরে সিকান্দারের জীবনে কোন স্বস্তি নেই, প্রায়ই অসুস্থ থাকে। সে পারিবারিক জীবনে অশান্তি ডেকে এনেছে। সিকান্দারের আরেকটি অসুবিধা হচ্ছে সে ঢাকায় বন্ধু-বান্ধবহীন হয়ে পড়েছে। আমরা যারা প্রতিমাসেই কয়েকবার এক

www.pathagar.com

সঙ্গে মিলিত হতাম সে ব্যবস্থাটি আর নেই। আমাদের আড্ডাটি পুরোপুরি ভেঙ্গে গেছে। তাছাড়া সিকান্দার ভেবেছিল বঙ্গবন্ধু তার কাছ থেকে উপদেশ নেবেন এবং সে অনুসারে কাজ করবেন। কিন্তু সেটি হয়নি। আমার জীবনে সিকান্দারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমাদের তৎপরতা দুই ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হলেও বন্ধুত্বের বন্ধন অটুট ছিল এবং এখনও আছে। দুর্ভাগ্য এই যে, সিকান্দার কখনই স্থির হয়ে সুস্থ বিবেচনায় তার জীবনকে গড়ে তুলতে পারেনি। সে বিভিন্ন ক্ষেত্রকে স্পর্শ করতে চাইত। সাহিত্য, ব্যবসা এবং রাজনীতি এই তিনটি ক্ষেত্রে সে একই সঙ্গে বিচরণ করতে চেয়েছে। একেকটি ক্ষেত্রের দাবি একেক রকম। সাহিত্যের দাবির সঙ্গে রাজনীতির দাবি মিলবে না। সিকান্দার এটা কখনও বুঝল না। তবুও সিকান্দারের প্রতি আমার মমতা আছে এবং চিরকাল থাকবে। আমি এখনও আশা করি যে, সিকান্দার হয়ত আবার বলিষ্ঠভাবে তার কর্মতৎপরতায় এগিয়ে আসবে। কিন্তু সে যে স্বাস্থ্যগতভাবে ক্রমশ বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে তা আমি জানতাম না।

১-৫-৭৫

আজ মে দিবস। পৃথিবীর সকল দেশেই আজকের দিনে এ দিবসটি পালিত হয়ে থাকে। শ্রমজীবী মানুষের আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার দিবস হিসেবে এ দিবসটি পালিত হয়। মূলত এ দিবসটি পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। আমরা আমাদের মতো দেশে এ দিবসটি প্রথাগতভাবে পালন করে আসছি। স্লোগান মুখরিত পদযাত্রা এবং বিভিন্ন সভার আয়োজন, এভাবেই আমরা মে দিবস পালন করে থাকি। কিন্তু কখনই আমরা শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই না। আমাদের মহান নবী বলেছেন ঃ কর্মক্লান্ত শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই তার পারিশ্রমিক শোধ করে দিতে হবে। আমি কখনই দেখলাম না যে, মে দিবসে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য রাসূলে খোদার (স) নির্দেশাবলী আলোচিত হয়। ইসলামকে আমরা শ্রদ্ধা করি রুদ্ধদ্বার আর কক্ষের বাইরে বসে। কিন্তু দ্বার উন্মোচন করে ভিতরে প্রবেশ করি না।

রেডিওতে মে দিবসের ভাষণ দিলেন বঙ্গবন্ধু। কে বা কারা তাঁর এ ভাষণটি লিখে দিয়েছিল জানি না। রচনাটি ছিল অত্যন্ত দুর্বল এবং শিথিল। একবারও সেখানে ইসলামের আদর্শ উচ্চারিত হয়নি। আমরা প্রথার শিকার হয়ে অনেক কাজ করি। কিন্তু একেকটি ঘটনার মূল সত্যে কখনও পৌঁছাতে পারি না। আমাদের দেশে ভূমিহীন কৃষক আছে, নৌকোবিহীন জেলে আছে। এদের জীবনের গতি পরিবর্তনের জন্য আমাদের কখনও কোন চেষ্টা নেই। ক্রমশ এদের সংখ্যা বাড়ছে এবং এ অবস্থার পরিবর্তনের কোন চেষ্টা কোথাও দেখি না।

২-৫-৭৫

বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সমস্যা নিয়ে আবুল ফজল সাহেবের সঙ্গে তাঁর অফিস কক্ষে দেখা করলাম। কিন্তু দেখলাম যে কোন সমস্যাই যথাযথভাবে তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। তিনি শুধু জানেন যে, ক্ষমতায় আসার ফলে তিনি কিছু অধিকার পেয়েছেন এবং

www.pathagar.com

অধিকারের নির্বিচার প্রয়োগ তিনি করে থাকেন। সিণ্ডিকেটের অনুমোদন ছাড়া কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদকে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়েছেন একটি উৎসবের আয়োজন করবার জন্য। এটা তিনি দিন আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু এটা দেয়া কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা তো সিণ্ডিকেট বিচার করবে। কিন্তু আমি প্রায়ই লক্ষ্য করেছি তিনি সিণ্ডিকেটকে পাশ কাটিয়ে যান। তার বক্তব্য হল সিণ্ডিকেটকে এক সময় জানালেই তো হবে। রিপোর্ট করা বলে একটি পদ্ধতি আমাদের দেশের সিণ্ডিকেটে চালু আছে। আবুল ফজল সাহেব এটাকেই যথেষ্ট মনে করেন। তিনি বলেন যে, সিণ্ডিকেটকে জানানর অর্থই অনুমোদিত হওয়া। কিন্তু সত্যই যে তা নয়, তা আমি বহু চেষ্টা করেও তাকে বোঝাতে পারলাম না। যখন কোন কিছু বোঝান আরম্ভ করি তিনি চুপ করে থাকেন, কিন্তু তার মুখভঙ্গি দেখে বোঝা যায় তিনি আমার কথা মেনে নিচ্ছেন না।

বিকেলে প্রধান শিক্ষাবিদ আবদুর রহমান সাহেবের বাসায় গেলাম, সেখান থেকে ফৌজদারহাটের সমুদ্রের তীরে। আমার মন বিক্ষিপ্ত থাকলে আমি সুযোগ পেলে সমুদ্রের কাছে যাই। ভিক্টর হুগো সম্পর্কে শোনা যায় যে, তিনি সমুদ্র তীরে এসে নুড়ি কুড়োতেন এবং তা এক এক করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতেন। কেউ একজন তাকে জিজ্ঞেস করছিল, 'আপনি এভাবে সমুদ্রে নুড়ি নিক্ষেপ করেন কেন?' তিনি নাকি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি এভাবে আমার আত্মশ্লাঘাকে বিসর্জন দিচ্ছি।' সমুদ্র তীরে এলে মানুষ নিজের অসহায়তা সম্পর্কে অনুভব করতে শেখে। সমুদ্রের উন্মুক্ত এবং প্রবল স্রোতধারার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে মানুষ যথার্থই অনুভব করে যে, এই পৃথিবীর বিরাট পটভূমিতে সে একটি অসহায় অস্তিত্বে দায়বদ্ধ।

৩-৫-৭৫

খবর পেলাম এ. কে. এম. আহসান চট্টগ্রামে এসেছেন এবং সার্কিট হাউজে অবস্থান করছেন। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। সেখানে অনেকক্ষণ তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা হল। ওখান থেকে ঘাট ফরহাদ বেগ এলাকায় চিত্তবাবুর বাসায় এলাম। চিত্তবাবুর পুরো নাম চিত্ত প্রসাদ তালুকদার। ভদ্রলোক কমার্স কলেজের বাংলার শিক্ষক। আমি যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম চাকরি নিয়ে আসি তখন তিনি নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। শহরে একটি বাসা ঠিক করে দিয়েছিলেন এবং বাসার জন্য তৈজষপত্র কিনতে সাহায্য করেছিলেন। পারিবারিকভাবেও তার সঙ্গে আমাদের একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁর স্ত্রী প্রায়ই আমাদের বাসায় আসতেন এবং আমার স্ত্রীকে সঙ্গ দিতেন। আর একটি কারণে চিত্তবাবুর প্রতি আমার আকর্ষণ গড়ে ওঠে তা হল তিনি পৌত্তলিক নন। তিনি কোনরূপ মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন যে, তিনি এক বৃক্ষের উপাসনা করেন। সেই অর্থে তিনি একেশ্বরবাদী। আমাকে পেয়ে তিনি খুব খুশি হলেন এবং বাড়িতে তৈরি মোগলাই পরোটা খাওয়ালেন। কথাবার্তায় এবং আপ্যায়নে চিত্তবাবুর মধ্যে আমি একটি যথার্থ আন্তরিকতা লক্ষ্য করেছি। যেহেতু তিনি বাংলা শিক্ষক সেহেতু তিনি আমাকে তাঁর শিক্ষকের মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

www.pathagar.com

৪-৫-৭৫

আজ আমার ক্লাস ছিল না। সকালে বাসায় বসে অনার্স এবং এম. এ. পরীক্ষার খাতা দেখলাম। নিম্নবেতনভুক কর্মচারীদের পক্ষ থেকে কয়েকজন এলেন এবং জানালেন যে, তাদের একটা অনুষ্ঠান হতে চলেছে ছয় তারিখে। আমি যদি সেখানে প্রধান অতিথি হই তাহলে তারা খুশি হবেন। আমি রাজি হলাম।

বিকেলে চট্টগ্রাম কলেজের কয়েকজন ছাত্র দেখা করতে এল। তারা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বেড়াতে এসেছেন এবং সেই সুযোগে আমার সঙ্গে দেখা করতেও এসেছেন। আমি তাদের সঙ্গে কলেজের পাঠ ব্যবস্থা নিয়ে কথাবার্তা বললাম। ছাত্ররা চলে গেলে সস্ত্রীক অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী এলেন। মোহাম্মদ আলীর স্ত্রী আমার ছাত্রী ছিলেন এবং বর্তমানে বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা করছেন।

৫-৫-৭৫

আজ আহমদ পাবলিশিং হাউজের মহিউদ্দিন সাহেবের একটি চিঠি পেলাম। তিনি বাংলা বিভাগ কর্তৃক নির্বাচিত সংকলন গ্রন্থের প্রকাশনার বিষয়ে আগ্রহী সে কথা জানিয়েছেন। চিঠিতে একটি ব্যক্তিগত অনুরোধও আছে। তিনি জানতে চেয়েছেন যে, আমি ভবিষ্যতে কোনদিন ঢাকায় যাওয়ার পথে কুমিল্লায় তার দেশের বাড়িতে একদিনের জন্য অবস্থান করতে পারি কিনা। সময় মত তাকে খবর দিলে তিনি কুমিল্লায় আসবেন এবং তারপর আমরা এক সঙ্গে ঢাকায় যাব। আমি গাড়ি নিয়ে গেলে সব সময় কুমিল্লা একাডেমীতে থামি। একবার না হয় মহিউদ্দিন সাহেবের ওখানেই থামলাম।

৬-৫-৭৫

নিম্নবেতনভুক কর্মচারীদের সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নিলাম। আমি যেখানেই গিয়েছি সেখানকার নিম্নবেতনভুক্ত কর্মচারীরা আমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আমি আমার স্বভাব অনুসারে সাধ্যমত এদের খোঁজ-খবর নিয়েছি এবং চেষ্টা করেছি এদের উন্নতি ঘটাবার। প্রায়ই পারিনি হয়ত, আমার সদিচ্ছার কারণে এরা আমার অনুগত হয়েছে, কিন্তু বর্তমানে কিছুটা অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। দেশের রাজনৈতিক দলগুলো এদের মধ্যে তাদের চিন্তাধারা প্রবেশ করাবার চেষ্টা করছেন। একেক রাজনৈতিক দল এদের সমস্যা সমাধানের জন্য একেক রকম আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে। আমি আমার বক্তৃতায় নিম্নবেতনভুক কর্মচারীদের উন্নতি হওয়া দরকার সে কথা বললাম এবং বিশেষ জোর দিয়ে বললাম, তারা যেন তাদের সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে রাজনীতিবিদদের কাছে না যায়। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের একটি অংশ। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ই তার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় এদের কল্যাণের কথা ভাববে। কর্মচারীরা ভাইস চ্যান্সেলরকে ডাকেনি, আমি সে জন্য তাদের কিছুটা তিরস্কার করলাম। আমি বললাম যে, তাদের নিজেদের স্বার্থেই ভাইস চ্যান্সেলরের উপর বিশ্বাস রাখা উচিত ছিল।

www.pathagar.com

৭-৫-৭৫

মহিউদ্দিন সাহেবের পত্রের উত্তর আজ দিলাম। পত্রে জানালাম যে, আমি শিগ্‌গিরই ঢাকায় যাচ্ছি। সেখানেই তার সঙ্গে দেখা হবে। কুমিল্লায় এবার আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভবপর হবে না। আমার স্ত্রী বললেন যে, তিনি এবার আমার সঙ্গে ঢাকায় যাবেন। তাকে অবশ্যই এবার নিয়ে যেতে হবে। কেননা আমি বুলগেরিয়ায় যাবার আমন্ত্রণ পেয়েছি। সে কারণে তাকে ঢাকায় রেখে আমি বুলগেরিয়ায় যাব। ঢাকায় আমার অনুপস্থিতিতে তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে থাকবেন।

টেলিফোনে ঢাকায় বুলগেরিয়া দূতাবাসে ইভানের সঙ্গে কথা হল। ইভান জানাল যে, আমার বুলগেরিয়া যাবার সব ব্যবস্থা তারা করে ফেলেছে। আমার ফ্লাইট হচ্ছে ২২ তারিখ, বৃহস্পতিবার।

আজ সারা দিন চট্টগ্রাম শহরে থাকতে হবে। স্ত্রী আমার সঙ্গে ছিলেন। সকাল ১০টায় বেতার ভবনে রবীন্দ্রনাথের ওপর একটি কথিকা রেকর্ড করলাম। দুপুরে অন্দরকিল্লায় শফি সাহেবের বাসায় খেলাম। সেখান থেকে বিকেলে আবুল ফজল সাহেবের বাসায় সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য গেলাম। সেখান থেকে সন্ধ্যায় আমার ছাত্র মান্নানের ওখানে গেলাম। মান্নান এবং তার স্ত্রী উভয়ই আমাদের পেয়ে খুব খুশি হল। যখনই আমরা মান্নানের বাসায় গিয়েছি সে নানাভাবে আমাদের আপ্যায়ন করার চেষ্টা করেছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না।

৯-৫-৭৫

আজ দুপুরে কোরেশীর বাসায় ফরাসি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। কোরেশী তাকে খেতে ডেকেছে, রাষ্ট্রদূত আমাদের সাথে খোলামেলাভাবে অনেক কথাই আলোচনা করলেন। তিনি কথায় কথায় বললেন, সাহিত্য সংস্কৃতি সাধনার জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা খুবই প্রয়োজন। সেটি যদি না থাকে তাহলে কোন সাহিত্যিক বলিষ্ঠভাবে নিজের চিন্তাকে প্রকাশ করতে পারেন না। আমার মেয়ে নানা পদ রান্না করেছিল। ফরাসি রাষ্ট্রদূত রান্নার খুব প্রশংসা করলেন। বিদায় নেয়ার সময় রাষ্ট্রদূত বললেন যে, 'এটা অনেক দুঃখের বিষয় যে, তোমাদের সাহিত্য ফরাসি ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে না। তোমরা এ বিষয়ে সচেতন নও বলে আমার মনে হয়। একটু চিন্তা করে দেখ এ বিষয়ে কিছু করা যায় কি না।'

সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ চট্টগ্রাম ক্লাবে ডঃ জোহার বিয়ে ছিল। আমরা সবাই সেখানে গেলাম।

১০-৫-৭৫

সকালে একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিং ছিল। এসব মিটিং সুন্দর এবং সুশৃঙ্খলভাবে হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কিন্তু হয় না স্বভাবতই এর দূরদর্শিতার অভাবে। আবুল ফজল সাহেব নিজে বিশেষ কথা বলেন না, কিন্তু সবাইকে কথা বলতে দেন। এর ফলে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে অসুবিধা হয়। কেউ হয়তো বললেন, আমি ওমুক

www.pathagar.com

বিভাগের অনার্সের পরীক্ষকদের নাম জানতে চাই। স্বভাবতই এ ক্ষেত্রে উচিত হবে এ কথা বলা যে, পরীক্ষা বিষয়টি গোপনীয়, সুতরাং একটি প্রকাশ্য মিটিং-এ এসব নাম বলা যাবে না। কিন্তু তা না বলে তিনি যদি সদস্যদের বলবার সুযোগ দেন তাহলে অযথা সময় নষ্ট হবে এবং কোলাহল হবে। আবুল ফজল সাহেব এটাই করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সভা সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় না।

বিকেলে সামসুল আলমের বাসায় গেলাম। সেখানে দেখলাম শহর থেকে তাঁর দুজন বন্ধু এসেছেন। একজন প্রকৌশলী, অপরজন ডাক্তার। এরা বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কথা বলছিলেন। এমন সময় বাংলা বিভাগের দেলোয়ার হোসেন এল। দেলোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য একটি এলাকায় থাকে। সাধারণত সে এদিকে আসে না। আলোচনা সূত্রে বাংলাদেশে সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে একটি মাত্র দল করার ব্যাপারে কথাবার্তা যখন হচ্ছিল তখন দেলোয়ার বলল, "আমি এবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কাজে ঢাকায় গিয়েছিলাম। পরীক্ষার কাজে একদিন লেগেছে। পরের দিন আমি 'বাংলার বাণী' পত্রিকা অফিসে ফজলুল হক মনির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মনি কলেজ জীবনে আমার সহপাঠী ছিল। তার অফিসটা বেশ ছিমছাম। অনেক রাজনৈতিক নেতা এবং ছাত্রনেতা সেখানে বসে। মনি ইশারায় আমাকে বসতে বলে এসব নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল। তার কথাবার্তার ধরন দেখে এবং তার প্রতি নেতাদের আচরণ দেখে আমার মনে হল যেন ফজলুল হক মনি বাংলাদেশের সর্বেসর্বা। এসব লোকজন চলে গেলে সে আমাকে উপদেশ দেয়া আরম্ভ করল। সে বলল, 'আমার উচিত শিক্ষকতা কাজের সঙ্গে দেশের রাজনীতিতে অংশ নেয়া। এক পর্যায়ে সে আমাকে আশ্বাস দিল যে, বাকশালের গঠনতন্ত্র তৈরি হচ্ছে এবং একটি বড় ধরনের কাউন্সিল শিগগিরই গঠিত হবে। উক্ত কাউন্সিলে সে ইচ্ছা করলে আমাকে একজন সদস্য করতে পারে।"

দেলোয়ারের কথা শুনে সামসুল আলমের বন্ধু ডাক্তার সাহেব মন্তব্য করলেন, "দেশটা স্ব-শাসন থেকে অ-শাসনে যাচ্ছে। কি যে সর্বনাশ সামনে আসছে তা আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারছি না।" এমন সময় রেজিস্ট্রার খলিলুর রহমান এসে উপস্থিত হলেন। তার আসার ফলে রাজনীতি আলোচনা বন্ধ হলো এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হল।

১১-৫-৭৫

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, মদুসূদনের সব কটি কাব্যগ্রন্থের ওপর আলোচনা লিখব। দীর্ঘদিন মধুসূদনের কাব্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছি। এখন সময় এসেছে আমার বিবেচনাগুলো লিখিতভাবে পাঠকের সামনে উপস্থিত করা। আজ চতুর্দশপদী কবিতাবলী নিয়ে লেখা আরম্ভ করলাম। সব কটি লেখা শেষ হলে একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হবে। মধুসূদনের প্রতি আমার আকর্ষণ দীর্ঘকালের। প্রথমবার যখন চট্টগ্রামে আসি তখন চট্টগ্রাম রেডিও থেকে মধুসূদনের সামগ্রিক কাজকর্মের ওপর একটি কথিকা প্রচার করি। শান্তিনিকেতনে ডঃ প্রবোধ চন্দ্র সেন কথিকাটি শুনে আমার কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। কথিকাটি তাঁর ভাল লেগেছিল।

www.pathagar.com

১২-৫-৭৫

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস করে বাসায় ফিরে এলাম। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর ওপর লেখাটিতে আজকেও হাত দিলাম। আজ শেষ হবে না সম্ভবত কাল শেষ হবে।

১৩-৫-৭৫

প্রবন্ধটি আজ শেষ করলাম।

'বইঘর'-এর শফি সাহেব এলেন বিকেলবেলা। তাঁর সঙ্গে কিছুটা সময় কাটালাম। শফি সাহেব আমার অনেকগুলো বই ছেপেছেন। আমি নতুন একটি বই লেখায় হাত দিয়েছি শুনে তিনি সেটিও চাপবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

সন্ধ্যার পর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এ. কে. খান সাহেবের বাড়িতে গেলাম। তিনি আমাকে দেখে খুবই খুশি হলেন। তিনি চট্টগ্রামের সমুদ্র তীরভূমি রক্ষার ব্যাপারে যেসব চিন্তা-ভাবনা করেছেন সেগুলো আমাকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন যে, কোন কোন গাছ আছে যেগুলো বালুতে ভাল জন্মে। যেমন খেজুর, নারকেল গাছ। এ গাছগুলোর শিকড় এমনভাবে জমি আঁকড়ে থাকে যে এদের সাহায্যে তীরের ভাঙ্গন রোধ করা যায়।

১৪-৫-৭৫

আজ মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করলাম। এই কাব্যের মধ্যে মধুসূদনের লিরিকধর্মিতার পরিচয় মেলে। ফররুখ ব্রজাঙ্গনা কাব্য-এর অনেক পদ সুর করে মুখে বলতে পারত। তার ধারণায় মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'-এ বিস্ময়কর একটি নতুন শৈলীর পরিচয় দিয়েছেন। আমি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ছিলাম তখন সেখানকার বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে মধুসূদনের জন্মদিবস উদ্‌যাপন করেছিলাম। সেই অনুষ্ঠানে একটি মেয়ে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'-এর কয়েকটি গান গেয়েছিল।

১৫-৫-৭৫

আজ সকালে সিণ্ডিকেটের মিটিং ছিল। কি একটা কাজ উপলক্ষে চট্টগ্রামে কবি গোলাম মোস্তফার বড় মেয়ে জ্যোৎস্না এসেছিল। সে আমাদের বাসায় দেখা করতে এল।

সন্ধ্যার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট মসজিদে এক বহিরাগত ভদ্রলোক মাগরেবের নামাজের শেষে উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করা আরম্ভ করলেন। তার বক্তৃতা শুনতে কেউ প্রস্তুত ছিল না। সবাই মিলে সোরগোল করে তাকে থামিয়ে দিল। পরে জানা গেল ভদ্রলোক তবলিগ জামাতের লোক। এরা যেখানেই সুযোগ পায় সেখানেই ইসলামের দাওয়াত দিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

১৬-৫-৭৫

আজ বিকেলে এডভান্সড স্টাডিজ কমিটির মিটিং ছিল। আজকের মিটিং-এ কয়েকজন অধ্যাপকের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাঁদের থিসিস মুদ্রণ করার অনুরোধ ছিল। সিদ্ধান্ত হল যে, এ সমস্ত থিসিস মুদ্রণ করা যাবে কিনা সে বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ গ্রহণ করা দরকার।

রাতের ট্রেনে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় রওয়ানা হলাম। আমি বুলগেরিয়ায় একটি অনুষ্ঠানে যাব সে উপলক্ষেই ঢাকায় যাওয়া। বুলগেরিয়া থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার স্ত্রী ঢাকায় থাকবেন।

১৭-৫-৭৫

ঢাকায় গোপীবাগে বাবলুর বাসায় উঠলাম। সে এখন কিছুই করে না। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাসায় বসে আছে। বাসায় বসে সে হাঁস পালছে, কবুতর পালছে এবং হরিণ পালছে। বাড়ির ছাদে তারের বেড়া দিয়ে বেশ সুন্দর করে হরিণের ঘর বানিয়েছে। ছাদের অন্যদিকে কবুতরের ঘর বানিয়েছে। সে একটি বড় আকারের কবুতর আমাকে দেখাল। কবুতরটির বেশ ওজন। কবুতরটির নাম বলল, 'হোমার'। আমি এ ধরনের কবুতর আগে দেখিনি। আরও অনেক ধরনের কবুতর তার আছে।

বিকেলে হোসেনী দালানে আমার ভাইয়ের বাসায় এবং আমার ভাগ্নে রফিকের বাসায় গেলাম। রাত্রে রফিকের ওখানে খেলাম।

১৮-৫-৭৫

আজ সারাদিন স্ত্রীকে নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের বাসা ফিরলাম। একবার বেলা ১১টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে গিয়েছিলাম। সেখানে অনেকের সঙ্গে দেখা হল।

১৯-৫-৭৫

আজ দুপুরে গুলশানে বুলগেরিয়া রাষ্ট্রদূতের বাসায় আমাদের খাবার দাওয়াত। ভদ্রলোক দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি আইভানকে ১১টার দিকে গাড়ি দিয়ে পাঠালেন। আমরা সে গাড়িতে রাষ্ট্রদূতের বাসায় গেলাম। সেখানে আরও ক'জন বিদেশী অতিথি দেখলাম। তাদের মধ্যে পূর্ব জার্মানের রাষ্ট্রদূতকেও দেখলাম। বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে বিশেষ করে বর্তমানে এক পার্টি গঠনের ব্যাপারে পূর্ব জার্মানির রাষ্ট্রদূত আমার অনুভূতিটা জানতে চাইলেন। আমি হেসে বললাম, "আমি এখানে দুপুরের খাবার খেতে এসেছি। এই খাদ্য গ্রহণ উপলক্ষে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বোধ হয় ঠিক হবে না।" রাষ্ট্রদূত বললেন, "তুমি তো ডিপ্লোম্যাটের মত কথা বলছ।" আমি হেসে বললাম, "তুমি যদি আনডিপ্লোম্যাটিক প্রশ্ন কর তাহলে আমি ডিপ্লোম্যাটিক প্রশ্নের উত্তর দেব এটাই তো স্বাভাবিক।" আমার কথায় সবাই হাসতে লাগলেন। খাবার এমন বিশেষ কিছু ছিল না। তবে খাবার শেষে যে মিষ্টি পরিবেশন করা হল তার মধ্যে নতুনত্ব ছিল।

www.pathagar.com

ঘন দুধের মধ্যে গরম ভাত দেয়া হয়েছিল এবং আমরা প্রত্যেকে নিজেদের স্বাদ মত চিনি নিলাম। একটি প্লেটে বাদাম-পেস্তা সরু সরু করে কাটা ছিল। সেগুলো মিশিয়ে আমি এই অদ্ভুত দুধ-ভাত খেলাম।

আমরা দুধ জ্বাল দিয়ে তার মধ্যে চাল ফুটিয়ে নিই এবং তারপর তার মধ্যে চিনি দেই। পরে সব উপাদানগুলো এক সঙ্গে রান্না হয়ে খাদ্যসামগ্রী হিসেবে আমাদের সামনে আসে। আর এদের দেখলাম টেবিলে বসে দুধ-ভাত চিনি নিজেরাই মিশিয়ে নিলেন। দুধটা খুব ঘন থাকায় এবং বাদাম-পেস্তা থাকায় খেতে সুস্বাদু হয়েছিল।

বিদায় নেয়ার আগে রাষ্ট্রদূত জানালেন যে, সোফিয়া এয়ারপোর্টে পৌঁছে আমি আমার প্রোগ্রাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব। এয়ারপোর্টে যারা আমাকে নিতে আসবেন তাদের কাছ থেকে আমি বুলগেরিয়ায় অবস্থানকালে আমার কি কি কর্মসূচী হবে তা জানতে পারব। গাড়িতে যখন উঠতে যাচ্ছি তখন ভদ্রলোক একটি প্যাকেট আমার হাতে দিলেন। বললেন যে, আমি যেন বাসায় গিয়ে খুলি। বাসায় এসে প্যাকেট খুলে দেখি এক বোতল কেয়ানতি, বুলগেরিয়ার এক বিশেষ ধরনের মদ। আমার তো এ অভ্যাস নেই। সুতরাং বোতলটা নিয়ে কি করা যায় ভাবতে লাগলাম।

২০-৫-৭৫

আজকে টেলিফোনে যোগাযোগ হল ডঃ সালাহউদ্দিন, ডঃ এম. আই. চৌধুরী এবং ফকরুদ্দিনের সঙ্গে। এম. আই. চৌধুরী দেখা করতে আসতে চাইলেন। কিন্তু সময় হবে না বলে আমি নিষেধ করলাম। টেলিফোনে তিনি বললেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে তিনি এক স্কুল মাস্টারে পরিণত হয়েছেন এবং ভাইস চ্যান্সেলর হচ্ছেন হেড মাস্টার। আমি হেসে বললাম, ভাইস চ্যান্সেলর যিনি তিনি তো বেশিদিন থাকবেন না, আপনিই থাকবেন। সুতরাং আপনি এত চিন্তা করছেন কেন? বিকেলে ডঃ মনিরুজ্জামান ও আবু জাফর দেখা করতে এল।

২১-৫-৭৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ অনার্সের প্রশ্নপত্র তৈরি করে দিলাম। বিভাগীয় প্রধানের ঘরে বসেই প্রশ্নপত্রটি তৈরি করতে হল। সেখানেই অকস্মাৎ ডঃ এনামুল হকের সঙ্গে দেখা হল। আমি তাকে ঠাট্টা করে বললাম, "আসুন, আসুন উপ-মহাধ্যক্ষ সাহেব, আসুন।" তাঁকে সম্বোধন করলাম এজন্য যে, তিনি বর্তমানে শ্রুতিকটু উপমহাধ্যক্ষ শব্দটি ব্যবহার করছেন।

২২-৫-৭৫

আজ সন্ধ্যে ৬টায় এ্যারোফ্লোটে আমার যাত্রা মস্কো হয়ে সোফিয়ায়। দূতাবাসের গাড়িতে বিমান বন্দরে পৌঁছলাম। বিমানবন্দরে ডঃ মনিরুজ্জামান এবং আবু জাফর উপস্থিত ছিল। এ্যারোফ্লোটে এই আমি প্রথম চড়তে যাচ্ছি। বুলগেরিয়া দূতাবাসের আইভান প্লেনের ভিতরে আমাকে বসিয়ে দিয়ে বিদায় নিল।

www.pathagar.com

২৩-৫-৭৫

সকালে মস্কো বিমান বন্দরে পৌঁছলাম। আমি ট্রানজিট বা অন্তর্বর্তীকালীন যাত্রী। আমার সঙ্গে রয়েছে আরো ন'দশ জন। আমরা যাব সোফিয়ায়। আমাদের বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ট্রানজিট লাউঞ্জে নতুন প্লেন ধরবার জন্য। বেশ উঁচু সিঁড়ি বেয়ে লাউঞ্জে যাবার পথে পুলিশ আমাদের পাসপোর্টগুলো কেড়ে নিল। 'কেড়ে নিল' শব্দটি আমি ইচ্ছা করেই বললাম। কেননা, পুলিশ আমাদের হাত থেকে খুব রুক্ষভাবে প্রায় ধমক দেয়ার মত করে পাসপোর্ট চেয়ে নিল। এয়ারপোর্টের কাজকর্ম খুবই নিষ্ঠুর শৃঙ্খলার সঙ্গে চলছে লক্ষ্য করলাম। সকাল ১০টায় বুলগেরিয়ায় যাব বলে প্লেনে উঠলাম এবং ১১টায় সোফিয়া এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। এয়ারপোর্টে সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়কারী একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। তিনি একজন মহিলা। তাঁর সঙ্গে ছিল আরও দুজন লোক। এদের একজনকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হল আমার দোভাষী বলে। এয়ারপোর্টে আমার কর্মসূচী বুঝিয়ে দেয়া হল। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল অপেরা দেখা, ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বার্ষিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা, নৃত্যনাট্য দেখা এবং মোটর গাড়িতে করে সমুদ্র তীরবর্তী শহর ভার্না পর্যন্ত যাওয়া এবং ফিরে আসা। আমি বুলগেরিয়ার বিখ্যাত গোলাপ ফুলের অঞ্চলের কথা জানতাম। সেখানে আতর তৈরি হয় এবং সেই আতর ফ্রান্সে বিভিন্ন ধরনের সেন্ট তৈরির জন্য রপ্তানি হয়। ওসমানীয় ও তুর্কিরা যখন এক সময় বুলগেরিয়া অধিকার করেছিল তখন তারা এদেশের গোলাপের চাষ করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, গোলাপের জায়গায় যাওয়া যাবে কিনা। আমাকে অভ্যর্থনাকারী মহিলা বললেন যে, হয়তো বা সম্ভব হবে না, তবুও তিনি চেষ্টা করে দেখবেন। আমার থাকবার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল হোটেল বলকান নামক একটি হোটেলে। হোটেলে আমাকে আমার অবস্থানকালীন ভাতা দিয়ে দেয়া হল। আমি যখন যা খাব এই ভাতা থেকেই তার দাম পরিশোধ করব। যা বাঁচবে তা থেকে স্যুভেনির কিনতে পারব। আমার দোভাষী আমাকে কিছুক্ষণের জন্য একা রেখে চলে গেল। জানালো যে বিকেল ৪টায় আমাকে নিয়ে সে বেড়াতে বেরুবে। দুপুরে হোটেলের রেস্তোরাঁয় খেয়ে নিলাম। বিকেলে দোভাষীর সঙ্গে বেড়াতে বেরুলাম। হোটেলের কাছে প্রায় একশ' গজ দূরে সোফিয়া জামে মসজিদ। মসজিদটি তুর্কি স্থাপত্যের একটি নিদর্শন। বাইরে থেকে মসজিদের অভ্যন্তরভাগ দেখা যায় না। কেননা রাস্তার পার্শ্বে খুব উঁচু দেয়াল দিয়ে মসজিদটি আড়াল করা হয়েছে। হঠাৎ মসজিদটি দূরে থেকে দেখলে পরিত্যক্ত ভবন বলে মনে হয়। সোফিয়ায় যে কদিন ছিলাম একদিনও মসজিদে আজান শুনিনি। পরে জেনেছি যে, এদেশে আজান দেয়া নিষিদ্ধ। সোফিয়ার মসজিদটি সরকার রক্ষা করেছে এই কারণে যে, মুসলিম দূতাবাসের লোকেরা জুমার দিন এবং ঈদের দিনে নামাজ পড়তে আসে। সোফিয়ার রাস্তায় ভিড় কম এবং রাস্তাঘাট খুবই পরিচ্ছন্ন। প্রায় বাড়ির দেয়ালে লাগানো গোলাপ গাছ দেখা যায়। এ সব গাছে ফুলগুলো বেশ বড়। অনেকটা ডালিয়া ফুলের মতো। রং প্রধানত লাল, হলুদও আছে। সন্ধ্যায় একটি ছোট রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার খেলাম। একটি নতুন খাবারও খেলাম, খেতে ভাল লাগল। টমেটো, পাউরুটি এবং পনিরের সংমিশ্রণে তৈরি করা এবং অভেনে জমাটবাঁধা এক ধরনের কেক। এটাই প্রধান খাদ্য ছিল। আমার সঙ্গে আমার দোভাষীও খেল। আমরা নিজের নিজের দাম পরিশোধ করলাম।

www.pathagar.com

২৪-৫-৭৫

আজ বুলগেরিয়ার জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও লিপি দিবস। বহু আগে ওসমানীয় ও তুর্কিদের শাসনামলে কিরিল ও মেথডিয়াস নামক দুজন যাজক ভ্রাতা তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আয়োজন করে। বিদ্রোহের আয়োজনের জন্য তারা একটি লিপি আবিষ্কার করে। এই লিপির মাধ্যমে তারা তাদের বক্তব্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়। এই লিপি পরবর্তীকালে স্লাভনিক লিপি বলে পরিচিত হয়। বর্তমানে রাশিয়ায় এবং পূর্ব ইউরোপীয় অনেক দেশে এই লিপি প্রচলিত। এই দুই যাজক ভ্রাতার স্মরণে বুলগেরিয়া প্রতি বছর একটি আন্তর্জাতিক ভাষা, সাহিত্য ও লিপি দিবস পালন করে থাকে। দিবসটি তাদের জন্য একটি উচ্ছলতা এবং আনন্দের দিবস। রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বের হয়। মিছিলে নৃত্য-গীত পরিবেশন করতে করতে রঙিন পোশাক পরা ছেলেমেয়েরা পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলে। মিছিলগুলো খুবই বর্ণাঢ্য। যে সব রাস্তা দিয়ে মিছিল চলে তার দু'পাশে মেলা বসে যায় এবং সেখানে নানা ধরনের খাবারের দোকান বসে যায়। আমি সোফিয়া শহরের প্রধান সড়কের প্রধান মিছিল দেখতে গিয়েছিলাম। মিছিল পুরোপুরি দেখা গেল না। অকস্মাৎ প্রবল বৃষ্টিপাত আরম্ভ হল। কোন রকমে একটি খাবারের দোকানে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নিলাম।

বিকেলে পুরাতত্ত্ব মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। এই যাদুঘরটি খুবই সুন্দর এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু চিহ্ন এখানে সুরক্ষিত আছে। বুলগেরিয়া অঞ্চলটি পৃথিবীর একটি প্রাচীন অঞ্চল। পুরাতত্ত্বের খননের ফলে এখানে বহু জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে, যেগুলো বহু বছরের পুরনো। যাদুঘর থেকে বেরিয়ে রোমান অধিকারের সময়কার কিছু নিদর্শন দেখলাম। রাত্রে বুলগেরীয় কনসার্ট হলে একটি যুদ্ধ বিরোধী কনসার্ট শুনলাম। পৃথিবীতে কমিউনিস্টদের প্রচারণার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে – তারা শান্তি শব্দটি খুব বেশি উচ্চারণ করে এবং শান্তির নামে পৃথিবীর বহু দেশে নিজেদের আদর্শ বিতরণের সুযোগ করে নেয়।

২৫-৫-৭৫

সোফিয়া থেকে একশ' কিলোমিটার দক্ষিণে আমরা রিলা পর্বতমালার অভ্যন্তরে গেলাম। এই পর্বতমালার অভ্যন্তরে খ্রিস্টীয় দশম শতকের একটি মনাস্টারি আছে। এই মনাস্টারির একটি কক্ষে পুরনো কিছু সংগ্রহ আছে। এখানে আরবি হরফে লেখা তুর্কি আমলের একটি ফরমান আছে। মনাস্টারি থেকে বেরিয়ে রিলা পর্বতমালার মাঝখানে একটি পাথরের নদী দেখলাম। নদীর দুটি তীরভূমি সুস্পষ্ট, কিন্তু নদীতে পানির পরিবর্তে বড় বড় মসৃণ পাথর ছড়িয়ে আছে। কি করে পাথরের এই নদী তৈরি হয়েছে আমার দোভাষী তা আমাকে বোঝাতে পারল না। শুধু বলল যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোন একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে নদীতে পানির পরিবর্তে নানা আকারের পাথর জমা হয়েছিল। দূর থেকে এই পাথরগুলোকে তরঙ্গ বলে ভ্রম হয়। নদীটি খুব প্রশস্ত নয়। কিন্তু খুবই দীর্ঘ এবং কোথায় যে শেষ হয়েছে তা কেউ বলতে পারে না। রোদের আলোয় পাথরগুলো কোথাও কালো দেখায়, কোথাও সাদা এবং কোথাও বা হাল্কা নীল। দেখতে সত্যি মনোরম।

www.pathagar.com

আমরা সকাল ৯টায় যাত্রা করেছিলাম এবং বিকেল ৪টায় ফিরে এলাম। সন্ধে ৭টায় ন্যাশনাল অপেরায় একটি অনুষ্ঠান দেখলাম। অপেরায় প্রেম, কর্তব্য ও জাতীয় স্বার্থ এই তিনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি প্রচারমূলক। অনুষ্ঠানে কমিউনিজমের আদর্শের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে চাকচিক্য ছিল, কিন্তু প্রবল প্রচারমুখীনতার জন্য সবটাই আমার কাছে আড়ষ্ট মনে হয়েছিল। গল্পটায় জার কালোয়ান নামক এক সময়কার বুলগেরিয়ার শাসকের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে একজন ঘোষক অপ্রাসঙ্গিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রশংসা করল এবং তখন দর্শকরা হাততালি দিয়ে তাকে সমর্থন জানাল।

২৬-৫-৭৫

আজ সারা দিন ছিল সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ব্যবস্থা। যে কোন কমিউনিস্ট দেশে বিদেশীদের জন্য এমন ব্যবস্থা করা হয়েই থাকে। যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে বিদেশী অতিথিকে তারা বুঝিয়ে দেন যে, কমিউনিস্ট শাসন প্রবর্তনের পূর্বে তাদের দেশের লোকেরা হাহাকার এবং গ্লানির মধ্যে ছিল এবং কমিউনিস্টরা এসে সমস্ত অকল্যাণ দূর করে দেশকে স্বস্তি ও সম্পদের মধে জাগিয়ে তুলেছে। বুলগেরিয়ায় সরকারীভাবে এশিয়া ও আফ্রিকায় সংহতি রক্ষার নামে একটি কমিটি আছে। এই কমিটির একজন প্রধান ব্যক্তি ডরিকালেভের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। তিনি প্রথাগতভাবে অনেক আদর্শের কথা, শান্তির কথা বলে গেলেন এবং আমি শুনবার ভান করলাম। এরপর আমাকে নিয়ে যাওয়া হল সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিষয়ক ডাইরেক্টরেটে। সেখানে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল তিনি বুলগেরিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা বর্ণনা করলেন। তাঁর কাছেই জানলাম যে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির যিনি মহাসচিব তিনিই আবার বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিরও মহাসচিব। অর্থাৎ এক কথায় বুলগেরিয়া মূলত সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি বশংবদ রাজ্য। এ ভদ্রলোকের সোভিয়েতের স্তুতি গাওয়া আমার একেবারেই ভাল লাগল না। এখানে অবস্থানকালে বুলগেরীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের একজন মহিলা কর্মী এলেন। শুনলাম তিনি একজন উপমন্ত্রী। ডাইরেক্টরের একটি কক্ষে আমার জন্য লাঞ্চের ব্যবস্থা ছিল। সেখানেই সকলে এসে জড়ো হলেন। লাঞ্চটি উপভোগ্য ছিল। প্রথমে প্লেটে করে পনির, শুকনো গোস্ত, সিদ্ধ ডিমের টুকরো, একটু ক্যাডিয়ার শশা এবং মূলো ছিল। এরপর প্রত্যেকের জন্য বড় বাউল করে স্যুপ। স্যুপের মধ্যে ভাত ছিল, সবজি ছিল, গোস্ত ছিল – এগুলো মিলিয়ে যে মিশ্রণটি তৈরি হয়েছিল তা আমার কাছে খুব সুস্বাদু লাগল। এ স্যুপটা রাশিয়ার অনেকটা বস স্যুপের মত। এরপরের আইটেম ছিল ফিস ফ্রাই। বেশ বড় একটু মাছের ফিলে, সুন্দর করে ভাজা, সঙ্গে আলু সিদ্ধ এবং পেঁয়াজ কলি। সর্বশেষ আইটেমটি ছিল দুধের খির। আসলে এটা দুধ-ভাত। ঘন দুধের মধ্যে ভাত এবং চিনি মিশিয়ে খেতে হয়।

সন্ধ্যা ৭ টায় ন্যাশনাল অপেরায় সোয়ান লেইন ব্যালেটি দেখলাম। এটি একটি অপূর্ব নৃত্যনাট্য এবং অসাধারণ ব্যঞ্জনাবহ।

www.pathagar.com

২৭-৫-৭৫

আজ সকালে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল আর্টিস্টিক একাডেমীতে। এটি শিল্পকলার প্রধান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখানে চিত্রকলা, ফ্রেসকো ভাস্কর্য, গ্রাফিক, পোস্টার, অ্যানিমেশন আর্টস এবং ড্রইং শিক্ষা দেয়া হয়। এক অংশে সিরামিকস এবং উড কার্ভেং। এছাড়া ইনটিরিয়ার ডেকোরেশন এবং টেক্সটাইল সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এই ইন্সটিটিউটে দেয়া হয়ে থাকে। এখানে কোর্স শেষ করতে মোট ৭ বছর লাগে। বেলা ২টায় টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম এবং ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। বিকেল ৪টায় একাডেমী অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠানে একজন একাডেমিশিয়ানের সঙ্গে দেখা হল। ভদ্রলোক সত্যি পণ্ডিত ব্যক্তি, বয়স্ক এবং সম্ভ্রান্ত। ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে ইনি গভীর জ্ঞান রাখেন। আমাকে অল্পক্ষণের মধ্যেই বুলগেরীয় ভাষার গতি-প্রকৃতি বুঝিয়ে দিলেন।

২৮-৫-৭৫

সোফিয়ায় বলকান হোটেলের নিকটেই একটি চিকেন রেস্তোরাঁ আছে। দুপুরে এখানেই খেলাম। রেস্তোরাঁয় মুরগী ছাড়া আর কিছুই পরিবেশন করা হয় না। আনুষঙ্গিকভাবে চা-পাউরুটি আসে কিন্তু প্রধান খাবার নয়। প্রথম আইটেম ছিল চিকেন স্যুপ, দ্বিতীয় আইটেম ছিল মুরগীর চামড়া-গিলা এবং কলিজা ভাজা। তারপরের আইটেম ছিল মুরগীর রোস্ট। বিকেল ৩টায় আমি বুলগেরিয়ার গ্র্যান্ড মুফতি হাসান আদেমোভ মোস্তফার সঙ্গে তার বাড়িতে সাক্ষাৎ করলাম। এঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থাটি সরকারীভাবেই করা হয়েছিল। ভদ্রলোকের ওখানে প্রচুর চকলেট খেলাম। বুলগেরিয়ার মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে মুফতির কাছ থেকে একটি বিস্তৃত সরকারী ভাষ্য পেলাম। বুলগেরিয়ায় মোট এক হাজারটি মসজিদ আছে। এ দেশটি প্রায় চারশ' বছরের অধিককাল ওসমানী ও তুর্কিদের অধীনে ছিল। এই সময়কালে তুর্কিরা অনেক সুন্দর সুন্দর মসজিদ বানিয়েছিল। তুর্কিদের পরাজয়ের পর কিছু মসজিদকে গির্জায় রূপান্তরিত করা হয়। কয়েকটি মসজিদ যাদুঘরে রূপান্তরিত হয় এবং বর্তমানে নামাজের জন্য কিছু মসজিদ নির্দিষ্ট আছে। যে সব মসজিদে নামাজ হয় সে সব মসজিদে আজান দেবার প্রথা নেই। মুফতি বললেন যে, আজান হচ্ছে বিশ্বাসীদের জন্য। যেহেতু এখানকার মসজিদগুলোর আশপাশে কোন মুসলিম নেই তাই আজান দেবার প্রয়োজন হয় না। ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম যে, তাদের দেশে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ কি? ভদ্রলোক উত্তরে বললেন যে, যে সব মুসলমান তাদের দেশে আছে তাদের অধিকাংশই প্রবীণ, তাদের দেশের তরুণরা সবাই ধর্মনিরপেক্ষ এবং কমিউনিস্ট। ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, 'আমার বড় ছেলেও কমিউনিস্ট'। মুফতির ওখান থেকে আমি সোফিয়ার জামে মসজিদে গেলাম। মসজিদে মাথায় লাল টুপি পরা একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি কোরান শরীফ পড়ছিলেন। আমাকে দেখে খুব আদবের সঙ্গে কোরআন শরীফ তুলে রাখলেন এবং আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলা আরম্ভ করলেন। আমি বললাম, এখানে কি জামাত হয়? ইমাম সাহেব খুব সহজেই উত্তর দিলেন ঃ "আপনি এসেছেন, এখন আপনার সঙ্গে আমি জামাতে নামাজ পড়ব।" ভদ্রলোক খুব কৌশলে আমার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেলেন। বিকেল ৫টায় সোফিয়ার অদূরে বিটুল পর্বতমালা দেখতে গেলাম।

www.pathagar.com

২৯-৫-৭৫

আজ সকালে এ দেশের কমিউনিস্ট পরিচালিত শিল্পী সংস্থার সহ-সভাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। সেখান থেকে একটি ভাস্কর্যের প্রদর্শনীতে গেলাম। ভাস্কর্যগুলো প্রধানত প্রচারমূলক। এর মধ্যে লেনিন ও স্ট্যালিনের মূর্তি ছিল। দুপুর ১২টায় সোফিয়ার প্রেস এজেন্সির কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। বেলা ২টায় আন্তর্জাতিক পি.ই.এন ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। বিকেলে কমিউনিস্ট বিপ্লবের বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে যে জাতীয় যাদুঘরটি রুসুকি ব্যুলভার্ডে আছে সেটা আমাকে দেখান হল। বুলগেরিয়ার যতগুলো যাদুঘর দেখলাম কোনটিতেই তুর্কি অধিকারের কোন চিহ্ন রাখা হয়নি। তুর্কিরা ৪শ' বছরের অধিককাল এ দেশে ছিল। ইতিহাসের এ সত্য কোনক্রমেই মুছে ফেলা যায় না। কিন্তু কমিউনিস্টরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছে মুসলমান অধিকারের চিহ্ন মুছে ফেলতে। কিন্তু চেষ্টা করলেই কি সব চিহ্ন মুছে ফেলা যায়? বুলগেরীয়দের খাবার তৈরির মধ্যে তুর্কি প্রভাব বিদ্যমান। কাবাব তো সব রেস্তোরাঁয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক শহরে হালুয়ার দোকান আছে। এই 'হালুয়া' ও 'কাবাব' শব্দটি বুলগেরিয়ার ভাষার মধ্যে ঢুকে গেছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্পগুলো এরা নিজেদের মতো করে পরিবর্তন করে নিয়েছে। তুর্কিরা যে গোলাপ বাগান করে গেছে, আজও তা দর্শকদের নয়ন মুগ্ধ করে। আঁদ্রে চিন নামক একজন একাডেমিশিয়ানের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম। তিনি তুরস্কের চারশ' বছরের অধিকারের বিষয়টি আমাকে এভাবে ব্যাখ্যা করলেন, "সে সময়কাল ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কাল। তুরস্কের অধিকারের সময়টিতে আমরা একটি প্রতিবাদের মধ্যে বাস করেছি।"

৩০-৫-৭৫

আজ সকাল ১০টায় এ দেশের একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ভ্লাদিমির গিওরগিভের সঙ্গে কথাবার্তা হল। ভদ্রলোক পদার্থ বিজ্ঞানের একজন প্রবীণ পণ্ডিত। কিন্তু তিনি বহু বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। ভাষাতত্ত্ব নিয়েও কিছুটা সময় আমার সঙ্গে কথা বললেন। দুপুরে জামে মসজিদে জুমার নামাজ পড়লাম। মুসলিম দূতাবাসের কয়েকজন কর্মচারী, একজন তুর্কি ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় একজন মুসলমান নামাজ পড়তে এসেছিলেন। নামাজ শেষে ইমাম সাহেব বরফির মত এক ধরনের শুকনো মিষ্টি বিতরণ করলেন।

বিকেলে সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা বিভাগে গেলাম। এখানে আরবি ভাষা, ফারসি সংস্কৃত ভাষার গবেষণা হয়ে থাকে শুনলাম। বিকেল ৪টায় দোভাষীকে সঙ্গে নিয়ে সোফিয়া শহরের কয়েকটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঘুরলাম।

৩১-৫-৭৫

আজ খুব সকালে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি সুরক্ষিত গুহায়। এই গুহা একেবারে ভিতরে। দেয়াল গাত্রে আদিম মানুষের আঁকা ছবি আছে। এই গুহাকে 'রাবিশা গুহা' অথবা 'মাগুরা গুহা' বলা হয়ে থাকে। গুহাটি খুবই বড় এবং

www.pathagar.com

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় একে পরিচ্ছন্ন এবং আলোকিত রাখা হয়েছে। গুহাটি উঁচু-নিচু বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। গুহার অভ্যন্তর ভাগে অত্যন্ত শীত। বহু পর্যটক এ গুহা দেখতে আসে। আমরাও একটি পর্যটক দলের সাথে মিশে গেলাম। প্রতিটি পর্যটক দলের সঙ্গে একজন করে স্থানীয় ব্যাখ্যাকার থাকেন। তিনি গুহার ইতিহাস এবং বিশিষ্টতা ব্যাখ্যা করেন। গুহাটি বলকান পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় হোটেলে ফিরে এলাম।

১-৬-৭৫

আজ থেকে আমার প্রোগ্রাম হচ্ছে গাড়ি করে বুলগেরিয়ার হাইওয়ে দিয়ে যাত্রা করে বিভিন্ন শহর দেখা এবং অবশেষে ভার্না সমুদ্র বন্দরে একরাত অবস্থান করা। সকাল ৮টায় আমার দোভাষী এল এবং তার সঙ্গে একজন যুবক। যুবকের পরিচয় করিয়ে দেয়া হল একজন সমাজকর্মী হিসেবে, গাড়ি চালিয়ে আমাকে নিয়ে যাবে। আমরা একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেলাম। যে গাড়িতে আমরা উঠলাম সেটা সোভিয়েত ইউনিয়ন নির্মিত একটি সিডান গাড়ি। বুলগেরিয়ার লোকসংখ্যা কম। সুতরাং এদেশে গাড়ি চালান খুব সোজা। কোথাও কোন ভিড় নেই এবং কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। সোফিয়া থেকে সত্তর কিলোমিটার পূর্বে সামকান শহরে থামলাম। এ শহরটি একটি প্রাচীন তুর্কি শহর। এখানে বেশ ক'টি মসজিদ আছে, তুর্কি আমলের কয়েকটি হাম্মামখানা আছে, মুসলমানদের একটি প্রাচীন কবরস্থান এবং তুর্কি খাবারের দোকান আছে। কিন্তু মজার কথা হল এখানে তুর্কি মানুষ একটিও নেই। এখানকার জামে মসজিদটির নাম বৈরালকী জামে মসজিদ। বৈরালকী সম্ভবত এলাকার নাম। সমগ্র মসজিদটি একটি দর্শনীয় স্থান হিসেবে একটি যাদুঘরে রূপান্তরিত হয়েছে। মসজিদের ভিতরে চতুর্দিকের দেয়ালে, ছাদে এবং গম্বুজের অভ্যন্তরে নানা রকমের গাছপালা এবং লতাপাতার ছবি। মেহরাবের সম্মুখে অর্ধবৃত্তাকার দেয়ালে কাবার ছবি এবং মদীনা শরীফের ছবি। এই ছবিগুলোর অঙ্কন পদ্ধতি হচ্ছে 'বারক'। চিত্রগুলো ছড়ান নয়, উর্ধ্ব। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ কাজে একজন মহিলাকে দেখলাম। তিনি আমার হাতে একটি ছাপান কাগজ দিলেন, তাতে ইংরেজিতে মসজিদের দেয়ালের চিত্রগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া আছে। যে তুর্কি গভর্নর এ নির্মাণের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তিনি এ কাজে বুলগেরীয় লোকদের নিযুক্ত করেছিলেন। এই বুলগেরীয় লোকেরা মসজিদের ভেতরে দেয়াল চিত্র অঙ্কন করেছিল। গভর্নর মসজিদ দেখে খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু ভিতরকার চিত্রগুলো দেয়াল তুলে ঢেকে দিয়েছিলেন। তুর্কিরা চলে যাবার পর যে বুলগেরীয় সরকার আসে তারা মসজিদের ভেতরকার দেয়ালগুলো ভেঙ্গে দিয়ে মূল দেয়ালগুলোর চিত্র সুরক্ষার ব্যবস্থা করে এবং মসজিদটিকে একটি দর্শনীয় স্থান হিসেবে যাদুঘরে রূপান্তরিত করে। মসজিদের নিকটেই একটি কবরস্থানে পাথরে বাঁধান কয়েক শতাব্দীর আগের কবরগুলো প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য দিচ্ছে। কয়েকটা কবরের সামনে পাথরের স্লাবের উপরে তুর্কি পাগড়ি স্থাপিত হয়েছে। পাগড়িগুলো পাথর খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে। পাগড়ির চিহ্ন দেখে বোঝা গেল এগুলো পুরনো দিনের কোন সূফী শেখের কবর। কবরস্থানে ঘুরছি, এমন সময় দেখলাম কতকগুলো লোক খাবারের বাক্স হাতে করে এনে কবরগুলোর

www.pathagar.com

সামনে এসে গল্প করতে লাগল। তারপর খাবারগুলো নিয়ে উঠে চলে গেল। দোভাষীকে জিজ্ঞেস করায় সে বলল যে এ লোকগুলো নিকটের কোন ফার্মে কাজ করে। সম্ভবত বিশ্রাম নেয়ার জন্য এখানে এসেছিল। আমি দোভাষীর কথায় একমত হলাম না। আমি বললাম, "আমাদের দেশে এবং মোটামুটি ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান ভক্তরা পীর-ফকিরের মাজার জিয়ারত করে। অনেকেই সেখানে খাবার-দাবার রেখে আসে। সেগুলো দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। আমার মনে হয় তোমাদের এখানে যা দেখলাম সেটা প্রায় একই জিনিস। যারা কবরস্থানে এসেছিল তারা কেন এসেছিল, কি কারণে এসেছিল জানি না, কিন্তু অতীতের একটা প্রথা পালন করে চলে গেল মাত্র।"

সামোকোন শহরে পাথরের তৈরি একটা তুর্কি হাম্মামখানা আছে। এটাও এ শহরের একটি দর্শনীয় স্থান। মসজিদ থেকে এগিয়ে একটু সামনে গেলে বাঁ দিকে একটি মিষ্টির দোকান। সাইনবোর্ডে স্লাভোনিক অক্ষরে হালুয়া শব্দটি লেখা আছে। তুর্কি ভাষার এ শব্দটি বুলগেরীয় ভাষায় ঘনিষ্ঠভাবে গৃহীত হয়েছে। দোকানের ভিতরে দেখলাম নানা স্বাদের নানা রকমের হালুয়া বিক্রি হচ্ছে। তুর্কিরা এদেশের মানুষের খাদ্য রুচির বেশ পরিবর্তন করে গেছে। দোকানটি দেখে তাই আমার মনে হল।

এখান থেকে আমরা আলেকো পাহাড়ের নিভৃতে একটি ছোট্ট জায়গায় এলাম। এখানে একটি রেস্তোরাঁয় আমরা দুপুরের খাবার খেলাম। রেস্তোরাঁয় প্রচুর ভিড় দেখলাম। নানা দেশের ট্যুরিস্টরা এখানে জড়ো হয়েছে। আমার ও আমার সঙ্গী দুজনের খাবারের অভাব হল না। এখানে শুধু শূকরের মাংস পাওয়া যায়। আমার জন্য পনির দেয়া একটা মোটা রুটি তৈরি করে দিল। আমি বাধ্য হয়ে কিছু কাঁচা সবজির সঙ্গে সেটাই খেলাম। আমি বুলগেরিয়ায় গরু এবং খাসীর মাংসের প্রচলন দেখিনি। সব জায়গাতেই শূকর, কোন কোন জায়গাতে মুরগীও পাওয়া যায়। তবে রাজধানী সোফিয়ায় সব রকমের খাবারই পাওয়া যায়। আরো কিছু দূর গিয়ে আমরা পেরু টিজা বলে একটি জনপদ পেলাম। এখানে কৃষি সম্পদের একটি যাদুঘর আছে। যাদুঘরে প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং উপকরণের বিপুল সংগ্রহ আছে। যাদুঘরের একদিকে মাছ ধরার সরঞ্জামের একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে।

বিকেলের দিকে আমরা প্লোভদিভ নামক একটি পুরনো শহরে এলাম। ওসমানীয় ও তুর্কিদের আমলে এ শহরটি বুলগেরিয়ার রাজধানী ছিল। এখনো কিছু মুসলমান আছে। রাস্তায় তুর্কি টুপি মাথায় একজন বৃদ্ধকে আমি দেখলাম।

আমরা হোটেলে আমাদের হাত ব্যাগ রেখে মুখ হাত ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে শহর দেখতে বেরুলাম। এখানকার জামে মসজিদটি বেশ বড়, মসজিদটির সংস্কার চলছে দেখলাম। সরকারীভাবে এই সংস্কার কাজ চলছে। মসজিদের সঙ্গে একটি বড় ঘর রয়েছে। ঘরের বাইরে আল্লাহর প্রশংসাসূচক একটি আরবি বাক্য লেখা রয়েছে। তবে লেখাটি খুব অস্পষ্ট বলে পড়া গেল না। ঘরের মধ্যে কিছু বই-পুস্তক আছে, কিন্তু এইগুলো দেখাশোনা করবার কোন মানুষ চোখে পড়ল না।

www.pathagar.com

এ শহরে বুলগেরীয় জাতিসত্তার একটি যাদুঘর আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে তুর্কি আমলের পূর্ব পর্যন্ত, সকল সময়ের ইতিহাসের বিস্তৃত নিদর্শন এখানে আছে। আমি লক্ষ্য করলাম বুলগেরীয়রা যখনই নিজেদের ইতিহাসকে তুলে ধরে তখনই তুর্কি অধিকার কালটি বাদ রাখে। এই জিনিসটি আমার ভাল লাগেনি। ইতিহাসের সত্য কখনও হারিয়ে যাবার নয়। কিন্তু এদেশে লক্ষ্য করলাম ঃ হিংসা ও বিদ্বেষের কারণে তুর্কি নামই এরা উচ্চারণ করতে চায় না। ক্রোভদিভ শহরটি বেশ বড়। সোফিয়ার চেয়েও বড়। আমাকে জানান হল যে, এই শহরের সামগ্রিক বেষ্টনীর মধ্যে তিনটি উপশহর আছে এবং নয়টি গ্রাম আছে। শহরের রাস্তাগুলো বেশ প্রশস্ত, লোকজনের ভিড়ও বেশ। গাড়ি করে যেতে রাস্তার এক পাশে একটি খোলা মাঠে জিপসিদের একটি তাঁবু দেখলাম। এদেরকে এখানকার লোকেরা রোমানি ইন্ডিয়ান বলে। কেন বলে তা কেউ আমাকে বোঝাতে পারল না।

এ পর্যন্ত আমি বুলগেরিয়ায় কোথাও কোনও ভিখেরি দেখিনি। ক্রোভদিভ শহরের একটি দোকানের সামনে তুর্কি টুপি মাথায় একজন তুর্কি ভিখেরিকে দেখলাম।

২-৬-৭৫

আজ সকালে ব্রেকফাস্ট শেষে হোটেলের লাউঞ্জে যখন বসে আছি তখন স্যুট পরা এক মধ্যবয়সী পরিচ্ছন্ন লোক আমার পাশে এসে বসল। সে একবর্ণ ইংরেজি জানে না, কিন্তু আকারে-ইঙ্গিতে আমার পরিচয় নেবার চেষ্টা করল। সে জানতে চাচ্ছিল আমি কোন দেশী এবং ধর্ম কি। আমি যখন ইসলাম শব্দটি উচ্চারণ করলাম তখন লোকটির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং লোকটি 'আল্লাহু আকবর' বলে উঠল। লোকটি নিজের বুকে হাত রেখে দু'তিনবার বলে উঠল ইসলাম-ইসলাম। অর্থাৎ সে যে মুসলমান সে কথা বোঝাতে চাইল। এতক্ষণ লাউঞ্জে কোন লোক ছিল না। যেই কয়েকজন লোক ঢুকল লোকটি দ্রুত আমার পাশ থেকে উঠে দূরের একটি চেয়ারে বসল।

সকাল সাড়ে ৯টায় আমরা ক্রোভদিভ ছেড়ে ভার্নার পথে অগ্রসর হলাম। ভার্না একটি পৃথিবী বিখ্যাত সমুদ্র পোত। যাবার পথে বুরগাছ সমুদ্র বন্দরে আমরা কিছুক্ষণের জন্য থামলাম। বুরগাছ প্রাচীন বন্দরটি বুলগেরীয়ার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সমুদ্র বন্দর। সমুদ্র তীরে যাবার পথে রাস্তার দু'পাশে মেলা বসেছে দেখলাম। আমার দোভাষী জানাল যে, এখানে প্রত্যহই মেলা বসে। মেলায় দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা হস্তশিল্পের নিদর্শন নিয়ে আসে। এই নিদর্শনগুলোর মধ্যে হাতে তৈরি রঙিন কাপড়, রুপার অলঙ্কার এবং কাঠের সামগ্রী বিক্রি হয়। আমরা কিছুক্ষণ এই মেলা ঘুরে ফিরে দেখলাম। হাতের তৈরি জিনিসের দাম এখানে খুব বেশি। আগ্রহ থাকলেও কেনার সামর্থ্য ছিল না। এখান থেকে আমরা গেলাম নেসেবার নামক এক শহরে। এই শহরটি অত্যন্ত প্রাচীন, খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে গ্রীকরা এই শহরটি নির্মাণ করে। সে সময়কার কিছু দেয়াল এবং অট্টালিকার নিদর্শন এখনও আছে। নেসেবায়ের একটি রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাবার খেলাম। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ভার্নার পথে রওয়ানা দিলাম। ভার্না বেশ দূর। প্রায় ৪ ঘন্টা লাগল ভার্নায় পৌছতে। সন্ধ্যা ৭ টায় ভার্নায় পৌছলাম এবং হোটেল ভার্নায় উঠলাম।

www.pathagar.com

হোটেলে উঠেই গোসল সেরে নিলাম। তারপর আমরা রাতের খাবারের জন্য একটি জনাকীর্ণ রেস্তোরাঁয় বসলাম। রেস্তোরাঁয় বহু বিদেশী দেখলাম। এদের মধ্যে জাপানি আছে, ফরাসি আছে। এক রাশান ভদ্রলোক আমাদের টেবিলের কাছেই বসেছিলেন। তিনি আমাকে দেখে কৌতূহলবশত কাছে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। খাবার শেষে আমরা সমুদ্র সৈকতে গিয়ে বসলাম। সমুদ্র সৈকতটি বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত। সেখানে বসবার জন্য বেঞ্চ আছে। বহু নারী-পুরুষ সেখানে বসে আছে এবং সবাই সমুদ্রের গর্জন শুনছে। রাত ১২টায় হোটেলে ফিরে এলাম।

৩-৬-৭৫

আজ আমাদের ফেরত যাত্রা। সকাল সাড়ে ৮টায় রওয়ানা দিয়ে রাত ৮টায় সোফিয়ায় ফিরে এলাম। এবার আমার জন্য জায়গা রাখা হয়েছে হোটেল বুলগেরিয়া নামক একটি হোটেলে। আমার থাকবার জন্য একটা স্যুইট দেয়া হয়েছিল – এখানে একটি শয়নকক্ষ, একটি ড্রইং রুম এবং একটি কনফারেন্স রুম ছিল। একরাতের জন্য এতবড় ঘরের প্রয়োজন ছিল না। রাত সাড়ে ৮টায় এই হোটেলে সরকারীভাবে আমাকে ফেয়ারওয়েল সাপার দেয়া হল। সাপারে যোগ দিলেন একজন মহিলা উপমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিভাগের ডাইরেক্টর এবং একজন একাডেমিশিয়ান। খাওয়ার আগে বক্তৃতা হল। আমাকেও কিছু বলতে হল।

৪-৬-৭৫

আজ ১১টার সময় এ্যারোফ্লোটে সোফিয়া বিমান বন্দর থেকে মস্কোর পথে রওয়ানা হলাম। বুলগেরিয়ার সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের লোকজন বিমানবন্দরে আমাকে বিদায় দিতে এসেছিলেন। সরকারীভাবে এঁরা কিছু উপহার আমাকে দিলেন। এর মধ্যে ছিল বই। হাতে তৈরি কিছু রঙিন কাপড়ও পেলাম। বাদাম কাঠের একটি সালাদ পাত্র, একটি ফুলদানি এবং রুপোর একটি পেয়ালা তারা আমাকে দিলেন। পেয়ালার গায়ে ফিরোজা পাথর লাগান ছিল।

মস্কোতে পৌঁছলাম ২টা ৫৫ মিনিটে। টিকেট চেক করার পর আমাকে উপরতলায় ডিপারচার লাউঞ্জে যেতে বলা হল। আমার হাতে খাবারের একটি টিকেট দেয়া হল। আমি উপরে উঠবার সিঁড়ির দিকে যাচ্ছি তখন এক সুইস ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করল যে, আমি কোথায় যাব? আমি ঢাকায় যাচ্ছি শুনে ভদ্রলোক বললেন, প্লেন তো ছাড়বে রাত ১২টা ২৫ মিনিটে। এত আগে উপরের জেলখানায় বন্দী হয়ে লাভ কি? তার চেয়ে বরং নিচেই খোলা জায়গায় কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করি এবং লোকজনের আসা-যাওয়া দেখি। আমিও একই প্লেনে যাব – আমার গন্তব্যস্থান বোম্বে। এ সময় একজন ভারতীয় ভদ্রলোককে সেখানে দেখলাম। ভদ্রলোকের নাম প্রফেসর বীরেন্দ্র গৌর। তিনিও বোম্বে যাচ্ছেন। আমরা তিনজন কিছুক্ষণ অ্যারাইভাল লাউঞ্জে বসে কথাবার্তা বললাম। পরে সাড়ে ৩টার দিকে সিকিউরিটি চেক অতিক্রম করে উপরে ডিপারচার লাউঞ্জে গিয়ে বসলাম। ডিপারচার লাউঞ্জে বেশ ভিড়। আমরা

www.pathagar.com

কোনমতে জায়গা করে নিলাম। আমাদের কাছে তিন/চারটি অল্প বয়সী মেয়ে ছিল। তারা কলকণ্ঠে কথা বলছিল এবং হাসছিল। তাদের প্রত্যেকের হাতে দেখলাম কাগজের ব্যাগে টাটকা পাকা খেজুর। খেজুরগুলোর দিকে আমার চোখ পড়াতে একটি মেয়ে এগিয়ে এসে আমাদের তিনজনের হাতেই কয়েকটি করে খেজুর দিল। খেজুরগুলো অসাধারণ মিষ্টি এবং রসালো। ডিপারচার লাউঞ্জে বিক্রয়ের জন্য কিছু জিনিসপত্র আছে দেখলাম। এগুলোর মধ্যে টিনের কৌটায় রাখা ক্যাবিয়াই বেশি। ক্যাভিয়ার পৃথিবীতে দুটো দেশে উৎপাদিত হয় – একটি হচ্ছে ইরান অপরটি রাশিয়া। কাস্পিয়ান সাগরে স্টারজিয়ন নামে এক রকম মাছ পাওয়া যায়। ক্যাভিয়ার হচ্ছে সে মাছের ডিম। এগুলোর অসম্ভব দাম।

আমি বিকেলের দিকে আমার সঙ্গী দুজনকে বললাম যে এখন বোধ হয় খেতে যাওয়া যায়। সুইস ভদ্রলোক বললেন, "এরা আমাদেরকে একটি করে মাত্র খাবার কার্ড দিয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে একটু হিসেব করে চলা দরকার। একটু খিদে সহ্য করে সন্ধ্যার পর রেস্তোরাঁয় যাওয়া যাবে।" লাউঞ্জে পশ্চিম দিকে বেশ বড় একটি রেস্তোরাঁ। রেস্তোরাঁটির নাম শেরে মেৎজেভো। প্রফেসর বীরেন্দ্র বললেন, "নামটা শাহেবজাদী রাখলেই পারত"। সন্ধ্যার পর আমরা রেস্তোরাঁর ভেতরে গেলাম। সুইস ভদ্রলোক পরামর্শ দিলেন যে, আমরা আমাদের খাবারের কার্ডটি প্রথমেই দেখাবো না। খাওয়া-দাওয়া শেষে ওদের হাতে কার্ডগুলো দিলেই চলবে।" আমরা স্যুপ খেলাম, শিক কাবাব এবং পোলাও খেলাম। খাওয়া শেষ করে ওয়েট্রেসের হাতে খাবারের কার্ডগুলো দিলাম। কার্ডগুলো পেয়ে ওয়েট্রেস মহাখাপ্পা। সে বলল, "তোমরা বেশি খাবার খেয়ে ফেলেছ, কার্ডের মধ্যে যে দাম ধরে দেয়া হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি।" সুইস ভদ্রলোক আমাদের হয়ে বললেন, "আমরা বিদেশী লোক, অতসব নিয়ম-কানুন জানি না। আমরা কার্ডটা পড়েই দেখিনি।" ওয়েট্রেস বলল, "তোমরা রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে যাও। খাবার শেষে ডেজার্ট দেয়া হয় তা তোমাদের দেয়া হবে না। এমনিতেই তোমরা বেশি খেয়ে ফেলেছ।" খাওয়া শেষ করে লাউঞ্জে এসে শুধু সময় গণনা করতে লাগলাম।

৫-৬-৭৫

রাত ১২টা ২৫ মিনিটে অর্থাৎ পাশ্চাত্যের হিসেবে সকাল ১২টা ২৫ মিনিটে ঢাকার পথে অ্যারোফ্লোট রওয়ানা দিল। বাগদাদে পৌঁছল ভোর ৪টায়। এখানে প্লেন ঘন্টাখানেকের জন্য থামল। আমাদের কিন্তু প্লেন থেকে নামতে দেয়া হল না। এখানে প্লেনের মধ্যে আমাদের খাবার সার্ভ করল। মুরগীর রোস্ট ছিল এবং আলু সিদ্ধ ছিল। সবশেষে খেজুরের হালুয়া পরিবেশন করা হল। বাদাম-পেস্তা দেয়া এই হালুয়াটি ছিল খুবই সুস্বাদু। বাগদাদ থেকে আমরা এলাম বোম্বেতে। আমার সঙ্গী দুজন বোম্বেতে নেমে পড়ল। আমি এয়ারপোর্ট থেকে এক প্যাকেট আল ফানস আম কিনলাম। এটি ভারতের একটি বিখ্যাত আম। আমাদের প্লেন ঢাকায় নামল মস্কো সময় ১টা ৩০ মিনিটে। বুলগেরীয় দূতাবাসের আইভান গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিল।

www.pathagar.com

৬-৬-৭৫

ঢাকায় আলী নকীর বাসায় উঠলাম। সেখানে দেখা করতে এলেন মোস্তফা নূরউল ইসলাম, ডঃ মনিরুজ্জামান, ডঃ সেলিম এবং হালিমা খাতুন।

বিকেল বেলা কয়েকজনের বাসায় দেখা করতে গেলাম।

৭-৬-৭৫

আজ সকাল ১০টায় গুলশানে বুলগেরীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম।

আমার বুলগেরীয় ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা শুনে তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। আমি তাঁকে জানালাম যে, এই ভ্রমণের ওপর ভিডিও করে আমি কয়েকটি লেখা পত্রিকায় ছাপাব। বিকেলে সরদার ফজলুল করিম, এরশাদ কোরেশী, আবু জাফর এবং মনসুর মুসা দেখা করতে এল।

৮-৬-৭৫

খুব সকালে আরজ আলী দেখা করতে এল। তাকে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে। হিসাব-নিকেশের খুব কড়াকড়ি করায় কন্ট্রাক্টররা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। আমার ছোট ছেলে ঢাকায় থাকে তাকে সঙ্গে নিয়ে কলাবাগানে আমার বাসা দেখতে গেলাম। একটি ব্যাংকের কাছে বাসাটি ভাড়া দেয়া হয়েছিল। ব্যাংকের এক ম্যানেজারের বাসায় থাকার কথা। কিন্তু আমি দেখলাম যে, সে ভদ্রলোক সেখানে থাকছেন না। থাকছে কয়েকজন পিয়ন এবং কয়েকজন নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারী। আমার সঙ্গে ব্যাংকের যে চুক্তি হয়েছিল, এটা সেই চুক্তির বরফেলাফ। আমি বাসায় ফিরে ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে টেলিফোন করে ক্রোধ প্রকাশ করলাম এবং অবিলম্বে বাসা ছেড়ে দিতে বললাম।

সন্ধ্যা ৭টার দিকে ডঃ সালাহউদ্দিন দেখা করতে এলেন।

৯-৬-৭৫

স্ত্রীকে নিয়ে সকাল সাড়ে ৭টায় উল্কায় চট্টগ্রাম যাত্রা করলাম। চট্টগ্রামে পৌছলাম ৫-৩০ মিনিটে। ক্যাম্পাসে পৌছেই কেমন এক প্রকার আনন্দ উত্তেজনার আভাস পেলাম। শুনলাম বঙ্গবন্ধু ১৪ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন এবং সেই জন্য সাজানো-গোছানো চলছে। তিনি বেতবুনিয়া স্যাটেলাইট উদ্বোধন করতে আসছেন এবং আশা করা যাচ্ছে বেতবুনিয়া যাওয়ার পথে ক্যাম্পাসে অল্পক্ষণের জন্য থামবেন। সত্যিই তিনি ক্যাম্পাসে নামবেন কি-না সে কথা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারল না। সন্ধ্যায় সামসুল আলম দেখা করতে এলেন। তার কাছে শুনলাম যে, বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে আসছেন না, তবে তাঁকে আনার ব্যাপারে মুজিববাদী ছাত্রদল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

১০-৬-৭৫

বঙ্গবন্ধুর চট্টগ্রাম আগমন উপলক্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলাম। অর্থনীতি বিভাগের একজন অধ্যাপক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বললেন, "ইমারজেন্সি ঘোষণার পর থেকে দেশের সরকার জনসাধারণের সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে। একজন নাগরিকের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে তা পুরোপুরি লুপ্ত হওয়ার পথে।" ভদ্রলোক বিশেষ করে বললেন যে, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে থেকে দেশের অবস্থা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারি না। ভদ্রলোক ঢাকায় তার সাম্প্রতিক অবস্থানকালে একটি খবর আমাকে দিলেন। বললেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে কয়েকজন শিক্ষক তাস খেলার অবসরে দেশের প্রশাসন সম্পর্কে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। এ খবরটি অল্পক্ষণের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর কানে পৌঁছেছিল। ভদ্রলোক বললেন যে, এভাবে চলতে থাকলে অল্পদিনের মধ্যেই দেশটি স্বৈরতান্ত্রিক পুলিশ স্টেটে পরিণত হবে। বর্তমানে যেহেতু দেশে একটি দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে তাই জনসাধারণ শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সময় পাচ্ছে না। ভদ্রলোকের কথায় আমি কোন মন্তব্য করলাম না।

১১-৬-৭৫

চট্টগ্রাম শহরে আজ বইঘর-এর মালিক সৈয়দ মোহাম্মদ শফির ওখানে গেলাম। শফি আধুনিক সময়ের মানুষ হলেও নিজের পুস্তক প্রকাশনা এবং আনুষঙ্গিক ব্যবসা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে মাথা ঘামায় না। তবে যারা তার ওখানে আসে তারা নানা বিষয়ে কথা বলে থাকে। আমার অসুবিধা হচ্ছে কোথাও কোন আলোচনা হলে এবং সে আলোচনায় আমার অংশগ্রহণের সুযোগ থাকলে আমি অংশগ্রহণ করে থাকি। আমি চুপ করে থাকি না। এর ফলে আমি দেখেছি আমার সম্পর্কে অনেক কথা রটনা করা হয় যা সত্য নয়। আমার স্ত্রী সব সময় এ ব্যাপারে আমাকে শাসন করে থাকেন। আমি মানবার চেষ্টা করি কিন্তু সব সময় মানা হয় না।

১২-৬-৭৫

ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স এবং এম. এ-এর দুটি প্রশ্নপত্র তৈরির ব্যাপার ছিল। আজ এগুলো তৈরি করে ডাকে পাঠিয়ে দিলাম। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' সম্পর্কিত রচনায় নতুন করে হাত দিলাম।

বিকেলে আমার এক পুরনো ছাত্রী তপতীর বাসায় এলাম। তপতীর স্বামী একজন মটর মেকানিক। ভদ্রলোক বেশিদূর লেখাপড়া করেননি। কিন্তু স্ত্রীকে এম. এ পর্যন্ত পড়িয়েছেন। তপতী জানাল যে, সে কবি নবীনচন্দ্র সেনের ওপর গবেষণা করতে চায়। সে ইতোমধ্যেই নবীনচন্দ্রের বইগুলো যোগাড় করেছে এবং পড়াশোনা আরম্ভ করেছে। তপতীদের ওখান থেকে চিত্তবাবুর বাসায় গেলাম। চিত্তবাবুর স্ত্রী আমাকে দেখে খুবই খুশি হলেন এবং অনুযোগ করলেন কেন আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে আসিনি।

www.pathagar.com

১৩-৬-৭৫

আজকে কোন ক্লাস ছিল না। বাসায় বসে সময় কাটালাম। সন্ধ্যার সময় মুজিববাদী ছাত্রদলের কয়েকজন নেতা আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তারা জানাল যে, আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং সড়কের মুখে বেতবুনিয়া যাবার পথে বঙ্গবন্ধু গাড়ি থামাবেন এবং ওখানে দাঁড়িয়েই ছাত্রদের উদ্দেশে কিছু বলবেন। ছাত্ররা আমাকে সেখানে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানাল।

১৪-৬-৭৫

আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর সড়কে ছাত্র ও শিক্ষকরা এক সঙ্গে জড়ো হয়েছে। উপাচার্য আবুল ফজল সাহেব ছিলেন। মোহাম্মদ আলী এবং আমি ছিলাম। আমরা সামনে ছিলাম; অনান্য শিক্ষক এবং ছাত্ররা পেছনে ছিল। সড়কের মুখে পুলিশ পাহারা ছিল। বঙ্গবন্ধুর গাড়ি এসে থামল দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। তিনি গাড়ি থেকে নামলেন বটে, কিন্তু কোন বক্তৃতা করলেন না। ইশারায় জানালেন যে, তার গলা বসে গেছে। আমার দিকে তাকিয়ে আমার বুকের দিকে ইঙ্গিত করে ইশারায় জানতে চাইলেন আমার হৃদযন্ত্রের অবস্থা কি রকম। আমি এতে খুবই অভিভূত হলাম। ১৯৭২ সালে আমি একবার পিজিতে ভর্তি হয়েছিলাম তখন তিনি আমাকে দেখতে এসেছিলেন। এতদিন পর অসুস্থতার কথা তাঁর মনে আছে দেখে আমি অবাক হলাম।

১৫-৬-৭৫

অকস্মাৎ আজ শরীরটি কেন যেন বিকল হল। এ রকম আমার মাঝে মাঝে হয়। আবার সেরে উঠি এবং পূর্ণ তৎপরতায় কাজ করতে আরম্ভ করি। ব্যাধি আমাকে কখনও গ্রাস করতে পারে না। বিধাতার কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে ভাল থাকবার প্রেরণা দিয়েছেন। কর্মের মধ্যে থাকলে আমি স্বস্তিতে থাকি। আমার মনে হয় মানুষ নিজের ইচ্ছাশক্তির বলে ব্যাধি-তাপ উত্তীর্ণ হতে পারে। আমার স্ত্রী এ ক্ষেত্রে সব সময় আমাকে সাহায্য করেছেন। আমি যে অসুস্থ এ বোধটা আমার যেন না জন্মায় সে জন্য সব সময় তিনি চেষ্টা করেন। আমি এ কারণে তাঁর সান্নিধ্যে বিরাট একটা নির্ভরতা পাই।

১৬-৬-৭৫

আজকে 'ব্রজাঙ্গনা' সংক্রান্ত রচনাটি শেষ হল। আমি প্রথম প্রথম মধুসূদনের কাব্যটিকে তেমন গুরুত্ব দেইনি। কিন্তু আলোচনা করতে গিয়ে আমি আবিষ্কার করলাম যে, এটি অসাধারণ কাব্য। অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে তিনি ব্রজের লীলাকাণ্ডকে বাংলা ভাষার পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য করেছেন। আন্তরিকতায় দীপ্যমান অথচ অনেকটা নিরাভরণ উচ্চারণে এ গানগুলো তিনি রচনা করেছেন। মধুসূদন মহাকবি – এটা স্বীকৃত তথ্য। কিন্তু মধুসূদন যে অসাধারণ লিরিকধর্মী কবিও, 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য পাঠ করলে তা বোঝা যায়।

www.pathagar.com

১৭-৬-৭৫

ঢাকা থেকে সরদার ফজলুল করিম এসেছে। ঢাকার কথা জিজ্ঞেস করায় সে বলল যে, ঢাকায় কিছুসংখ্যক আইনজীবী এবং বুদ্ধিজীবীরা মিলে 'কমিটি ফর সিভিল লিবার্টিজ এন্ড লিগ্যাল এইড' নামক একটি সংস্থা গঠন করেছিল। সে সংস্থার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অথবা থাকলেও তা কাগজে বেরোয় না। সে এ নিয়ে বেশি আলোচনা করল না। সে আমার শিক্ষক রাজ্জাক সাহেব সম্পর্কে জানাল যে, তিনি ভালই আছেন।

আমি বাংলা বিভাগের কিছু কাজকর্ম নিয়ে আবুল ফজল সাহেবের সঙ্গে তাঁর অফিসে দেখা করলাম। ফজল সাহেব হাসিমুখে আমার কথাগুলো শুনলেন। কিন্তু কোন মন্তব্য করলেন না। আবুল ফজল সাহেবকে নিয়ে অসুবিধা হচ্ছে তিনি যখন কিছু বোঝেন না তখন তিনি চুপ করে থাকেন এবং মিষ্টি হাসেন। তবুও যেহেতু তিনি ভাইস চ্যান্সেলর তাই তাঁর দৃষ্টিতে সব কিছু আনা দরকার বলে আমি মনে করি। তাঁর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমি দেখেছি যে, তিনি নিজের অধিকার সম্পর্কে খুব সজ্ঞান। আত্মীয়-স্বজনকে চাকরি দেয়াও এই ক্ষমতার মধ্যে পড়ে বলে তিনি মনে করেন।

১৮-৬-৭৫

আজ মধুসূদনের সনেট সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করলাম। অনার্স তৃতীয় পর্ব এবং এম. এ প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে সব ছেলেমেয়েদের একত্র করে এ আলোচনাটি উপস্থিত করলাম। আমি মধুসূদনের সনেটের বিষয়বস্তুর ওপর গুরুত্ব দিলাম বেশি। সনেটগুলোর মধ্যেই মধুসূদনের মাতৃভূমি প্রীতি অসাধারণ দীপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বিকেলবেলা বাসায় আউয়ালের স্ত্রী দেখা করতে এল। এ মহিলা গৃহকর্মে খুবই নিপুণা এবং আন্তরিক।

১৯-৬-৭৫

আজকে বিভাগীয় কাজকর্মে খুবই ব্যাপৃত ছিলাম। বিভাগের কাজ শেষে গ্রন্থাগারে গ্রন্থগারিক হিসেবে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারকে গড়ে তুলেছেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং আন্তরিক।

২০-৬-৭৫

আজ বাংলাদেশ বিমানে সকালের ফ্লাইটে ঢাকায় এলাম। আগামীকাল বাংলা একাডেমীতে একটি সভা আছে। ঢাকায় আলী নকীর বাসায় উঠলাম। সকালেই বুলগেরীয় দূতাবাসের ইভান আমার সাথে দেখা করতে এল। ইভান আগামীকাল সকালে দূতাবাসে আসতে বলল।

আলী নকীর বাসায় বসে মধুসূদনের সনেট সংক্রান্ত লেখাটি শেষ করলাম।

রাতে রফিকের বাসায় গেলাম। সেখান থেকে কয়েকজনকে ফোন করলাম।

www.pathagar.com

২১-৬-৭৫

সকাল ১০টায় বুলগেরীয় দূতাবাসে গেলাম। রাষ্ট্রদূত আমাকে একটি বুলগেরীয় উপন্যাস উপহার দিলেন। সঙ্গে দু'শিশি আতর। বুলগেরীয় আতর অত্যন্ত খাঁটি আতর। গন্ধটা খাঁটি গোলাপ ফুলের মত, বেশ হাল্কা। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী। একটি কাঠের কৌটার মধ্যে আতরের শিশিটি ঢুকান আছে। কৌটাটি মিনারের আকারে তৈরি করা। এক সময় তুর্কিরা বুলগেরিয়াতে যে ছিল তারই স্মারক চিহ্নের মত।

দুপুর ১টায় বাংলা একাডেমীর বৈঠকে যোগ দিলাম।

বিকেল ৫টায় ডঃ সেলিম, ডঃ এম. আই. চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, কাইয়ুম ভূঁইয়া, ইকবাল এবং আরজ আলী দেখা করতে এলেন।

২২-৬-৭৫

আলী নকীর বাসায় খবর এল যে, আমাদের বাড়ির দীর্ঘদিনের পরিচারিকা ময়নার মৃত্যু হয়েছে। ময়না দীর্ঘ জীবন পেয়েছিল। আমার নানীর সময় থেকে ময়না আমাদের পারিবারিক জীবনের মধ্যে আছে। প্রথমে ছিল আমার নানীর কাছে, পরে আমার মার কাছে এবং আমার ভাই আলী রেজার কাছে। ময়না পুরুষও ছিল না, মেয়েলোকও ছিল না। অনেকটা হিজড়ার মত। সারাজীবন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের সেবা করেছে।

বিকেল ৪টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের একটি কক্ষে ননফরমাল এডুকেশন কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট গৃহীত হল। এখন রিপোর্টটিতে আমার একটি ভূমিকা যাবে এবং অবশেষে পূর্ণ রিপোর্টটি সরকারের কাছে পেশ করতে হবে।

বিকেল ৫টায় শামসুল হক সাহেবের বাসায় চা খেলাম।

২৩-৬-৭৫

সকালে ওদুদুল হক এসেছিলেন। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা হল।

দুপুরে ইভানের বাসায় খেলাম। তার স্ত্রী বুলগেরিয়ায় প্রস্তুত টিনজাত মাছ নানা রকমের সব্জি দিয়ে রান্না করেছেন। খেতে খুব খারাপ লাগল না।

বিকেলে ডঃ ইসহাক দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি তবলীগ জামাত সম্পর্কে কিছু আলাপ-আলোচনা করলেন।

রাত ৮টায় ডঃ সালাহউদ্দিন এবং ডঃ আলাউদ্দিন আল আজাদ দেখা করতে এল।

২৪-৬-৭৫

আজ সকালে পি.জি. হাসপাতালে কর্নেল মালিকের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি আমার ইসিজি নিলেন এবং রক্তচাপ পরীক্ষা করলেন। জানালেন যে, আমি ভালই আছি। তবে চর্বি পরিহার করতে বললেন এবং টেনশন থেকে আমাকে মুক্ত থাকতে

www.pathagar.com

বললেন। আমি হেসে বললাম, আমার টেনশন মোটামুটি হয় না। কর্নেল মালিক বললেন, হয় না তবে হতেও পারে। চিন্তামুক্ত থাকলেই ভয়ের তেমন কারণ নেই।

বিকেল ৪টার বিমানে চট্টগ্রাম ফিরলাম। ড্রাইভার জব্বার গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিল। দেখলাম গাড়ি কোথাও ধাক্কা খেয়েছিল। তার ফলে সামনের একটি লাইট ভেঙে গেছে।

২৫-৬-৭৫

অডিট রিপোর্ট আলোচনার জন্য সকালে সিন্ডিকেট সভা বসল। অডিট আপত্তি নিয়ে একেক জন সদস্যের একেক রকম মন্তব্য শুনলাম। অডিটের প্রধান আপত্তি ছিল সিন্ডিকেটের অনুমতি ব্যতিরেকে এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় করার ব্যাপারে। আবুল ফজল সাহেব এ আপত্তিতে কোনই গুরুত্ব দিলেন না। তিনি খুব সহজে এবং নিশ্চিন্তে বললেন যে, এ রকম করার ক্ষমতা তার আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে হলে এ রকম ব্যবস্থা নিতেই হয়। সদস্যগণ একমত হলেন না। তারা বললেন, যেহেতু অডিট আপত্তির একটি উত্তর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যাবে সে উত্তরটা যুক্তিসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন। যাই হোক শেষ পর্যন্ত একটি কমিটি গঠিত হল। ঠিক হল যে, এই কমিটি অডিট আপত্তি পরীক্ষা করে দেখবে এবং আপত্তির একটি যুক্তিসঙ্গত জবাব প্রস্তুত করবে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সিন্ডিকেটের তিন ঘন্টা লাগল।

২৬-৬-৭৫

আজকে আবার সিন্ডিকেটের মিটিং। আজকের মিটিংটা নিয়মিত মিটিং। তর্কাতর্কির বিশেষ কোন সুযোগ ছিল না। তাও প্রায় আড়াই ঘন্টা লাগল মিটিং শেষ হতে।

দুপুর ২টায় ভাইস চ্যান্সেলরের পক্ষ থেকে সিন্ডিকেট সদস্যদের জন্য মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তুংফু রেস্তোরাঁয়। খাওয়া-দাওয়া শেষে কিছুক্ষণ গল্প গুজব হল। আবুল ফজল সাহেব খাওয়া শেষ করেই চলে গিয়েছিলেন শারীরিক অসুবিধার কথা বলে।

২৭-৬-৭৫

আজ সকালে এম. এ. প্রথম পর্বের পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বাংলা বিভাগে আলোচনা সভা ছিল।

বিকেলবেলা স্ত্রীকে নিয়ে ফৌজদারহাট সমুদ্র উপকূলে গেলাম। সমুদ্রকে খুব শান্ত দেখলাম। বঙ্গোপসাগর কখনই খুব বেশি তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হয় না। সমুদ্রের স্বাভাবিক ঢেউ যেমন থাকার কথা তেমনিই থাকে। এখানে তটপ্লাবিত উচ্ছলতা আমি খুব বেশি দেখিনি।

www.pathagar.com

২৮-৬-৭৫

আজ ঢাকা থেকে নাসির এসেছে। নাসির দীর্ঘকাল আমার গাড়ির ড্রাইভার ছিল। ১৯৬৪ সাল থেকে সে আমার সঙ্গে যুক্ত। মাঝে দু'একবার চলে গিয়েছিল আবার ফিরে এসেছে। চট্টগ্রামেও তাকে আমি নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু সে চট্টগ্রামে থাকতে চাইল না। নাসিরের অবস্থা ভাল। ঢাকায় বাড়ি আছে এবং টাকা-পয়সাও আছে। দীর্ঘদিন আমার সঙ্গে থাকার ফলে সে আমার বাড়ির একজন লোকের মতই হয়ে গিয়েছে। এখন যেখানে কাজ করে তাদের একটা নতুন গাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য সে চট্টগ্রামে এসেছে। যাওয়ার সময় নাসির বলল যে, আমি যদি কখনও ঢাকায় ফিরে যাই তাহলে সে আবার আমার কাজে যোগ দেবে।

২৯-৬-৭৫

আজ বিকেলে এ. কে. খান সাহেবের বাসায় খেলাম। কথায় কথায় তিনি প্রশাসনিক অব্যবস্থার কথা বললেন। তিনি বললেন যে, শাসন ক্ষমতা যে রাজনৈতিক দলের হাতে তারা যদি নিজেদের রাজনৈতিক দর্শনকে কার্যকর করতে না পারে তাহলে দেশের প্রশাসনে বিপর্যয় আসে। আমাদের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা না করেই সমাজতন্ত্রকে নিজেদের আদর্শ বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু এতদিনেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোন ব্যবস্থা তারা নিতে পারেনি। সমাজতন্ত্রের ব্যবস্থা রাতারাতি হয় না সেজন্য একটি প্রেক্ষাপট প্রয়োজন এবং সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। এর কোনটাই শাসকগোষ্ঠী করতে পারেননি। তাদের সমাজতন্ত্রের বুলি একটি হাস্যকর স্লোগানে পরিণত হয়েছে।

এ. কে. খান সাহেব দেশের কথা খুব ভাবেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা কখনই ঘটে না। তিনি এ ব্যাপারে দক্ষিণ কোরিয়ার উদাহরণ প্রায়ই দিয়ে থাকেন। আমি তাঁর কথা শ্রদ্ধার সাথে শুনি এবং তাঁর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হই।

৩০-৬-৭৫

আজ বাংলা এম. এ. শেষ পর্বের পরীক্ষা আরম্ভ হল। আমি বাংলা বিভাগে আমার কক্ষে বসে দুটি প্রবন্ধ সংশোধন করলাম। এর একটি হচ্ছে 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে রাবণ চরিত্রে পূর্ণতা। মধুসূদনের ওপর যে বইটি আমি তৈরি করতে যাচ্ছি সে বইটির জন্য আমার আগের লেখা এ দুটি সংশোধনী প্রয়োজন।

বাংলা অনার্সের দুটি ছেলে কবিতা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন নিয়ে আমার কাছে এল। আমি যতটা সম্ভব তাদেরকে কবিতার গঠন প্রকরণ বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলাম।

১-৭-৭৫

আজ দুপুরে সামসুল আলমের বাসায় খেলাম। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে তিনি দেশের অবস্থা নিয়ে কিছু মন্তব্য করলেন। বললেন যে, সর্বত্রই রুদ্ধশ্বাস অবস্থা। মানুষের

www.pathagar.com

স্বাধীন মতামত প্রকাশের কোথাও কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া ছাত্রদের মধ্যে, শিক্ষকদের মধ্যে এমন লোক থাকা বিচিত্র নয় যারা সব খবর সরকারের কাছে পৌঁছে দেবে। সব ক'টি খবরের কাগজ এখন সরকারের হাতে। আমি আলম সাহেবের বক্তব্যের জবাবে বললাম, "আল্লাহর ওপর যারা বিশ্বাস রাখেন তারা বলে থাকেন যে, কোন অন্যায় যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় তখন আল্লাহই তার অগ্রযাত্রা রোধ করেন এবং অন্যায়ের প্রতি বিধান করবেন। সুতরাং আমাদের আর একটু ধৈর্যধারণ করে অপেক্ষা করতে হবে।"

২-৭-৭৫

উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করবার জন্য। আমি সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে বাংলাদেশ বিমানে ঢাকায় এলাম। এবার আমার ভাগ্নে রফিকের বাসায় উঠলাম। দুপুরে বাংলা একাডেমীতে কিছুক্ষণের জন্য ছিলাম।

সন্ধ্যায় নারিন্দার শাহ্ সাহেব হযরত সৈয়দ নজরে ইমামের বাসায় দেখা করতে এলাম। ইনি একজন সত্যিকারের জ্ঞানবান এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে কথা বললে মনে শান্তি আসে এবং আশ্বাস পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল ধরে এঁর সঙ্গে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ইনি তাঁর চাচা এবং শ্বশুরের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং বর্তমানে চাচার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

৩-৭-৭৫

সকাল ১০টায় পশ্চিম জার্মানির রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম তাঁর অফিসে। আমি তাঁর কাছে জার্মানির বিভিন্ন শহরের ওপর যে সমস্ত পুস্তিকা আছে সেগুলো চাইলাম। আমি জার্মানিতে অনেকবার গিয়েছি, সেসব দিনের কথা লিখতে চাচ্ছি। সে জন্যই এ সমস্ত পুস্তিকা আমার দরকার।

সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে উপ-রাষ্ট্রপতির দপ্তরে দেখা করলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন জনাব শামসুল হক এবং ডঃ সেলিম। নন-ফরম্যাল এডুকেশন কমিটির রিপোর্ট আমি তার হাতে দিলাম এবং এ রিপোর্টটি কার্যকর করবার অনুরোধ জানালাম। তিনি বললেন যে, রিপোর্টটি প্ল্যানিং কমিশনে দেবেন এবং যাতে দ্রুত কার্যকর হয় সে নির্দেশ দেবেন। আমি বললাম এখন তো দেশে ইমারজেন্সি চলছে, এখন তো অতি সহজে এই রিপোর্ট কার্যকর করা যায়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সম্ভবত ভাবলেন যে, আমার কথায় ইমারজেন্সি অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ আছে। তিনি তখন বোঝাতে লাগলেন যে, দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির এত অবনতি ঘটেছিল যে, ইমারজেন্সি ঘোষণা ছাড়া আর উপায় ছিল না। অবস্থা ভালোর দিকে গেলেই তুলে নেয়া হবে। তিনি আমাদের সেন্ডুইচ খেতে দিলেন। সেন্ডুইচগুলো ভালই ছিল।

সন্ধ্যায় শওকত ওসমান দেখা করতে এলেন।

www.pathagar.com

৪-৭-৭৫

সকাল ৬টার প্লেনে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে ফিরলাম। বিমানবন্দরে আবুল ফজল সাহেবকে দেখলাম। তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য ঢাকায় যাচ্ছেন। সামান্য কুশল বিনিময়ের পর আমি বিদায় নিলাম। আমি লক্ষ্য করেছি যে, আবুল ফজল সাহেব সব সময় কোন না কোন বিপদের আশংকায় যেন চিন্তিত থাকেন। তিনি ভাবেন যে, যে কোন সময় তার চাকরি চলে যেতে পারে। কেন এ রকম ভাবেন আমি বুঝে উঠতে পারি না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'একজন শিক্ষক আছেন যারা তার কাছে প্রায়ই মনগড়া কিছু খবর পরিবেশন করেন যাতে তিনি শংকিত হয়ে পড়েন। আর তখনই ঢাকায় চলে আসেন সরকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা কৌতুককর মনে হয়।

৫-৭-৭৫

বাংলা বিভাগে এম. এ প্রাথমিক পর্বের পরীক্ষা চলছে। আমি কিছুক্ষণ বিভাগে থেকে বাসায় চলে এলাম।

৬-৭-৭৫

আজ সারাদিন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে সময় কাটালাম। বিকেলে চিত্তবাবুর বাসায় গেলাম। চিত্তবাবু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন দেখলাম। তিনি একটা বিশেষ সাধনমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। এ মণ্ডলীর নাম ওঁম মণ্ডলী। এই মণ্ডলীর লোকেরা প্রতিমা পূজা করে না, তারা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করে। যে কক্ষে উপাসনা করে সে কক্ষের দেয়ালে একটি চন্দ্রবিন্দু-সহ একটি ওঁ-কার ঝুলিয়ে রাখা হয়। এই ওঁ হচ্ছে ব্রহ্মের প্রতীক। চিত্তবাবু খুব সরল মানুষ। বিশ্বাসী এবং আত্মনির্ভর। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তার স্ত্রীর একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

৭-৭-৭৫

আজ আমার বিবাহ বার্ষিকী। বাসায় খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। আমার মেয়ে জামাই, আমার বড় ছেলে এবং শামসুল আলম ও তার স্ত্রী অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প-গুজব হল। শামসুল আলমের স্ত্রী একগুচ্ছ ফুল নিয়ে এসেছিলেন।

৮-৭-৭৫

পশ্চিম জার্মানির একটি প্রকাশন সংস্থার জন্য আমি এক সময় কিছু কাজ করেছিলাম। তাদের কাছে আমার টাকা পাওনা আছে এক হাজার মার্কের মত। কিন্তু তারা টাকা দিচ্ছে না। আমি সমস্ত বিষয়টি জানিয়ে জার্মান রাষ্ট্রদূত ডঃ রিটারের কাছে একটা চিঠি দিলাম। আর একটি চিঠি দিলাম সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে।

সিলেট কলেজের প্রিন্সিপাল কোরেশীর বাসায় এসেছেন। বিকেলে সেখানে কিছুক্ষণের জন্য বসলাম।

www.pathagar.com

৯-৭-৭৫

আজ দুপুরে লাইব্রেরিতে বেশ কিছুটা সময় কাটালাম। লাইব্রেরিয়ান সাহেব দুঃখ করে বললেন যে, আজ একটি প্রয়োজনীয় বইয়ের কয়েকটি পাতা কে যেন কেটে নিয়ে গেছে। যে ঘরে শিক্ষকরা বসেন সেই ঘরের সেলফে বইটি ছিল। সুতরাং কোন ছাত্র কেটে নিয়েছে এটা বলা যাবে না।

১০-৭-৭৫

আজ সকালে বুলগেরীয় দূতাবাসের ইভান টেলিফোন করল – আমার জন্য কিছু বই সোফিয়া থেকে এসেছে। সে আমাকে ঢাকায় এসে বইগুলো নিয়ে যেতে বলল। বইগুলোর অধিকাংশই নাকি বুলগেরিয়ার প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে। প্রত্নতত্ত্বের বই নিয়ে আমার কোন লাভ হবে কি-না বুঝতে পারছি না, বিশেষ করে বুলগেরিয়ার প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে।

১১-৭-৭৫

আজ সকালে নাসরিন এবং কোরেশীসহ আমি এবং আমার স্ত্রী, কোরেশীর ছোট ভাই খোকনের বাসায় এলাম। এখানে খাওয়া-দাওয়া করলাম এবং বিকেলে এখান থেকে মান্নানের বাসায় যাব।

১২-৭-৭৫

আজ লাইব্রেরিয়ান সাহেবের বাসায় মিলাদ পড়ান হল। মিলাদের শেষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমরা কেন মিলাদ পড়ি। আমি উত্তরে বললাম, "মিলাদ হচ্ছে পৃথিবীতে রাসূলের (স) শুভাগমন উপলক্ষে আনন্দ উৎসব। মিলাদের উদ্ভব ভারতীয় উপমহাদেশে, কিন্তু বর্তমানে এশিয়ার অন্যান্য মুসলমান দেশেও মিলাদের প্রচলন হয়েছে। এটা মূলত একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। কিন্তু আমরা এ অনুষ্ঠানকে ধর্মীয় পবিত্রতায় অভিষিক্ত করেছি। মিলাদে রাসূলের জন্মকাহিনী বলা ছাড়াও তাঁর উদ্দেশে অভিবাদন প্রদান করা হয়। এটা একটি সুন্দর অনুষ্ঠান এবং আমার মনে হয় পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমানরা এ অনুষ্ঠানটি মর্যাদার সঙ্গে পালন করতে পারে। কোন আরব দেশেই মিলাদের প্রথা নেই, কিন্তু মিসরে ফাতেহা দোয়াজদাহাম উপলক্ষে সারারাত কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা হয়। মিলাদে রাসূলের (স) প্রতি সালাম প্রদানের সময় সম্মানের সঙ্গে আমরা উঠে দাঁড়াই। এটাকে অনেকে অপব্যাখ্যা করেন। কিন্তু আমি এটাতে দোষের কিছু মনে করি না। আমরা এ কথা ভেবে উঠে দাঁড়াই না যে, নবীর (স) আত্মা এসে উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং সে আত্মার সম্মানে উঠে দাঁড়ান উচিত। আসলে এটা হচ্ছে রাসূলের (স) নামের প্রতি বিনীত শ্রদ্ধা প্রদর্শন।"

১৩-৭-৭৫

বুলগেরিয়ার মুসলমানদের সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখা শেষ করলাম। প্রবন্ধটি 'বাংলাদেশ টাইমস'-এর জন্য ইংরেজিতে লিখলাম। বুলগেরিয়ায় যখন গিয়েছিলাম

www.pathagar.com

তখন সরকারীভাবে নিযুক্ত এক গ্র্যান্ড মুফতির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, মূলত সেই বিবরণটি আমি এই প্রবন্ধে দিয়েছি। বুলগেরীয় দূতাবাসের ইভান এ রকম একটি প্রবন্ধ লিখতে বারবার অনুরোধ করেছিল। অনুরোধ করার পিছনে একটা কারণ আছে বলে মনে করি। তুরস্কের সঙ্গে বুলগেরিয়ার একটি মানসিক সংঘর্ষ অনেক দিন ধরে চলছে। বুলগেরিয়ার মুসলমানরা তুর্কি বংশোদ্ভূত। সে দেশে এদের কোন মানবিক অধিকার নেই এমন অভিযোগ তুর্কিরা করে থাকেন। সুতরাং আমি একটি প্রবন্ধ লিখে যদি সে দেশের মুসলমানদের অবস্থার একটি পরিচিতি দেই তাহলে সেটার দ্বারা অভিযোগ খণ্ডনের একটি সুযোগ থাকবে। আমার প্রবন্ধটি অবশ্য আমি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিনি, আমি একজন ভ্রমণকারীর দৃষ্টিতে যা দেখেছি তাই লিখেছি। এটা কারও পক্ষেও যাবে না, বিপক্ষেও যাবে না।

১৪-৭-৭৫

আজ বাংলা বিভাগে সকল শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের এক সঙ্গে ডেকে সাহিত্যের রূপ-রস এবং অঙ্গীকার বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিলাম। আমি লক্ষ্য করেছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের পাঠ যারা গ্রহণ করতে আসে তাদের অনেকের সাহিত্যবোধ নেই। তারা অন্যান্য বিষয়ের মত বাংলাকেও একটি 'বিষয়' হিসেবে পাঠ করতে চায়। কিন্তু সাহিত্যবোধ না থাকলে বাংলা পাঠ যুক্তিযুক্ত হয় না। এটা ভেবে আমি মাঝে মাঝে সবাইকে এক সঙ্গে করে সাহিত্যের সংজ্ঞা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করি। এটি আমার নিয়মিত ক্লাসের অতিরিক্ত। এ ক্লাসটি করে আমি আনন্দ পাই। আমি লক্ষ্য করেছি যে, এতে ছাত্র-ছাত্রীরাও আনন্দ পায়। কখনও কখনও অন্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরাও এ ক্লাসে যোগ দেয়।

১৫-৭-৭৫

কলকাতার মিত্র এন্ড ঘোষ প্রকাশনা সংস্থার একজন প্রতিনিধি আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তারা সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনাবলী প্রকাশ করতে চাচ্ছেন। একটি খণ্ডে আমার ভূমিকা যাবে। আমার লেখাটি আগেই তৈরি হয়েছিল, ভদ্রলোকের হাতে লেখাটি দিয়ে দিলাম। আমি মূলত মুজতবা আলীর চলিত ভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছি এবং তাঁর চটুল নাগরিক বৃত্তি নিয়ে বিশ্লেষণ করেছি। আমি মুজতবা আলীকে জানতাম। আমি যে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম তা নয়, তবে তিনি ঢাকায় এলে আমাকে ডেকে পাঠাতেন এবং দীর্ঘ সময় আমরা অম্ল-মধুর গল্পে লিপ্ত থাকতাম। মুজতবা আলী শুধু একজন সুচতুর লেখক ছিলেন তাই নয়, তাঁর জ্ঞানের গভীরতাও ছিল। অবশ্য গভীর পাণ্ডিত্যের কোন কিছু তিনি লিখে যেতে পারেননি। বিদেশে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে তিনি পিএইচডি করেছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে কোন গ্রন্থ তিনি আমাদের উপহার দিতে পারেননি। তিনি পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ দেখেছেন সে সমস্ত দেশের মানুষের পরিচয় অসাধারণ কুশলতার সঙ্গে উদ্‌ঘাটন করেছেন।

www.pathagar.com

১৬-৭-৭৫

বুলগেরিয়ার প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে যে তিনটি বই পেয়েছি সেগুলো আজ নাড়াচাড়া করলাম। যে তথ্য পেলাম, তাতে বিশ্বাস হল বুলগেরিয়া একটি অত্যন্ত প্রাচীন ভূখণ্ড। স্লাভ জাতির উদ্ভব এখানে এবং তুর্কি জাতির একটি শাখার বসতিও এ অঞ্চলে ছিল। একবার ভাবলাম এ বিষয় নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি। কিন্তু পরে আমার নিজের এ বিষয়ে জ্ঞানের অভাব আছে মনে করে অগ্রসর হলাম না। যখন বুলগেরিয়ায় গিয়েছিলাম তখন আমাকে সে অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলো দেখান হয়েছিল। কিন্তু সেই দেখাকে চূড়ান্ত দেখা বলে মনে করি না এজন্য গভীর অনুসন্ধান এবং গবেষণা প্রয়োজন। সে সময় আমার নেই, সে প্রয়োজনও আমার নেই। তবে আমি বুলগেরিয়ার ভাষা এবং লিপি নিয়ে আলোচনা লিখব। এ সম্পর্কে আমার কিছুটা ধারণা আছে।

১৭-৭-৭৫

আজ সকালে সিন্ডিকেট মিটিং ছিল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেটের সভায় উপস্থিত থাকতে আমার ভাল লাগে না। সভাপতি মিটিং ঠিকমত পরিচালনা করতে পারেন না এবং সে সুযোগে সবাই কথা বলা আরম্ভ করে। আমি সভায় উপস্থিত হয়ে আবুল ফজল সাহেবের কাছ থেকে শরীর ভাল নেই বলে রেহাই চেয়ে নিলাম।

বাসায় এসে কম্পটন ম্যাকেঞ্জির 'সিনিস্টার স্ট্রীট' উপন্যাসটি পড়া আরম্ভ করলাম। লেখকের সঙ্গে ১৯৫৬ সালে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল লন্ডনে ২৬তম পি.ই. এন কংগ্রেসে। কংগ্রেসের অনুষ্ঠানের ফাঁকে আমি ও হুমায়ুন কবীর ভদ্রলোকটির সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করেছিলাম। সে সময় ভদ্রলোককে মনে হয়েছিল উজ্জ্বল সদা হাস্যময় এবং সর্ববিধ চতুরতায় পারদর্শী। তিনি হুমায়ুন কবীরকে প্রশ্ন করেছিলেন, "প্রাচীন ভারতবর্ষে কামকলা নিয়ে প্রচুর রসাশ্রিত গবেষণা হত বলে শুনেছি, এখনও কি সেরকম হয়?" হুমায়ুন সহাস্যে উল্টো প্রশ্ন করেছিলেন, "আমি ইংরেজির ছাত্র। আমি দেখেছি চসার এবং স্পেনসার-এর কবিতায় নির্লজ্জ এবং মুক্ত কামচর্চার কাহিনী আছে, এখনও কি ইংল্যাণ্ডে সেসব চলে?" হুমায়ুন কবীরের পাল্টা প্রশ্নে কম্পটন ম্যাকেঞ্জি হাসতে লাগলেন। দীর্ঘদিন হয়ে গেল এখন আর কম্পটন ম্যাকেঞ্জি নেই। আমাদের দেশে তাঁর লেখার পাঠকও নেই। ইংরেজি সাহিত্য, বিশেষ করে কথা সাহিত্য এত দ্রুত এগিয়ে চলছে যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে কিছু কিছু লেখক পুরনো হয়ে যাচ্ছেন ও হারিয়ে যাচ্ছেন। ইংল্যান্ডে কম্পটন ম্যাকেঞ্জির প্রভাব কেমন জানি না কিন্তু আমাদের দেশে তার রচনার কোন চর্চা হয় না।

১৮-৭-৭৫

আজ দুপুরে মান্নান তার স্ত্রী খালেদাকে নিয়ে এসেছিল। দুপুরে আমাদের সঙ্গে খেল। মান্নান কথায় কথায় দেশের রাজনীতির কথা বলল যে, যারা রাজনীতির চর্চা করেন তারা খুব হতাশাগ্রস্ত। সবারই লক্ষ্য থাকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে উপস্থিত হবার।

www.pathagar.com

কিন্তু সেটা যখন হয় না তখন তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সে দু'একজন নেতার নাম করল যাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। তারা কেউ যেন মানসিক শান্তিতে নেই বলে মান্নান মন্তব্য করল। আমি এ আলোচনায় যোগ দিলাম না। আমি তার কলেজের কথা জিজ্ঞেস করলাম।

১৯-৭-৭৫

আজ 'বোখারী শরীফ'-এ রাসূলে খোদার একটি উক্তি আমাকে অভিভূত করল। তিনি বলেছেন, "ধারণা ও অনুমান নিয়ে তোমরা কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবার চেষ্টা কর না। কেননা ধারণা ও অনুমান হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিথ্যা। মানুষের দোষ অনুসন্ধান কর না এবং তার ত্রুটি অনুসন্ধানে গোপনে চেষ্টা কর না। একে অন্যকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা কর না, একে অন্যকে হিংসা কর না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইও না। সর্বোপরি তোমরা এক অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থেক না। বরঞ্চ তোমরা এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে একে অন্যের সঙ্গে ভ্রাতৃ সম্পর্কে যুক্ত হও।" আমাদের জীবনে সবচেয়ে বিচ্যুতি হচ্ছে আমরা রাসূলের এ নির্দেশগুলো মান্য করি না। এগুলো করলে আজ পৃথিবীর মুসলমানরা এক বিরাট সংঘবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। তার কারণ পাশ্চাত্য জগত সর্বদাই চেষ্টা করেছে মুসলমানকে পরস্পরের প্রতি বিবদমান রাখতে। ক্রুসেডের যুদ্ধে ইউরোপের সম্মিলিত বাহিনী সালাহউদ্দিনের হাতে পরাজয় বরণ করে। তখন থেকে পাশ্চাত্যের কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মুসলমান এবং ইসলামই হচ্ছে সমগ্র বিশ্বে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায়। এই অন্তরায়কে দূর করতে হলে পৃথিবীর মুসলমানকে সর্বাংশে দুর্বল করা প্রয়োজন। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হয় এবং ইসলামী খেলাফতের উচ্ছেদ ঘটে। তুরস্কের পরাজয়ের পর মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম সাম্রাজ্যকে পাশ্চাত্যের শক্তিবর্গ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয় এবং মুসলমানদেরকে একটি আত্মপরিচয়হীন জাতিতে রূপান্তর করবার নানাবিধ কলা-কৌশল প্রয়োগ করে, যে প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত আছে। রাসূলে খোদা এহেন সম্ভাব্য সর্বনাশের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। অথচ আমরা তার সাবধানবাণী এখনও শুনছি না।

২০-৭-৭৫

আজকে আলবার্ট ক্যামুর 'দি আউট সাইডার' বইটি পড়ি। এই উপন্যাসটি মানুষের অসহায়তার একটি অসাধারণ কথকতা। আলবার্ট ক্যামু অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আলজেরিয়ার মুসলমানদের চিনেছিলেন এবং সেখানকার ফরাসি খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে ভালভাবে জেনেছিলেন। তিনি আলজেরিয়ার মুসলমানদের প্রতিও সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাদের চরিত্র তিনি জানতেন এবং তাদের জীবনে নানাবিধ ইচ্ছা-অনিচ্ছার ভাবগুলো তিনি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্যারিসে আমি অনেকবার গিয়েছি এবং সেখানে অনেক লেখক-লেখিকার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে, কিন্তু ক্যামুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাইনি। তিনি নাটক নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন খুব বেশি। আবার

www.pathagar.com

রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। তাই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ আমি করতে পারিনি।

ইতালি থেকে প্রফেসর এনযো তুরবিআনীর একটি চিঠি পেলাম। ভদ্রলোক হিন্দী ও বাংলাভাষার একজন অভিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। এঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নাগপুরে বিশ্ব হিন্দী সম্মেলনে। সেখানে কেন জানি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে খুব অভিভূত হয়ে পড়েন এবং আমাকে মহাপুরুষ বলে চিহ্নিত করতে থাকেন। সম্ভবত মহাজ্ঞানী অর্থে কথাটা ব্যবহার করেছিলেন। আমার প্রতি বিনয় এবং শ্রদ্ধা এত অত্যধিক পরিমাণে গড়ে উঠেছিল যে, আমি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতাম। তাকে বারবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে, আমি একজন সাধারণ মানুষ, আমার মধ্যে এমন কোন উল্লেখযোগ্যতা নেই, যে জন্য আমি মহাপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারি। ভদ্রলোকের বাংলা অনেকটা হিন্দী ঢং-এ লেখা। তুরবিআনী মূলত হিন্দীর অধ্যাপক এবং সেই সূত্রে বাংলাভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন।

২১-৭-৭৫

আজ চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্রস্থলে যে বৌদ্ধ মঠ আছে সে মঠের অধ্যক্ষ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি তাঁদের মঠের একটি অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন। তিনি বললেন যে, বৌদ্ধ ধর্মে চিত্তের বিমুক্তি বিষয়ে যে তত্ত্ব আছে সে বিষয়ে আমি যদি একটু আলোকপাত করি তাহলে ভাল হয়। আমি বললাম, "দেখুন আপনারা আমাকে স্নেহ করেন বলে আমার কাছে অনেক দাবি নিয়ে আসেন। গৌতম বুদ্ধের বিষয়ে আপনারাই তো বলবার একমাত্র অধিকারী। আপনাদের ডাকে আমি সাড়া দেই বটে কিন্তু বড় বিব্রতবোধ করি।" ভদ্রলোক মুণ্ডিত মস্তক এবং গেরুয়াধারী। তিনি মৃদু হেসে আমাকে বললেন, "দেখুন, আমাদের ধর্মে নৈতিক উৎকর্ষ, মনোযোগ এবং জ্ঞানের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। আপনার মধ্যে এই তিনের সংযোগ ঘটেছে বলে আমি মনে করি। মহাপ্রভু বুদ্ধ একেই বলেছেন, 'চেত বিমুত্তি'। আশা করি আপনি অবশ্যই আমাদের অনুষ্ঠানে আসবেন।" আমি উত্তরে বললাম, "আপনার প্রশংসা আমি গ্রহণ করলাম না, কিন্তু আপনার অনুষ্ঠানে যাব বলে কথা দিলাম।"

২২-৭-৭৫

আজকে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। বিকেলবেলা সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। ভদ্রলোকের মুখে সূচালো দাড়ি, মাথায় টুপি এবং হাতে একটি ব্যাগ। ভদ্রলোক নিজের কোন পরিচয় না দিয়ে চেয়ারে বসেই ব্যাগ খুলতে খুলতে বললেন, "আমি আমাদের কিছু লিটারেচার আপনাকে দিতে এসেছি।" আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক কোন গোত্রের। আমি চুপ করে ভদ্রলোকের আচরণ দেখতে লাগলাম। তিনি ৫-৬টি পুস্তিকা বের করে আমার টেবিলের ওপর রাখলেন। আমি তাকিয়ে দেখলাম, কিন্তু পুস্তিকাগুলো স্পর্শ করলাম না। আমি বললাম, "আমার বাসায় কোরআন শরীফ আছে, বোখারী শরীফ আছে এবং ইমাম গাজ্জালীর গ্রন্থাদিও আছে। আমার আপনার লিটারেচারের

www.pathagar.com

প্রয়োজন নেই। আপনার লিটারেচার আপনি নিয়ে যেতে পারেন।" ভদ্রলোক লিটারেচার শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন বলে আমিও আমার কথায় তা ব্যবহার করলাম। ভদ্রলোক বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "আমাদের বইগুলো রাখতে আপনার অসুবিধা কি? পড়েও তো দেখতে পারেন? হয়তো আপনার উপকারেও আসতে পারে।" আমি সাধারণত ক্রুদ্ধ হই না। কিন্তু ভদ্রলোক 'উপকার' শব্দটি ব্যবহার করায় আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং বললাম, "বইগুলো আপনি রেখে যেতে পারেন, কিন্তু এগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলব। আর একটি কথা, আপনি ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আসবেন না এবং মুসলমানকে নুতন মুসলমান বানাবার চেষ্টা করবেন না।" ভদ্রলোক বইগুলো নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। বইগুলো ছিল কাদিয়ানীদের প্রচার পুস্তিকা।

আমার মনে পড়ল ১৯২৮ সালের দিকে আমার বাবা কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, আমরা তখন ধামরাইয়ে থাকি। কাদিয়ানীদের বিভ্রান্তিকর প্রচারণার বিরুদ্ধে বাবা সে সময় 'ধর্ম বিভ্রাট' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থ রচনার সময় প্রতিদিন বিকেলবেলা কয়েকজন আলেমকে নিয়ে বসতেন এবং তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। এই গ্রন্থের একটি কপিও আমার কাছে নেই। বাবা নিজে আরবি ফারসিতে সুপণ্ডিত ছিলেন, উর্দু অত্যন্ত ভাল জানতেন। তাঁর এ গ্রন্থটিতে গভীর জ্ঞান এবং অনুসন্ধিৎসার পরিচয় ছিল।

২৩-৭-৭৫

আজ এম. এ ফাইনাল পরীক্ষার্থীদের ভাইবা অনুষ্ঠান হল। ঢাকা থেকে প্রফেসর আহমদ শরীফ এসেছিলেন। দুপুরবেলা আমার বাসায় বিভাগীয় শিক্ষকগণ এবং শরীফ সাহেব এলেন। আমরা এক সঙ্গে খেলাম। রাতে আমার জামাতা কোরেশীর আত্মীয়া মিসেস জাফর ছিলেন এবং বাংলা বিভাগের অধ্যাপক দেলোওয়ার হোসেন ছিলেন। মিসেস জাফর খুব দ্রুত কথা বলেন এবং এক কথা শেষ হতে না হতেই অন্য কথায় চলে যান। তাতে অনেক সময় তার কথা অনুসরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে ভদ্রমহিলার কথাবার্তায় আন্তরিকতা আছে।

২৪-৭-৭৫

আজ সকালবেলা এম. এ শেষ পর্বের মৌখিক পরীক্ষা চলল। শরীফ সাহেব একটু বেশি প্রশ্ন করেন, অধিকাংশ প্রশ্ন করেন মধ্যযুগ সম্পর্কে। আবার মাঝে মাঝে মধ্যযুগের অজ্ঞাতনামা দু'একজন কবির নাম করেন এবং তাদের সম্বন্ধে জানতে চান। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক সময় বিভ্রান্ত হয় এবং উত্তর দিতে পারে না। বিভাগীয় প্রধান হিসেবে আমি শিক্ষার্থীদের কিছুটা সাহায্য করবার চেষ্টা করি। অসুবিধা হচ্ছে যে, ছাত্র-ছাত্রীরা কেন জানি মধ্যযুগে খুব বেশি আগ্রহ পায় না। কোন রকমে সাহিত্যের ইতিহাস পড়ে মধ্যযুগ সম্পর্কে অল্প কিছু জেনে নেয়। বর্তমান সময় জ্ঞানলাভের উপায় দাঁড়িয়েছে কোন রকমে নোট বই মুখস্থ করা। ছাত্র-ছাত্রীরা সর্বাংশে সাহিত্যের ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ করতে চায় না।

www.pathagar.com

২৫-৭-৭৫

আজও সকালে এম. এ শেষ পর্বের মৌখিক পরীক্ষা ছিল। দুপুরের পরীক্ষা শেষে বাংলা বিভাগ থেকে বেরিয়ে লাইব্রেরির দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল একদল অপরিচিত ছেলে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাছে যেতেই তারা আমাকে আদাব দিল এবং জানাল যে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছে এবং এক ধরনের আনন্দ ভ্রমণে। তাদের ভ্রমণ শেষ হবে কাপ্তাইয়ে। আজ তারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে এসেছে। ঢাকার অবস্থা কি জিজ্ঞেস করাতে এদের মধ্যে বেশ লম্বা একটি ছেলে বলল, "ঢাকায় বাংলাদেশের প্রশাসনকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান হচ্ছে। বিভিন্ন জেলার জন্য গভর্নর নিয়োগ হয়ে গেছে। সব ক'জন গভর্নর এখন ঢাকায়। এদের নানা রকম প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ দেবার দায়িত্বে আছেন শেখ ফজলুল হক মনি। একটি নতুন ধরনের স্বৈরশাসনের কায়েমী ব্যবস্থা করা হচ্ছে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমরা এখন কি করবে?" অন্য একটি ছেলে হাসিমুখে বলল, "আমরা পাস করে গভর্নর হবার চেষ্টা করব।"

বিকেলে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ফৌজদারহাট সমুদ্র সৈকতে গেলাম। ওখান থেকে ফেরার পথে মান্নানের বাসা হয়ে ক্যাম্পাসে এলাম।

২৬-৭-৭৫

আজ এম. এ-এর মৌখিক পরীক্ষা হল। বহিরাগত পরীক্ষক বিকেলবেলা পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখতে নিষেধ করেছিলেন বলে আমাদের বেশ ক'দিন ধরেই সকালবেলা পরীক্ষা নিতে হচ্ছে। আগামীকাল পরীক্ষার কাজ শেষ হবে।

দুপুরে দেলোওয়ারের বাসায় খেলাম। সে পরীক্ষা কমিটির সকল সদস্যকে খেতে ডেকেছিল। দেলোওয়ারের স্ত্রী খুব স্নেহশীলা রমণী। মানুষকে আপ্যায়ন করতে খুব ভালবাসেন।

২৭-৭-৭৫

আজ এম. এ শেষ পর্বের মৌখিক পরীক্ষা শেষ হল। বিকেলে চিত্তবাবু তার স্ত্রীকে নিয়ে আমাদের বাসায় এলেন। তিনি আমার জন্য তার ওঁম মণ্ডলীর একটি ছাপান গানের বই উপহার দিলেন। গানগুলো ওঁম মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা গুরুর লেখা। চিত্তবাবুর ধারণা ওগুলো রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির চেয়েও ভাল। চিত্তবাবুর ভক্তির আতিশয্য দেখে মনে মনে হাসলাম, মুখে কিছু বললাম না।

২৮-৭-৭৫

মিসরের প্রাচীন ভাস্কর্য বিষয়ে কয়েকটি বই আমার আছে। সেগুলো আজ নাড়াচাড়া করলাম। মিসর এক সময় যে সমৃদ্ধ সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল তার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন সভ্যতা পৃথিবীর অতীতে আর নেই। প্রাচীন মিসরের রাজতন্ত্র এবং পুরোহিততন্ত্রে সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছিল আপন সময়কালকে ভবিষ্যতের মানুষের জন্য

www.pathagar.com

চিরস্মরণীয়ভাবে চিহ্নিত রাখা। এই চিহ্নিতকরণের প্রচেষ্টায় তারা রাজা-রাণী, পুরোহিত এবং তাদের আরাধ্য দেবকুলকে কঠিন শিলায় মূর্তিমান করে রাখতে চায়। সেই চেষ্টায় তারা সফলকাম হয়েছিল। আজকের দিনের মানুষও অবাক হয়ে দেখে কি করে হাজার হাজার বছর আগের মূর্তিগুলো আজও একটি জাতির অক্ষয় কৃতিত্বের নিদর্শন বহন করছে। প্রাচীন মিসরীয়রা যে ইতিহাস আমাদের কাছে রেখে গেছে সেই ইতিহাস একটি বলিষ্ঠ প্রকৌশল এবং স্থাপত্য জ্ঞানের ইতিহাস। তাদের সমস্ত আচরণ-ব্যবহার, বিধি-শিক্ষা এবং বিনোদন সবই ছিল দেব-নির্ভর এবং দেবকেন্দ্রিক। মিসরে আমি দু'বার গিয়েছি, যদিও সেখানে প্রাচীন ইতিহাসের ধারাক্রম নেই। কিন্তু বর্তমান কালের শাসকমণ্ডলীও নিজেদেরকে প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী বলে মনে করেন।

আজ বিকেল ৫টায় শফিকের শ্বশুর বাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে এলাম। শফিকের শাশুড়ি বুদ্ধিমতি আধুনিকা রমণী। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর নিরীহ স্বামীকে ক্যান্টনমেন্টে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারপর আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। ভদ্রলোক অত্যন্ত শান্ত এবং নির্বিরোধী ছিলেন। মানুষকে আঘাত দেয়ার মত ক্ষমতাও তার ছিল না। ভদ্রলোকের মৃত্যুর রহস্য আজও উদঘাটিত হয়নি।

ওখান থেকে বেরিয়ে আমি এবং আমার স্ত্রী চাঙওয়া রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার খেলাম। আমাদের দীর্ঘকালের অভ্যাস মাসের মধ্যে কয়েক দিন বাসায় রান্না না করে বাইরে খাওয়া। করাচী থাকতাম যখন তখন সপ্তাহে এক দিন বন্দর রোডের রেস্তোরাঁগুলোতে আমরা প্রায়ই হানা দিতাম। চট্টগ্রামেও সেই অভ্যাসটি বজায় রেখেছি। আমার স্ত্রী আবার রেস্তোরাঁর কোন রান্না ভাল লাগলে বাড়িতেও সে রকম রান্নার চেষ্টা করেন।

৩০-৭-৭৫

আজ সরকারী উদ্ভিদ বিভাগের এক ভদ্রলোক আবুল ফজল সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তখন সেখানে আমিও ছিলাম। ভদ্রলোক আমাদের দেশের মাটিতে আপেল এবং আঙ্গুর কেন হবে না সে বিষয়ে গুরুগম্ভীর মন্তব্য করছিলেন এবং আবুল ফজল সাহেবকে জ্ঞান দেবার চেষ্টা করছিলেন। এক সময় ভদ্রলোকের কথাবার্তা খুব বিরক্তিকর মনে হল। আমি তখন তাকে থামিয়ে দেবার জন্য বললাম, "আল্লাহ তায়ালা মাটি ও আবহাওয়া একেক দেশে একেক রকম করেছেন। এর ফলে একেক দেশে একক রকমের ফলমূল হয়। অন্য দেশের ফলমূল আমাদের এ দেশে কেন হয় না সেটা চিন্তা না করে আমাদের দেশে যা হয় সেগুলো আরও ভাল করবার চেষ্টা আমাদের করা উচিত"। ভদ্রলোক এর পর আর তর্কে নামেননি। তবে ভদ্রলোক যাতে আহত না হন সে জন্য আমি একটি মন্তব্য করে আলোচনা শেষ করলাম, "তবে আমাদের দেশে না হলে কি হবে, আপেল আর আঙ্গুর খেতে ভাল লাগে।"

৩১-৭-৭৫

আমাদের পরিবারে দীর্ঘকাল ধরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দোয়া-দরুদের মজলিস বসে! বাবাকে এ ধরনের মজলিস পরিচালনা করতে দেখেছি। এ মজলিসের উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

হচ্ছে আল্লাহর গুণ-গান করা এবং তার সাহায্য কামনা করা। এখানকার মূল প্রার্থনা হল বিপদ থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা, অসুস্থতা যাতে দূর হয় সেজন্য তার কৃপা ভিক্ষা করা, চিত্তে শান্তি যেন আসে সে জন্য আবেদন করা এবং পৃথিবীর সর্বকর্মে সফলতা অর্জনের জন্য আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করা। এটাকে আমি একটি ভাল প্রথা বলে মনে করি। ঢাকায় যে বাসায় আমরা থাকতাম, হোসেনী দালান রোডে সে বাসায় এখনও এ অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ঢাকায় থাকতে আমিও সেখানে যোগ দিতাম। কিন্তু চট্টগ্রামে আলাদাভাবে কিছু করতে পারিনি। তবে আমার স্ত্রী মাগরেবের নামাজের পর কোরআন শরীফ পড়েন, তারপর দোয়া-দরূদ পড়ে মোনাজাত করেন। বৃহস্পতিবারে এ ধরনের অনুষ্ঠান ইরানের মুসলমানরা নিয়মিতভাবে করে থাকে। সম্ভবত এ প্রথাটি তাদের কাছে থেকেই পেয়েছি।। অবশ্য আমরা যে ধরনের দোয়া-দরূদ পড়ি ইরানিরাও সে ধরনের পড়ে কিনা জানি না।

১-৮-৭৫

আমার 'ইডিপাস' নাটকটির নতুন সংস্করণ ছাপা হচ্ছে। নতুন সংস্করণের জন্য একটি ভূমিকা আজ লিখলাম। এই নাটকটি আমার একটি সফল অনুবাদ-কর্ম। বইটি বিভিন্ন মঞ্চে অভিনীত হয়েছে এবং দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছে। নতুন সংস্করণটি আহমদ পাবলিশিং হাউজের মহিউদ্দিন সাহেব ছাপছেন। বইটির প্রথম সংস্করণের এক কপি আমি কলকাতায় আমাদের শিক্ষক ডঃ অমলেন্দু বসুকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি খুব প্রশংসা করেছিলেন। অমলেন্দু বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষক ছিলেন। তাঁর কাছে আমি ব্রাউনিং পড়েছি, কোলেরিজ পড়েছি এবং কীটস পড়েছি। তিনি আমার টিউটোরিয়ালও নিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমি খুবই শ্রদ্ধা পোষণ করি।

২-৮-৭৫

আজ সকালে এ্যাডভান্স কমিটির মিটিং ছিল। কিছু রুটিন কাজ সমাধা করা হল।

৩-৮-৭৫

কোরেশীর বাসায় দুপুরে খেলাম। সেখানে রসুল নিজাম এবং ডঃ করিম ছিলেন। রসুল নিজাম চট্টগ্রামের এক ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্র। ধনাঢ্য হলেও তিনি সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিয়মিত জড়িত হতেন। মানুষে মানুষে বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। ভদ্রলোকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। রসুল নিজাম কোরেশীর চাচাতো বোনের স্বামী। সে একজন টি-ব্রোকার এবং আধুনিক সময়ের একজন চমৎকার লোক কিন্তু সমাজ হিতৈষণার কোন কর্মে তাকে আমি কখনও জড়িত হতে দেখিনি। বেশ বাকপটু এবং প্রফুল্ল স্বভাবের লোক। ডঃ করিম ইতিহাসের অধ্যাপক এবং একজন সফলকাম গবেষক। তিনি বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং এ অঞ্চলে মোঘল ও পাঠানদের অধিকার নিয়ে গবেষণা করেছেন। তবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে

www.pathagar.com

শিক্ষকদের মধ্যে যে রাজনীতি আছে তার সঙ্গে তিনি সূক্ষ্মভাবে জড়িত। ১৯৬২-৬৩ সালের দিকে যখন আমি বাংলা একাডেমীতে ছিলাম তখন ডঃ করিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। সে সময় থেকেই তাঁকে আমি জানি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হল তখন যেসব শিক্ষকদের দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়, তাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ করিম।

৪-৮-৭৫

এম. এ প্রথম পর্ব পরীক্ষার ফলাফল কন্ট্রোলারের কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

'বুলগেরীয় ভাষা এবং স্লাভ বর্ণলিপি' নামক একটি ইংরেজি প্রবন্ধ লেখা শেষ করলাম।

সি.পি. স্নো রচিত 'দি লাইট এ্যান্ড দি ডার্ক' উপন্যাসটি পড়া শুরু করলাম। স্নো একজন বৈজ্ঞানিক। কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসেবে তার খ্যাতিও অসাধারণ। তার পরিবেশটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কুশীলব হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জুলফিকার আলী স্নো-র খুব ভক্ত। তিনি আমাকে স্নো-র উপন্যাসগুলো পড়তে আগ্রহী করে তুলেছেন। তবে স্নো-র উপন্যাস বুঝতে হলে ইংলিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক এবং প্রশাসনিক পরিবেশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ ধারণাটি না থাকলে অনেক সময় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

শিবনারায়ণ রায়ের একটি চিঠি পেলাম।

৫-৮-৭৫

আজ সবকিছু বিষণ্ন মনে হচ্ছে। কোথাও বাতাস নেই, গাছের পাতা নড়ছে না এবং ওগুলো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটি কাক ডাকতে ডাকতে উড়ে চলে গেল। আমি সমস্ত সময়কে হারিয়ে একটি শূন্যতাকে সামনে রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম। সিকান্দার আবু জাফরের মৃত্যুসংবাদ শুনে আমি খুবই অস্থির হয়ে পড়লাম। ঘর থেকে বেরিয়ে নির্জন পথের উপর পা রাখলাম। আমাদের অন্তরঙ্গতা দীর্ঘকালের। দেশ বিভাগের পূর্বে কলকাতায় আমাদের একটি পরিচয়ের বৃত্ত ছিল। সেই বৃত্তের মধ্যে ফররুখ ছিল, সিকান্দার ছিল, ফতেহ লোহানী কখনও কখনও এসেছেন এবং দু'এক সময় রেডিওর ইন্দু সাহা। কথায়, কথকতায়, পরিহাসে, এবং স্বেচ্ছাবৃত্তির আনন্দে আমাদের সময় যে কি করে কাটত এখন বলতে পারি না। সিকান্দার ছিল সর্বতোভাবে অসাধারণ চতুর, সাহসী এবং বুদ্ধিদীপ্ত। আমাদের প্রতিদিনের সময়ের মধ্যে সিকান্দারকে আমরা কেউ এড়াতে পারতাম না। তাকে আমরা প্রত্যেকেই ভালবাসতাম। এ ভালবাসা ছিল নিখুঁত ও আন্তরিক। প্রথমে ফররুখ গেল, এখন সিকান্দার গেল। একেবারে আপন বলতে আমার বন্ধুদের মধ্যে আর কেউ রইল না। স্বাধীন বাংলাদেশের সিকান্দার খুব অসহায় বোধ করেছিল। দেশে প্রশাসনিক অব্যবস্থা দেখে সিকান্দার সর্বদাই ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত থাকত। তার উত্তেজনার কারণ দেশের অব্যবস্থা কি করে দূর করা যায় সে ব্যাপারে কেউ ভাবছে না – এটা তার মনে হত।

www.pathagar.com

৬-৮-৭৫

আজ শবে-মেরাজ।

বিকেলবেলা শিল্পী জয়নুল আবেদীন এলেন। তিনি চট্টগ্রাম শহরে উঠেছেন শিল্পী শফি সাহেবের বাসায়। তাঁর গাড়িতে চড়েই আমার এখানে এসেছেন। তাকে পেয়ে আমি খুব খুশি হয়ে উঠলাম। জয়নুল আবেদীন অত্যন্ত হৃদয়বান এবং মুক্তমনের অধিকারী। তাঁকেও আমি দীর্ঘদিন ধরে জানি। দেশ বিভাগের পূর্বে আমাদের উভয়ের কর্মক্ষেত্র ছিল। অনেকদিন বিকেলে এবং সন্ধ্যায় ডালহৌসির ওদিকে আমরা দীর্ঘপথ হাঁটতাম। কখনও কখনও শওকত ওসমান সঙ্গে থাকত। কখনও কখনও ফ্রেসকোতে বসে একসঙ্গে চা খেয়েছি, আবার কে. সি. দাসের দোকানে বসে রসমালাই। আমরা দুজনে কিছুক্ষণ স্মৃতি মন্থন করলাম। সিকান্দারের মৃত্যুসংবাদে আমার বিষণ্ণতা দূর করবার জন্য আবেদীনের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন ছিল। সিকান্দারের মৃত্যুতে আবেদীনও খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। আমার সঙ্গে তিনিও স্বীকার করলেন যে আমরা একজন প্রাণবন্ত বলিষ্ঠ মানুষকে হারিয়েছি। আমি আবেদীনকে ঢাকার তরুণ শিল্পীদের কথা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বললেন যে, সবাই কাজ করছে এবং খুব আন্তরিকভাবে কাজ করছে। এটা তার স্বভাব, তিনি কাউকে সমালোচনা করতে চান না এবং কারও ক্রটি তুলে ধরতে চান না। নতুন কোন শিল্পীর কাজ দেখলে বলেন, “কি সুন্দর রেখার টান! ড্রয়িং-এর হাতটা সত্যি ভাল”। আমি অনেক সময় হেসে বলেছি, “আপনি কারোরই ভুল ধরিয়ে দেন না, এটা কি রকম কথা? এভাবে তারা শিখবে কি করে?” আমার কথায় আবেদীন বলতেন, “এদের উৎসাহ প্রয়োজন। প্রথমেই ভুল ধরিয়ে দিলে ভয় পাবে, আর কিছুই শিখবে না।”

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ খোলার জন্য আমাকে আবেদীন খুব ধন্যবাদ দিলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে চারুকলা বিভাগটি খোলার ব্যাপারে আমি খুব চেষ্টা করেছিলাম। ডঃ মল্লিক তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। তাঁর সমর্থন না পেলে এ বিভাগ খোলা সম্ভবপর হত না। বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আমি শিল্পী রশীদ চৌধুরীকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম। বর্তমানে এ বিভাগটি একটি স্থায়ী রূপ পেয়েছে।

৭-৮-৭৫

আজ দুপুরে শফি সাহেবের বাসায় জয়নুল আবেদীনের সঙ্গে খেলাম। বিকেলে রেডিও বাংলাদেশে সিকান্দার আবু জাফরের ওপর একটি রেকর্ডিং করলাম।

রাত্রে রেস্তোরাঁয় ইংরেজি বিভাগের সৌজন্যে নৈশভোজ ছিল।

৮-৮-৭৫

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ হরিপদ ভট্টাচার্য আমার সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। ভদ্রলোক কথায় কথায় বললেন, 'আপনাকে যদি

www.pathagar.com

আমাদের ওদিকে পেতাম তাহলে আমাদের ছেলে মেয়েরা খুব উপকৃত হত। এমন একটি ব্যবস্থা কি করা যায় না যাতে পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু অধ্যাপক বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের কিছু কিছু অধ্যাপক ওদিকে গিয়ে পড়াবেন?" আমি হেসে বললাম, "আমাদের নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এ ধরনের লেনদেনের ব্যবস্থা নেই, অন্য দেশের সঙ্গে কি করে আর হবে।" ভদ্রলোক বেশ বিনয়ী ও অহমিকাশূন্য।

বি. এ (পাস)-এর প্রথম কিস্তির পরীক্ষার খাতা দেখা হল।

৯-৮-৭৫

আজ সকাল থেকে আমার স্ত্রী অসুস্থ। তার ডায়াবেটিজ বেড়েছে এবং ঘাড়ের কাছে মাংস ফুলে উঠেছে। শামিমকে সঙ্গে নিয়ে ডাঃ গোলাম মোস্তফার চেম্বারে গেলাম। তিনি ঘাড়ের ফোলা জাগার ওপর 'ইনস্যুলিনের' পানি লাগাতে বললেন। চিকিৎসক হিসাবে গোলাম মোস্তফাকে আমার খুব ভাল লাগে। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে রোগীকে দেখেন এবং সাহায্য করবার চেষ্টা করেন। চট্টগ্রামে অসুখ-বিসুখ হলে আমি এঁরই শরণাপন্ন হই। চট্টগ্রামে আরেকজন চিকিৎসক আছে যাঁর সঙ্গে আমাদের পারিবারিক যোগসূত্র আছে তিনি হচ্ছেন ডাঃ নূরুল আমীন। নূরুল আমীন আমার বড় জামাই মাসুদের সহপাঠী। সেই পরিচয়ে সে আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে খুব সম্মান করে। নূরুল আমীনের মাধ্যমেই গোলাম মোস্তফার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। গোলাম মোস্তফা আশ্বাস দিলেন যে, আমার স্ত্রীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। এ আশ্বাসটি আমার প্রয়োজন ছিল। কারণ আগামীকাল আমি ঢাকা যাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ শেষ পর্বের ভাইবা নিতে। স্ত্রী কিন্তু খুব আশ্বস্ত বোধ করলেন না, তিনি বারবার আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন যে আমার ঢাকা না গেলেই কি নয়? শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, "কাল পর্যন্ত কি হয় দেখা যাক না। যদি তোমার শরীর ভাল না হয় যাব না।" শহর থেকে ফেরার পথে পাঁচলাইশের ওখানে একটি দোকান থেকে মিষ্টি পরোটা কিনলাম। চট্টগ্রামে এ ধরনের পরোটা অনেকে তৈরি করেন। ঘি-তে পরোটা ভেজে চিনির সিরার মধ্যে ডুবিয়ে দেয়া হয়।

১০-৮-৭৫

আজ স্ত্রীর শরীর ভাল। ঘাড়ের যে জায়গাটা ফুলে উঠেছিল সেটা আর নেই। সুতরাং ঢাকা যাবার অনুমতি পেলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এম. এ ফাইনাল পরীক্ষার্থীদের ভাইবা নিতে হবে। ১২টা ৪৫ মিঃ বাংলাদেশ বিমানে ঢাকায় রওয়ানা দিলাম। চট্টগ্রাম শহর পর্যন্ত শামিমকে সঙ্গে নিয়ে স্ত্রী আমার সঙ্গে এলেন। তাকে মান্নানের বাসায় রেখে আমি এয়ারপোর্টে গেলাম।

আজ বিকেলে রফিকের বাসায় তার সবচেয়ে ছোট বোন তুসির পানচিনি। আমার ভগ্নীপতি তার সব ক'জন মেয়ের বিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। তুসির জন্য তার একটু চিন্তা ছিল। আমি এবার আলী নকীর বাসায় উঠলাম। আলী নকী আমাকে জানাল যে, ঢাকা

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা দেয়া হবে। সেজন্য খুব তোড়জোড় চলছে। এ সময় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে না এলেই পারতাম। রাষ্ট্রপ্রধানের আগমনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে কিছু অসামাজিক লোককে ধরপাকড় করা হচ্ছে। কিন্তু কারা যে অসামাজিক তার বিচার কে করবে? আসলে এ অজুহাতে সরকারের সমালোচক বিরুদ্ধবাদীদের আটকে ফেলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

১১-৮-৭৫

আলী নকীর বাসা থেকে আমি ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের অতিথি ভবনে চলে এলাম। সেখানে সকলেরই খুব ব্যস্ত-সমস্ত ভাব দেখলাম। মাঠটি পরিষ্কার করা হচ্ছে। দালানে নতুন রং করা হয়েছে। পুলিশের কিছু লোক গেটে এবং কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিয়েছে। একজন আর্মি মেজরকে দেখলাম। সে ইউওটিসি-র প্রশিক্ষণ দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে। সেও টিএসসির অতিথি ভবনের একটি কক্ষে থাকবে। সে আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল।

বুলগেরীয় দূতাবাসের ইভান দেখা করতে এল এক বোতল ওরেঞ্জ জুস হাতে নিয়ে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশন থেকে একটি বই উপহারস্বরূপ পেলাম। বইটির নাম 'এডুকেশন রুরাল ডেভেলপমেন্ট। বিকেলবেলা ওদুদুল হক, চিত্ত সাহা ও বাবলু দেখা করতে এল।

ইভান বলেছিল যে, বুলগেরীয় দূতাবাস শিগগিরই বুলগেরীয় গ্রাফিক্সের ওপর প্রদর্শনী ঢাকায় করবে। আমি যেন এ বিষয়ে একটি লিখিত ভাষণ তৈরি করি। সে এ জন্য কিছু কাগজপত্রও রেখে গেছে।

সন্ধ্যার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আবু জাফর দেখা করতে এল। সে আমাকে জানাল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর শিক্ষকদের কাছে বাকশালে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। জাফর জানাল যে সে এতে যোগ দেবে না। সে জিজ্ঞেস করল যোগ না দিলে তাকে কোন লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে কিনা। আমি বললাম, "তোমার নিয়োগপত্রে বাকশালে যোগদানের কথা নেই। সুতরাং তুমি যোগ না দিলে আইনত কেউ তোমার অসুবিধে করতে পারবে না। তবে ক্ষমতার দর্পে কেউ যদি হ্যারাজমেন্ট করে তাহলে কিছু করবার নেই। সেক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।"

১২-৮-৭৫

সকালে ভাইস চ্যান্সেলর মতিন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হল। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ব্যস্তসমস্ত ভাব নিয়ে টিএসসিতে কয়েকজন কর্মচারীসহ ঘোরাফেরা করছিলেন। আমাকে দেখে 'ওয়েলকাম' 'ওয়েলকাম' বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, "আপনি আমার অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। আমি যে অনুষ্ঠান করতে চাচ্ছি তার জাঁকজমক দেখলে সকলেই চমকে উঠবে।" আমি কিছু না বলে ওখান থেকে চলে এলাম।

www.pathagar.com

বিকেল ৪টা ৩০ মিঃ বুলগেরীয় দূতাবাসে চা খেতে এলাম। তাদের দেশের কিছু ফলমূল আমার সামনে রাখা হল। এর মধ্যে বড় আকারের আপেল ছিল এবং স্ট্রবেরী ছিল। স্ট্রবেরীগুলো খুবই সুস্বাদু লাগল। উঠবার সময় রাষ্ট্রদূত একটি থলেতে করে কিছু আপেল আমার হাতে দিলেন। আমার প্রতি এদের কৃতজ্ঞতার একটি কারণ হল অনেকেই বুলগেরিয়ায় গিয়েছে কিন্তু ফিরে এসে কিছুই লেখেনি। আমিই প্রথম ব্যক্তি যে কিছু লিখল। রাষ্ট্রদূত ভদ্রলোক রাজনৈতিক কর্মী কিন্তু একটু একাডেমিক ধাঁচের। সেজন্য ভদ্রলোক আমাকে বেশ পছন্দ করেন।

সন্ধে ৬টায় গোপীবাগে বাবলুর ওখানে গেলাম। সেখানেই রাত্রে খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। বাবলু খেতে বসে আমাকে ঠাট্টা করে বলল, "দুলা ভাই, এ সরকারের আমলে আপনার কোন ভবিষ্যৎ নেই।" আমি হেসে উত্তর করলাম, "আমার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন তো আল্লাহ, কোন সরকার নয়। সুতরাং আমি সব অবস্থাতেই নিশ্চিন্ত থাকি। ভবিষ্যতের কথা কখনও বলবে না। ভবিষ্যতে কি হবে তা মানুষ কখনও বলতে পারে না।"

১৩-৮-৭৫

আজ সকাল ৮টা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এম. এ শেষ পর্বের ভাইবা আরম্ভ হল। আমার কক্ষ থেকে বেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে গেটের দিকে যখন যাচ্ছি তখন দেখলাম সাধারণ পোশাক পরা একটি লোক কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে আমার পিছু পিছু আসছে। গতকালও লোকটিকে দেখেছিলাম। তখন কিছু মনে হয়নি। আজ দ্বিতীয়বার দেখে বুঝতে পারলাম লোকটি পুলিশের ইনটেলিজেন্স বিভাগের লোক। আমি তখন আর এগিয়ে না গিয়ে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত লোকটির সামনে এলাম। লোকটি সরে যেতে সময় পেল না। আমি লোকটিকে বললাম, "আপনি কি চাকরি করেন, তা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আপনার কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে বলে মনে হয় না। কার পিছু নিতে হবে তাও আপনি জানেন না। এ বুদ্ধি নিয়ে চাকরি করলে আপনার কোন উন্নতি হবে না।" লোকটি থতমত খেয়ে আমার কাছ থেকে সরে গেল। আমি টিএসসি পার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের কাছে এলাম। কলা ভবনের পার্শ্বে একটি শিখ গুরুদুয়ারা। সেখানে তিনজন শিখকে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। কৌতূহলবশত তাঁদের নিকটে গিয়ে কথা বলা আরম্ভ করলাম। শিখ তিনজন খুবই ভদ্র। তারা বললেন যে, কলকাতা থেকে তাঁরা তীর্থে এসেছেন। নানকজী তাঁর জীবদ্দশায় একবার ঢাকায় এসেছিলেন এবং যেখানে ধ্যানে বসেছিলেন সে জায়গাটিই বর্তমানে গুরুদুয়ারা। তাঁরা আরও বললেন যে. কলকাতায় তাঁদের রেস্তোরাঁর ব্যবসা আছে। আমি তাঁদের জানালাম যে, আমার কৈশোরে আমি ঢাকায় অনেক শিখ দেখেছি। স্কুলে যাবার পথে প্রতিদিন তাদের সঙ্গে দেখা হত। তারা ছিল ঢাকা জেলখানার পুলিশ। সকালবেলা স্নান সেরে এসে তারা সুর করে কি যেন পড়ত। আমার কথা শুনে বললেন, "আমরা গ্রন্থসাহেব" পড়ি। সেখানে বাবা ফরিদের একটি চৌপাঙ্গ আছে। বাবা ফরিদ বলেছেন, 'হে মানুষ তোমার বিপদ আসতে পারে, আসতে পারে কেন, আসবেই। কিন্তু তুমি যদি শুদ্ধ থাকতে

www.pathagar.com

পারবে।” এদের কাছে বিদায় নিয়ে বাংলা বিভাগে গেলাম। মিসেস ইব্রাহীম আগেই এসেছিলেন। কিন্তু মনিরুজ্জামান তখনও আসেননি। আমি মিসেস ইব্রাহীমকে বললাম, “এবার ঢাকায় এসে আমার খুব ভাল লাগছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইচ্ছা করলে একটি কনভোকেশন ডেকে বঙ্গবন্ধুকে ‘এল.এল.বি’ উপাধি দিতে পারত এবং সেটাই সমীচীন হত। কিন্তু তা না করে শিক্ষকদেরকে ‘বাকশাল’-এ যোগ দেবার ব্যবস্থা করে এত বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ঠিক হয়নি। এর ফল বোধ হয় শুভ হবে না।” মিসেস ইব্রাহীম আমার কথা শুনে হাসলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। একটু পরে মনিরুজ্জামান এল এবং আমরা ভাইবা আরম্ভ করলাম। ভাইবা চলছে, এমন সময় বেলা ১১টার দিকে এক ভদ্রলোক দরজায় টোকা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন, তাঁর পিছনে পিছনে কাঠের মই সাথে একজন পিয়ন। ভদ্রলোক খুব জীর্ণশীর্ণ এবং নিরীহ। তিনি হাত তুলে মিসেস ইব্রাহীমকে আদাব দিয়ে দেয়ালের কাছে গেলেন, দেয়ালের গায়ে একটি বড় ঘড়ি টাঙ্গানোর জন্য। তিনি মই বেয়ে উঠে ঘড়ির ঢাকনিটা খুলে ঘড়িতে চাবি দিলেন। চাবি দেয়া শেষ হলে আবার নিঃশব্দে চলে গেলেন। আমি ভাইবার কাজ বন্ধ করে কৌতূহলের সঙ্গে ভদ্রলোকের আগমন-নির্গমন দেখলাম। মিসেস ইব্রাহীম বললেন, “ভদ্রলোক খুব শান্ত ও নির্বিরোধী। এর চাকরি হচ্ছে কলা ভবনের ঘড়িগুলোতে নিয়মিত চাবি দেয়া।”

ভাইবা নিতে গিয়ে দেখলাম দুজন শিক্ষক টিউটোরিয়ালের নম্বর দেননি। এর ফলে পরীক্ষার্থীর অসুবিধা হবে। মিসেস ইব্রাহীম বললেন যে, যেভাবেই পারেন এ নম্বরগুলো তিনি আনিয়ে নেবেন। বেলা ১টা পর্যন্ত ভাইবা নিয়ে আমি টিএসসিতে ফিরলাম। বাবুর্চী খাবার নিয়ে এল। আমি তাকে একটি সব্জি-ভাজি, মুরগী এবং ঘন ডাল করতে বলেছিলাম। রান্নাটি ভালই হয়েছিল। খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার ৩টার সময় বাংলা বিভাগে এলাম। এবার কলা ভবনের একটি জীপে করে কয়েকজন ছেলের সঙ্গে শেখ কামালকে দেখলাম। আমার দিকে চোখ পড়তেই সে আমাকে আদাব দিল। গেটের কাছে কয়েকজন পুলিশ দেখলাম। একটি হুইসেল শুনলাম। সম্ভবত মূল অনুষ্ঠানের দিন পুলিশ কোথায় কিভাবে থাকবে তার মহড়া হচ্ছে। ভাইবা বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত হল। ভাইবা শেষ হতে মিসেস ইব্রাহীম আমাদেরকে আলুর চপ এবং মিষ্টি খাওয়ালেন।

সন্ধ্যার সময় মহিউদ্দিন সাহেব এবং আরজ আলী এলেন। এদের সঙ্গে কথা বলা শেষ করেছি, তখন আলতাফ বলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পিয়ন দেখা করতে এল। আমি আলতাফকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি দিয়েছিলাম। আমি ঢাকায় এসেছি খবর পেলে সে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে।

১৪-৮-৭৫

আজকে টিএসসি এলাকায় মানুষের আনাগোনা একটু বেশি। সকলের ব্যস্ত-সমস্ত ভাব দেখলাম। ইউ.ও.টি.সি-র ক্যাডেটরা মাঠের পূর্বদিকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছে এবং সেনাবাহিনীর একজন কমান্ড্যান্ট তাদেরকে মার্চপাস্ট শেখাচ্ছে। সেনাবাহিনীর লোকটি মেজর। বেশ অল্প বয়স, দেখতে সুন্দর। আমার পাশের ঘরেই থাকত। আজই

www.pathagar.com

প্রথম তাকে কর্মরত দেখলাম। টিএসসি-র বাইরে কলা ভবনে যাওয়ার পথে পুলিশ চলাচল করছিল এবং পুলিশের একটি বড় গাড়ি আর্ট ইনস্টিটিউটের কাছে দাঁড়িয়েছিল। ভাইবা আগের দিনের মতই ৮টা থেকে আরম্ভ হল। ভাইবা কিছু দূর অগ্রসর হয়েছে এমন সময় কলা ভবনের নিকটে দুটি বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। পুলিশের হুইসেলও শোনা গেল। আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম পুলিশ ছুটোছুটি করছে। এ ঘটনায় আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ভাইবা নিতে ভাল লাগছিল না তখন। যাই হোক ১টার সময় ভাইবা শেষ হবে। মিসেস ইব্রাহীমকে জানালাম যে, বিকেলে আমি আর আসতে পারব না। কিছু কাগজপত্র সই করার ছিল। সেগুলো সই করে টিএসসিতে ফিরে গেলাম। দুপুরে খেতে বসেছি তখন আবার বোমা বিস্ফোরিত হল। বাবুর্চী বলল, "অবস্থা খুব ভাল ঠেকছে না স্যার, আপনি কি অন্য কোথাও চলে যাবেন? আমি লোকটির কথার কোন উত্তর দিলাম না, কিন্তু মনটা খুব ভার হয়ে রইল। সেনাবাহিনীর মেজরটিও আমার সঙ্গে খেতে বসেছিল। সে বলল, "এসব ছোটখাট পটকা ফোটার শব্দ শুনে ভয় পেলে চলে না।" দুপুরে কিছুক্ষণ ঘুমালাম। সন্ধ্যার দিকে এক পরিচিত প্রকৌশলী আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ভদ্রলোক বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন। তিনি বাম রাজনীতির এক ধরনের দার্শনিক ব্যাখ্যাকার। আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাই। দেশের সমস্যা সম্পর্কে তিনি যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। সেগুলো শুনতে আমার ভাল লাগে। নানাবিধ কথাবার্তার পর আমি তাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, "আমাদের দেশে এক ধরনের স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা স্থায়ী হতে চলেছে মনে হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই এবং অধিকাংশ সংবাদপত্র বাতিল করে ৪টি সংবাদপত্র সরকারী নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তারা জনসাধারণের কথা বলতে পারে না। দেশে বিরোধী চিন্তার লোকদের সভা-সমিতি করা নিষিদ্ধ। প্রত্যেক জেলার জন্য জেলা গভর্নর নিযুক্ত করা গেছে। তারা অল্প দিনের মধ্যে জেলাগুলোর শাসনভার হাতে নেবে। এ অবস্থায় আমরা বাঁচব কি করে।" ভদ্রলোক খুব সহজভাবে উত্তর দিলেন, "আগামী ২৫ বছরের জন্য এরা একক ক্ষমতায় থেকে যেতে পারবে বলে মনে হয়। যেভাবে আটঘাট বেঁধে এরা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে তাতে মনে হয় না যে আর কেউ ক্ষমতার দিকে হাত বাড়াতে পারে। তবে পৃথিবীতে তো দুর্ঘটনাও ঘটে। অকস্মাৎ কোন দুর্ঘটনায় এদের যদি পতন ঘটে তাহলেই তো মুক্তি। রাত ৯টায় ভদ্রলোক চলে গেলেন।

সেনাবাহিনীর মেজরটি আমার কক্ষের দরজা খোলা দেখে ভিতরে আসতে চাইল। তাকে আসতে বললাম। সে ভিতরে এসে বসল এবং আগামীকাল যে বর্ণাঢ্য র‍্যালি হবে তার বিবরণ দিতে লাগল। সে বলল যে, এই র‍্যালিতে কয়েকটি ট্যাঙ্কও থাকবে। তারা মিছিলের আগে থাকবে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানের শোভা বর্ধনের জন্য কি যুদ্ধ-সরঞ্জামের প্রয়োজন করে? ট্যাঙ্কের প্রয়োজন কেন হল আমি বুঝতে পারলাম না।" মেজরটি বলল, "সেটা আমি বলতে পারব না।" আমার মনে হয় মানুষে ‍ ‍নে একটু সম্ভ্রম সৃষ্টির জন্য এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

রাতে ঘুম আসতে অনেক দেরি হল। নানা ধরনের চিন্তা-ভাবনায় এক প্রকার মানসিক অস্বস্তিতে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। একবার বিছানা থেকে উঠে বাথরুমে

www.pathagar.com

গেলাম। এবং ঘাড়ে-মুখে পানি দিলাম। পরে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। আমি সব সময় যেখানে যাই দু'একটি বই হাতে নিয়ে আসি। এবারও আমার হাতে কিছু বই ছিল। আমার কাছে একটি জার্মান পত্রিকা ছিল। সে পত্রিকায় একজন শিল্পী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর সকল কর্মে সব সময় এমন একটি বিন্দুতে পৌঁছাতে চান যেখান থেকে আর অগ্রসর হওয়া যায় না। তার চেয়ে বড় কথা যে ধারা তিনি অতিক্রম করে এসেছেন সে ধারার শুরুতেও আর ফিরে যেতে পারেন না। এর একটি ইতিবাচক দিক আছে, কিন্তু আমার ভারসাম্য হারাবারও ভয় থাকে। শিল্পীর নাম রাইনহার্ড গোয়েবল।

১৫-৮-৭৫

গতরাতে অনেক দেরিতে ঘুমুতে গিয়েছিলাম। টিএসসিতে লোকজনের চলাচল, গাড়ির শব্দ, পুলিশের মহড়া এসব কিছু একটি অস্বস্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এর ফলে তন্দ্রার মত আসছিল, আবার ভেঙেও যাচ্ছিল। ছোট্ট পরিসরের ঘর আর তার সামনে চলাচলের করিডোর যেখানে পায়ের শব্দ অনবরত শোনা যাচ্ছিল। আমি কয়েকবার বিছানা ছেড়ে উঠে বাথরুমে গিয়ে ঘাড়ে ও কপালে পানি দিলাম। তারপর কখন ঘুম এল জানি না। সকালের দিকে স্বপ্নের মধ্যে মনে হল সমুদ্রের তরঙ্গ দেখছি এবং বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের শব্দ শুনছি। স্বপ্নেই বিপুল অন্ধকারকে দেখলাম এবং মনে হল এ অন্ধকারটি রাত্রির সমুদ্রের। অন্ধকারের মধ্য থেকে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গগুলো যেন আমাকে গ্রাস করতে আসছে। সমুদ্রের প্রতি আসক্তির ফলে বোধ হয় আমি প্রায়ই বিকেলে সমুদ্রের দিকে বেড়াতে যেতাম, বিদেশেও সমুদ্র তীর ছিল আমার খুব প্রিয় জায়গা। ক্ষুব্ধতা, উচ্ছ্বাস এবং অলৌকিকতা নিয়ে কিন্তু আজকের স্বপ্নের সমুদ্র আমার কাছে ভয়ংকর মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে সে অবধারিতভাবে আমাকে গ্রাস করতে আসছে। আমার পা ভেজা বালুতে আটকে রয়েছে এবং ভয়ে আমার কণ্ঠদেশ রুদ্ধ হয়ে গেছে। আমি পালাতে পারছি না, শব্দও করতে পারছি না। অবশেষে ভাগ্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করছি।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। আমার ঘরের দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা শুনলাম। তখনও তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ভাবছি সমুদ্রের তরঙ্গের আঘাত এসে লেগেছে। কিন্তু ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে একজন মানুষের ভয়ার্ত চিৎকার শুনে ঘুম পুরোপুরি ভেঙে গেল। আমি দরজা খুলে দেখি যুবক মেজরটি গেঞ্জি গায়ে লুঙ্গি পরা অবস্থায় একটি ট্রান্সজিস্টার হাতে নিয়ে থরথর করে কাঁপছে। সে আমাকে দেখে আর্তনাদ করে বলে উঠল, "স্যার রেডিও কি বলছে শুনুন।" আমি শুনলাম মেজর ডালিম নামক এক ব্যক্তি ঘোষণা দিচ্ছে যে, শেখ মুজিবর রহমান সবংশে নিহত হয়েছেন এবং সারাদেশে কারফিউ জারি করা হয়েছে। ঘোষক সুস্পষ্টভাবে নিজের পরিচয় দিয়েছিল এই বলে, "আমি মেজর ডালিম বলছি।" এই ঘোষণা শুনে আমি হতবুদ্ধি হয়ে বসে পড়লাম। তখন সুস্থির হবার এবং আত্মস্থ থাকবার কোন উপায় ছিল না। আমরা শুনেছি যে কিভাবে ইরাকে রাজপরিবারের সকল সদস্যকে একযোগে হত্যা করে মেজর জেনারেল করিম কাসেম ক্ষমতায় এসেছিলেন। সে হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতা এবং নারকীয় নিষ্ঠুরতা তুলনাবিহীন বলে বিশ্ববাসী মনে করেছিল। যুবক রাজা, তার স্ত্রী, ভ্রাতা-ভগ্নী এবং মাতাকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে

www.pathagar.com

গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। মাতার বুকের কাছে কোরআন শরীফ ছিল, তাতেও তিনি রক্ষা পাননি। আমি সে ঘটনার কিছুদিন পর বাগদাদে গিয়েছিলাম এবং তখন সেখানে মানুষের আচরণের মধ্যে মৃত্যুর স্তব্ধতা লক্ষ্য করেছিলাম। কেউ কারও দিকে তাকিয়ে সরাসরি কথা বলছিল না এবং রাজনৈতিক জিজ্ঞাসার কেউ কোন উত্তর দিচ্ছিল না। আমি যাত্রা সংক্ষেপ করে একদিন পূর্বেই ইস্তাম্বুল চলে গিয়েছিলাম। সে সময় একটি কথা আমার মনে জাগত, তা হচ্ছে মানুষ যে আসনেই বসুক না কেন, অথবা যে পর্যায়েরই হোক না কেন মাতা-পুত্র-কন্যা এবং বধূ নিয়ে সে একটি বৃত্তের মধ্যে বাস করে। এখানে তার পরিচয় আলাদা। সে মানুষ যদি অন্যায়কারী হয়,তবে এ বৃত্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে শাস্তি দিলে কেউ কিছু মনে করবে না। কিন্তু যদি গৃহগত সৌজন্যের মধ্যে নিষ্পাপ কতকগুলো মানুষকে তার সঙ্গে হত্যা করা হয় তবে মনের মধ্যে একটি প্রতিবাদ ও দুঃখ জাগে। ইরাকের যুবক রাজা পরিবার-পরিজন নিয়ে একটি সাংসারিক সমর্থনের মধ্যে বাস করত। বিদ্রোহীরা রাজাকে হত্যা করতে গিয়ে তার পরিবারের নিষ্পাপ মানুষগুলোকে হত্যা করেছে। এটি এমন একটি ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতা যা প্রশান্ত চিত্তে কখনই মেনে নেয়া যায় না। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডটিও অবিকল তাই।

শেখ মুজিবর রহমান এক প্রকার নিশ্চিন্ততায় এবং অরক্ষিত অবস্থায় আপন পরিজনসহ নিজ বাসগৃহে অবস্থান করতেন। শুনেছি এভাবে প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় তাকে অনেকে সাবধান করেছে। বিদেশী দূতাবাসের কেউ কেউ তাকে সাবধান করেছেন বলে শুনেছি। সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ফ্রমিন একবার আমাকে বলেছিলেন, "তোমাদের রাষ্ট্রপ্রধান বাস করেন যে গৃহে সে গৃহ সুরক্ষিত রাখার কোন ব্যবস্থাই কিন্তু নেই। এটা বোধ হয় ঠিক নয়। এ রকম অরক্ষিত থাকলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে।" আমি শুনেছি যে, সুরক্ষার কথা উঠলেই বঙ্গবন্ধু নাকি বলতেন, "আমার দেশের মানুষ আমাকে কিছু করবে না। আমি তাদের ভালবাসি এবং তারাও আমাকে ভালবাসে।" বিদেশের পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে। আমি 'স্পেকটেটর'এর একটি সংখ্যায় পড়েছিলাম, "বাংলাদেশে বর্তমানে একটি গ্রামোফোন রেকর্ড সব সময় বাজে। রেকর্ডটি একটি কথাই বারবার বলে – আমি আমার দেশকে ভালবাসি এবং আমার দেশের মানুষ আমাকে ভালবাসে।" এ কথাটি বাংলাদেশে এত বারবার উচ্চারিত হয়েছে যে এটি শেষ পর্যন্ত একটি পরিহাস উক্তিতে পরিণত হয়েছিল।

যে রকম নিষ্ঠুরভাবে তার স্ত্রী, পুত্রদ্বয়, পুত্রবধূদ্বয় এবং আত্মীয়-পরিজনসহ নিহত হলেন তা একটি মধ্যযুগীয় বর্বরতার মত। অন্য দুটি পরিবারের দুটি নিষ্পাপ মেয়ে সম্প্রতি এ গৃহে এসেছিল। তাদের শরীর থেকে বিবাহের গন্ধ তখনও মুছে যায়নি। শেখ কামালের শ্বশুরকে আমি চিনি। তিনি প্রকৌশলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করেন। অত্যন্ত শান্ত এবং নির্বিরোধী লোক। আমার স্ত্রীকে ডায়াবেটিক সেন্টারে যখন নিয়ে যেতাম তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হত। ভদ্রলোকের মেয়েটি খেলাধুলায় খুব পারদর্শী ছিল। ক্রীড়া জগতের সূত্র ধরেই শেখ কামাল তাকে চিনতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বিবাহ করে। আমি শুনেছিলাম এ বিবাহে মেয়েটির ভাইয়ের কোন আগ্রহ ছিল না। এ মেয়েটির তো কোন অপরাধ ছিল না, কিন্তু তাকেও এই নিষ্ঠুর

www.pathagar.com

মৃত্যুবরণ করতে হল। শুনেছি ভয়ংকর যখন আসে তখন সব কিছুকেই ধ্বংস করে দেয়। তার প্রচণ্ডতায় কল্যাণও নিগৃহীত হয়, যদিও সে অকল্যাণকেই শুধু ধ্বংস করতে চায়।

রেডিও থেকে যে ব্যক্তি এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘোষণা দিল সে একজন অখ্যাতনামা সৈনিক। কিছুদিন আগে একটি ঘটনায় তার নাম অনেকে জানতে পারে। একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে সে তার স্ত্রী নিয়ে উপস্থিত ছিল। সেখানে গাজী গোলাম মোস্তফার লোকজনের সঙ্গে কি নিয়ে যেন তার বচসা হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেই লোকগুলো ডালিমের স্ত্রীকে ধরে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় ডালিম অপমানিত বোধ করেন এবং তা সেনাবাহিনীরও মর্যাদাহানিকর বলে তার বন্ধু বান্ধবরা মনে করতে থাকে। এ ঘটনার বিচার কিন্তু ডালিম পায়নি। বরঞ্চ তাকে সেনাবাহিনী থেকে সরিয়ে দেয়া হয় এবং সে সরকারী সাহায্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে তার অপমানটি ভুলতে পারেনি। তাছাড়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লোকজন বাংলাদেশের সামরিক ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্ট ছিল না। সাধারণ নিয়মে প্রতিবছর সেনাবাহিনী থেকে যত সংখ্যক লোক অবসর গ্রহণ করে, তত সংখ্যক লোককে রিক্রুট করা হয়। তার ফলে সেনাবাহিনীটি একটি বিশেষ সংখ্যার মধ্যে আবদ্ধ থাকে কিন্তু বাংলাদেশের নতুন ব্যবস্থাপনায় সেনাবাহিনীতে নতুন রিক্রুটমেন্ট বন্ধ করে দেয়া হয় বলে শুনেছি। এর ফলে সেনাবাহিনীর সংখ্যা কমতে থাকে। তাছাড়া আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের ব্যাপারে ব্যয় সংকোচন করা হচ্ছিল এবং আমাদের সেনাবাহিনী ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। মুক্তিযুদ্ধের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যুদ্ধের সকল সমরাস্ত্র ভারতীয় বাহিনী নিয়ে যায়। যুদ্ধের এক শরিক হিসেবে এ সমস্ত অস্ত্রের একটি অংশ বাংলাদেশ পাবে এই ধারণা করা হয়েছিল। তাছাড়া ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান নিয়েছিল। সেখান থেকে চলে যাবার সময় অনেক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গিয়েছিল বলে সবাই বলাবলি করত। এমতাবস্থায় আমাদের সেনাবাহিনী গড়ে তোলার জন্য যে সাহায্য ও সমর্থনের প্রয়োজন ছিল তা তারা পায়নি। অন্য পক্ষে একটি সমান্তরাল সেনাবাহিনী হিসেবে রক্ষীবাহিনীকে গড়ে তোলা হচ্ছিল। এ রক্ষীবাহিনী ছিল সর্বাংশে ভারতীয় সাহায্যপুষ্ট এবং ভারতীয় সেনাধ্যক্ষদের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

আমি যখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন সাভারে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার পশ্চিমাঞ্চলের কয়েক একর জমি রক্ষীবাহিনীদের জন্য সরকারীভাবে অধিগ্রহণ করা হয়। সেখানে পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাদের একটি সমঝোতা হয় যে, প্রতিদিন সকালে এক ঘন্টার জন্য, বিকেলে এক ঘন্টার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর বাসস্থানের কাছে যে পানির ট্যাঙ্কটি আছে সেখান থেকে রক্ষীবাহিনীরা পানি পাবে। কিন্তু এ ব্যবস্থায় অতর্কিতে একদিন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর কয়েকজনের গোলযোগ বাঁধে এবং রক্ষীবাহিনীর লোকেরা আমাদের দুজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে বেঁধে নিয়ে যায়। এ খবর পেয়ে আমি খুব ক্ষুব্ধ হই এবং রেজিস্ট্রারকে প্রতিবাদ জানাতে বলি এবং আমাদের লোকজনকে

www.pathagar.com

উদ্ধার করে নিয়ে আসতে বলি। লোক দুজন উদ্ধার পেল এবং তারপর রক্ষীবাহিনীর দুজন অফিসার আমার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে এলেন। তারা উভয়ই সুদর্শন এবং আকৃতি ও অবয়বে অবাঙ্গালি বলে মনে হল। পরিচয় জানলাম যে তারা ভারতীয়–একজন কুর্গের,অপরজন মহারাষ্ট্রের। এখন বুঝতে পারলাম যে রক্ষীবাহিনী ভারতীয়দের সাহায্যেই গড়ে উঠেছে। এভাবেই একটি আলাদা সৈন্যদল হিসেবে রক্ষীবাহিনীকে গড়ে তোলা আমাদের নিয়মিত সেনাবাহিনীর লোকরা নিশ্চয়ই সুনজরে দেখেনি। আজকের হত্যাকাণ্ডের পিছনে এটা একটা কারণ বলে মনে হল।

যুবক মেজর আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি এখন কি করব?' আমি উত্তরে বললাম, 'তুমি কি করবে, সেই নির্দেশ তো আমি দিতে পারি না। তুমি ক্যান্টনমেন্টে চলে যাবে এটাই তো স্বাভাবিক।' টিএসসির বাবুর্চী কিছুক্ষণ পর আমাকে এসে খবর দিল উপাচার্য মতিন চৌধুরী তার সরকারী বাসগৃহ ছেড়ে চলে গেছেন। সে আমাকেও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলল। আমি কি করব ভেবে উঠতে পারছিলাম না। এসময় আমার ভাগ্নে ফজলে রাব্বি আমার কাছে এল এবং তার সঙ্গে আমি হোসেনী দালান রোডে তার বাসায় চলে এলাম। কিছু ভাববার, স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করবার সময় পাচ্ছিলাম না। যে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম সে সময়টি ছিল অনবরত জিঘাংসায় ভারাক্রান্ত। অবাক লাগল এই ভেবে যে, এই হত্যাকাণ্ডের কোন প্রতিবাদ কোথাও দেখছি না। যে রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সতত সতর্ক রাখা হয়েছিল তারা পথে বেরিয়ে পড়েনি। বঙ্গবন্ধুর সপক্ষের কোন শক্তি সেদিন কোন প্রতিবাদ-বাক্য উচ্চারণ করেনি। হয়তো তা সম্ভবও ছিল না। এক ফেরীওয়ালী এক ঝুড়ি শবরী কলা নিয়ে ফজলে রাব্বির বাসায় এল। আমরা তার কাছ থেকে কলা নিলাম। দাম জিজ্ঞেস করায় সে বলল, 'হুজুর যা ইচ্ছা হয় দেবেন। যদি না-ও দেন তাহলেও কোন ক্ষতি নেই।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কি রকম কথা, পয়সা নেবে না কেন?' সে তখন বলল যে, দিন চারেক আগে সে কলা নিয়ে পিলখানার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন রক্ষীবাহিনীর কয়েকজন জোয়ান তার ঝুড়ি থেকে কয়েক ডজন কলা কেড়ে নেয়, পয়সা দেয়নি। এ রকম ঘটনা শুধু তার ক্ষেত্রেই ঘটেছে তাই নয়, আরও অনেকের এ ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে নিম্নবিত্তের অসহায় মানুষ রক্ষীবাহিনীর দ্বারা উৎপীড়িত হচ্ছে। এখন তারা ভাবছে যে এই উৎপীড়ন থেকে তারা রক্ষা পাবে। এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে তাদের কোন সমালোচনা নেই, কিন্তু অর্থনৈতিক অবহেলা থেকে তারা এখন মুক্তি পাবে এই তারা ভাবছিল।

সন্ধ্যায় টেলিভিশনে অনেকগুলো দৃশ্য দেখলাম। দুপুরে তাহেরউদ্দিন ঠাকুরকে নিয়ে খন্দকার মোস্তাক আহমদ বঙ্গভবন মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করছিলেন, রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করছেন, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী প্রধানগণ নতুন রাষ্ট্রপতির প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করছে এবং সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য খন্দকারের মন্ত্রিসভায় নূতন আনুগত্যের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছেন।

www.pathagar.com

১৬-৮-৭৫

প্রতিদিন প্রতিদিনই থাকে – দুর্ঘটনা ঘটলেও থাকে, সাধারণ অবস্থা থাকলেও থাকে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে সমগ্র জাতি যেখানে স্তম্ভিত হয়ে পড়বে ভেবেছিলাম, চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম কোথাও সে অবস্থা নেই। বরঞ্চ সবকিছু আরও যেন স্বাভাবিক এবং আরও যেন শান্ত। যারা তার সঙ্গে আন্দোলন করেছিলেন, সর্বদা তার আশপাশে থাকতেন কোথাও তাদের সাড়া নেই। বরঞ্চ তারই মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য খন্দকার মোস্তাক আহমদের কাছে গিয়ে আনুগত্য স্বীকার করলেন। এটাই ছিল আমাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরাট প্রহসন। আমাদের রাজনৈতিক চক্রে মুহূর্তকে মেনে নেয়া হচ্ছে একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। আমরা সুবিধা বুঝে আনুগত্য পরিবর্তন করি। টেলিভিশনে আমি যখন দেখলাম বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার সদস্যরা হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই আবার নতুন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হচ্ছে নতুন মানুষের কাছে, তখন আমি আমার দৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে পারিনি। আমি অবাক হয়ে বারবার ভাবছিলাম ঃ আমি যা দেখছি তা কি সত্য, না নিছক কল্পনা। বারবার চোখ মুছে দৃষ্টি নতুন করে নিবদ্ধ করে দেখলাম যে, যা দেখছি সবই সত্য। এদেশের রাজনীতিবিদরা বিরাট সংকটের মুখোমুখি কখনও হয়নি। এবং যখনই হয়েছে তখন আদর্শের কথা ভাবেনি, আত্মরক্ষার কথা ভেবেছে। এই আত্মরক্ষার প্রহসনে আমরা সত্যকে বিসর্জন দেই, আদর্শকে উপেক্ষা করি এবং চিত্তের দরজা রুদ্ধ করে দেই।

সমগ্র দেশে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে এবং সামরিক শাসন জারি করা হয়েছে। কিন্তু তবু পথে লোকজন বেরুচ্ছে। কোথাও কঠোর কোন পুলিশী ব্যবস্থা দেখলাম না। আমি চট্টগ্রামে আমার বাসায় টেলিফোন করলাম এবং আগামীকাল চট্টগ্রাম ফিরব বলে জানালাম। আমার স্ত্রীকে খুব ব্যাকুল এবং বিধ্বস্ত মনে হল। টেলিফোনে তিনি অনেক কথা জানতে চাইলেন। কিন্তু আমি বেশিক্ষণ কথা বললাম না।

আমি আমার সংক্ষিপ্ত জীবনে অনেক পরিবর্তন দেখলাম এবং কোন পরিবর্তনটাই জাতির স্বার্থে যে হয়নি সেটা আমি বিশ্বাস করতাম। সব পরিবর্তনই এসেছিল ব্যক্তিস্বার্থের খাতিরে। তাই কখনও এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেশের কোন কল্যাণ আসেনি, শুধু পট পরিবর্তন ঘটেছে মাত্র। এভাবে অনবরত বিপর্যস্ত অবস্থা এবং ভগ্নদশার মধ্য দিয়ে আমরা একজনের শাসন থেকে অন্যজনের শাসনে পৌছেছি।

১৭-৮-৭৫

চট্টগ্রামে এসে সবকিছুই স্বাভাবিক পেলাম। শুধু আমার স্ত্রী মানসিকভাবে খুব আঘাত পেয়েছেন দেখলাম। তিনি রাজনীতি জানেন না, রাজনীতির কর্ম-কৌশলও বোঝেন না, কিন্তু মানবিক মমতার বন্ধনকে মান্য করেন। একটি পরিবার সমূলে নৃশংসভাবে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া তিনি কখনও মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি বারবার নিষ্পাপ শিশুদের কথা বলছিলেন এবং বিবাহিত নতুন বধূদের কথা বলছিলেন: কোন রাজনৈতিক সংজ্ঞাতেই যাদের হত্যাকে সমর্থন করা যায় না।

www.pathagar.com

উপাচার্য আবুল ফজল সাহেবকে খুব চিন্তিত দেখলাম। বুঝলাম তিনি নিজের কথাই ভাবছিলেন। অস্বাভাবিকভাবে তিনি উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। সুতরাং তার ভাবনা জাগছিল যে তিনি তাঁর চাকরিতে বহাল থাকতে পারবেন কিনা। তাঁর অফিস কক্ষে দেখলাম রেজিস্ট্রার খলিলুর রহমান তাকে পরামর্শ দিচ্ছেন। আমি যতটা শুনলাম তাতে মনে হল তিনি ঢাকায় যাবেন বলে চিন্তা-ভাবনা করছেন এবং নতুন চ্যান্সেলরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। আমি তাকে বারণ করলাম। আমি বললাম, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড আপনি স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে যাবেন, রাষ্ট্রপতি কে এল বা কে গেল তাতে আপনার কি আসে যায়। যদি সরকার আপনাকে সরিয়ে দেয় দেবে, সে জন্য ব্যাকুল হবার কিছু নেই।' আমার কথার তিনি উত্তর দিলেন না, কিন্তু কেমন অসহায়ভাবে যেন আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার এই অবস্থা দেখে আমি তখন বললাম, "আপনি তো কোন রাজনৈতিক দলের লোক নন, সুতরাং আপনার তো ভয় পাবার কিছু নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মতিন চৌধুরী আত্মগোপন করেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদেরকে বাকশালে যোগ দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। মূলত তাঁর এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার সুযোগ নিয়ে হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং তিনি তো পালাবেনই। কিন্তু আপনার সম্পর্কে তো সে কথা খাটে না।" আমার এতটা ব্যাখ্যার পর আবুল ফজল সাহেব কিছুটা স্বাভাবিক হলেন বলে মনে হল। কিন্তু আগামীকালের সিন্ডিকেটের মিটিং তিনি আগেই স্থগিত করে দিয়েছেন। সুতরাং সে ব্যাপারে কিছু করা গেল না।

১৯-৮-৭৫

আজ বাংলা বিভাগে নতুন সেশনের ক্লাশ আরম্ভ হল। ডঃ আনিসুজ্জামান বিলেত থেকে ফিরল।

বিকেলে আমার শ্বশুরের ফাতেহা উপলক্ষে মিলাদের অনুষ্ঠান করলাম।

২০-৮-৭৫

আজ আমি বাংলা বিভাগের সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম। গতকাল পর্যন্ত আবদুল আউয়াল সভাপতি ছিলেন। আমি বিভাগীয় সমস্যাবলী আলোচনার জন্য সকল শিক্ষককে ডাকলাম এবং জানালাম যে এখন থেকে আমরা প্রতি সপ্তাহে একদিন মিলিত হব এবং বিভাগীল কর্মকর্তা সম্পর্কে আলোচনা করব। এমনকি বিভিন্ন ক্লাশে পড়াশুনার অগ্রগতি কতটা হয়েছে তা নিয়েও আলোচনা করব। আমার প্রস্তাব সকলেই মেনে নিলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার পর আমি একটি বিভাগীয় সাহিত্যসমিতি গঠন করেছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে সমিতিটি প্রায় স্থবির হয়ে গিয়েছিল। এ সমিতিটিকে নতুনভাবে কি করে কার্যকর করা যায় তা নিয়েও আলোচনা ছিল।

www.pathagar.com

২১-৮-৭৫

'আধুনিক বুলগেরীয় ছাপচিত্র' নামক ইংরেজিতে একটি প্রবন্ধ লিখে প্রকাশের জন্য বাংলাদেশ 'অবজারভার' এ পাঠিয়ে দিলাম। আমি বুলগেরিয়া ভ্রমণের পর বুলগেরিয়া বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, এটা সেই ধারার শেষ প্রবন্ধ।

রাত্রে খায়রুল বাশারের বাসায় খেলাম। আমার সঙ্গে কোরেশী ছিল এবং লাইব্রেরিয়ান শামসুল আলম ছিল।

২২-৮-৭৫

অনেক দিন সমুদ্রের কাছে যাওয়া হয়নি। আজ বিকেলে ফৌজদারহাট সমুদ্র সৈকতে কিছুটা সময় কাটালাম। সমুদ্রের প্রতি আমার আকর্ষণ দুর্নিবার, আমি সমুদ্র কখনও ভুলতে পারি না। যেহেতু আমি পৃথিবীতে থাকব না, কিন্তু সমুদ্র চিরদিন থাকবে – এই চিন্তায় অনন্তকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য আমি সমুদ্রের কাছে যাই। ফৌজদারহাট এলাকাটি নির্জন বলেই আমি এখানে আসি।

২৩-৮-৭৫

আজ শবে-বরাত। মুসলমান সমাজে বিশেষ করে আমাদের ঘরে এর একটি আনুষ্ঠানিকতা আছে। এর একটি ধর্মীয় দিক আছে আর একটি আনুষ্ঠানিক সামাজিক দিক আছে। আমি বিশ্বাস করি যে, মানুষের জীবনে প্রার্থনার চেয়ে বড় কিছু নেই, মানুষ প্রার্থনার সাহায্যেই নিজের জীবনকে গ্লানিমুক্ত করে এবং প্রার্থনার সাহায্যে অনন্তের সঙ্গে নিজের একটি সংযোগ স্থাপন করে। মুসলমানদের জন্য প্রতিটি মুহূর্তই প্রার্থনার মুহূর্ত। আমাদের প্রতিদিনের কর্ম সম্পাদনাও এক প্রকার প্রার্থনার মত। তবুও একটি বিশেষ রাত্রি আছে। যাকে আমরা বলি মহিমময় রজনী। এই রাত্রিতে সকল বিশ্বাসী মানুষ সমগ্র সময়টি আল্লাহ্‌র প্রার্থনায় নিজেদেরকে নিমগ্ন রাখে। প্রথাগতভাবে আমরা কিছু বিশেষ রান্নাবান্না করি দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের জন্য। এটার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু এটা দোষেরও নয়। দরিদ্র অভাজন প্রতিদিন তো আমাদের কাছে খাবার পায় না, তারা বিশেষ বিশেষ দিনের অপেক্ষায় থাকে। শবে-বরাতের লৌকিক উৎসবগুলো দরিদ্র লোকদের জন্য। আমার স্ত্রী এটা খুব জানেন। তাই তিনি এদিনে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণের জন্য অনেক কিছু রান্না করেন।

আজ রাত্রে হঠাৎ আমার মনে হল, আমার বোধ হয় আত্মজীবনী লেখায় হাত দেয়া প্রয়োজন। একটি নাম চিন্তা করেছি – "আনন্দ, অভিঘাত ও বিস্ময়।" শেষ পর্যন্ত এ নামটা রাখতে পারব কিনা জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় প্রত্যেক মানুষের জীবনে এ তিনটি অবস্থাই থাকে। আনন্দও থাকে, অভিঘাত থাকে এবং বিস্ময় থাকে। এই তিন অবস্থার মধ্য দিয়ে একজন মানুষ তার জীবনের পরিচয় খুঁজে পায়।

২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮-৮-৭৫

এ কয়দিন কোন বিশেষ ঘটনা নেই. কোন উল্লেখযোগ্য মুহূর্তও নেই। তাই কিছু লিখিনি।

www.pathagar.com

২৯-৮-৭৫

স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ঢাকায় এলাম এবং আলী নকীর বাসায় উঠলাম। আমার স্ত্রীর যে অসুখ তার চিকিৎসার জন্য বারবার ঢাকায় আসার প্রয়োজন হবে। তার ডায়াবেটিস আছে এবং কখনো কখনো ডায়াবেটিসের কারণে শরীরের কোন কোন জায়গায় অ্যাবসেস তৈরি হয়। সেগুনবাগিচায় ডাক্তার ইব্রাহীমকে তখন দেখাতে হয়। ইব্রাহীম সাহেব চিকিৎসক হিসাবে খুবই ভাল, কিন্তু মানুষ হিসেবে আরো ভাল। তিনি রোগীর সঙ্গে তার অসুখ সম্পর্কে প্রথম কিছু জেনে নেন তারপর তার সঙ্গে গল্প করা আরম্ভ করেন। এই গল্পের মধ্যদিয়ে রোগী ক্রমশ অনুভব করে যে, সে আর রোগী নয় এবং ইব্রাহীম সাহেবও ডাক্তার নয়। তারা দুজন বন্ধু। আমার স্ত্রী এ জন্য অন্য কোন ডাক্তারের কাছে যেতে ইচ্ছুক নন।

৩০-৮-৭৫

আজ এগারটার সময় সেক্রেটারিয়েটের দ্বিতীয় তলা ১৭১ নং কক্ষে প্রতিমন্ত্রী তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের কক্ষে সাহিত্য-ভাতা সম্পর্কিত একটি সভা অনুষ্ঠিত হল। আমি ছাড়া আর যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হচ্ছেন শওকত ওসমান, জয়নুল আবেদীন, বেগম সুফিয়া কামাল, আবদুল আহাদ এবং মোস্তফা নূরউল ইসলাম। সবাই খুব স্বাভাবিকভাবে হাসিখুশি মুখে আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে যে ভয়ংকর একটি হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল তা যেন কারও চেতনায়ই নেই এরকম মনে হল। যাই হোক, সময়তো কারও জন্য বসে থাকে না। কাজ করে যেতে হয় এবং জীবনের ধারাক্রম মানতে হয় – এটাই আমাদের ভাগ্যলিপি। সভার কাজ শেষ হলে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর খুব ক্ষোভের সঙ্গে একজন কবির কথা বললেন, যিনি তার একটি কবিতার চরণে লিখেছেন, 'ভাত দে হারামজাদা'। আমি তাহেরউদ্দিন ঠাকুরকে বললাম, "এসব লেখার দ্বারা অস্বস্তিবোধ করার কারণ নেই। জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য অনেকেই উগ্র কথাবার্তা লিখে থাকেন। তার ফলে কবি আলোচনার বিষয় হন। সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি' একটি অত্যন্ত দুর্বল, অস্বাস্থ্যকর এবং রূঢ় উপমা। চাঁদের দিকে তাকিয়ে কোন হতভাগারই রুটির কথা মনে পড়ে না। কিন্তু সুকান্ত লিখে বিখ্যাত হয়ে গেছে এবং বাংলা সাহিত্যের সমাজবাদীরা তাকে মাথায় তুলে নেচেছে। তাৎক্ষণিক সময়ের জন্য এ ধরনের কিছু রচনা সব যুগেই কিছু হয়ে থাকে। এগুলো নিয়ে ভাববারও কিছু নেই, আনন্দিত হবারও কিছু নেই।"

৩১-৮-৭৫

আজ সারাদিন আলী নকীর বাসায় কাটালাম। আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেই এসেছিলেন, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা হল।

১-৯-৭৫

সকালবেলা মুজিবউদ্দৌলা নামক এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। ভদ্রলোক সংস্কৃতিবান, নানা রকম পাখি পুষে থাকেন, ব্যক্তিগত জীবনে একজন ব্যবসায়ী।

www.pathagar.com

এগারটায় বাংলা একাডেমীতে একটি সভা ছিল। বিকালবেলা আমেরিকান লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানীর জয়নুল আবেদীন সাহেব এলেন। এ ভদ্রলোককে আমি দীর্ঘকাল ধরে জানি। এক সময় বীমা করাবার জন্য মানুষের বাড়িতে ঘুরতেন। এখন আমার সঙ্গে এমনিই দেখা করতে আসেন। উদ্দেশ্য গল্পগুজব করা।

২, ৩, ৪, ৫-৯-৭৫

ঢাকায় একদিন ঘোরাফেরায় কাটল। বিশেষ কোন কাজ ছিল না। তবে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কিছুটা সময় কাটাতে পেরে আমার স্ত্রী খুব খুশি হয়েছেন।

৬-৯-৭৫

চট্টগ্রামে ফিরলাম। চট্টগ্রামে ফিরে আবার প্রতিদিনের মত প্রাত্যহিক জীবনের কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়লাম। ঢাকায় বৃষ্টি ছিল, গরমও ছিল। চট্টগ্রাম কিন্তু এখন একটু ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, সন্ধ্যার সময় একটু শীত শীত লাগে। এখন এখানে ঝড় বৃষ্টি বিশেষ নেই। আমার অভ্যেস হচ্ছে ঝড় বৃষ্টি দেখা, যেমন সমুদ্র দেখা তেমনি। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে প্রকৃতির ক্ষমতাটা অনুভব করা যায়। সে যে কত প্রতাপী তা বুঝা যায়। মানুষের প্রতাপের কোন মূল্য আমার কাছে নেই, কিন্তু প্রকৃতির প্রতাপ আমার ভাল লাগে, তার মধ্যে একপ্রকার নিশ্চয়তা আছে। চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যখন ঝড় নামে তা আবর্ত রচনা করে এবং অদ্ভুত শব্দ করে। চারদিকে পাহাড় সে জন্য ঝড় অথবা বাতাস যখন এলাকার মধ্যে প্রবেশ করে তখন তা সহজে বেরিয়ে যেতে চায় না। প্রবল বেগে ঘোরাফেরা করতে থাকে। আমার এসব দৃশ্য বেশ ভালই লাগে।

৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ -৯-৭৫

এ কয়দিনের কিছু সংবাদ নেই। আমরা ক্যাম্পাসে বিকেলবেলা কারও বাসায় গিয়ে আলোচনায় বসি না। যে দুর্ঘটনা ঘটেছে দেশে তার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কেউ কিছু বলতে চান না। লাইব্রেরিয়ান সাহেব সাধারণত সব ব্যাপারেই কথা বলতে আগ্রহী। কিন্তু এবার দেখলাম তিনিও কিছু বলছেন না। আমি নিজেও কোন কাজে নিজেকে নিবিষ্ট করতে পারছি না। ক্লাস নেয়া ছাড়া কোন রকম লেখায় বেশ কিছু দিন ধরে আত্মনিয়োগ করিনি। কেমন এক প্রকার স্তব্ধতা আমাকে পেয়ে বসেছে। আমি জানি, সময়ের একটি নিজস্ব গতিধারা আছে, একটি নিজস্ব ব্যবস্থাপনা আছে। সে মানুষকে কখনো অথর্ব করে কখনো আবার জাগ্রত করে। সুতরাং আমি সময়ের কাছে সবকিছু ছেড়ে দিয়েছি। আবার সচেতনভাবে নিজেকে লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত করতে পারব এ বিশ্বাস আমার আছে।

১৫-৯-৭৫

বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার জন্য ঢাকায় এলাম। এবারও আমি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি এবং আলী নকীর বাসায় উঠেছি। ঢাকায় এসে শুনতে পেলাম

www.pathagar.com

যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মতিন সাহেব এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মযহারুল ইসলামকে জেলে নেয়া হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে অর্থের অপব্যয়, স্বজনপ্রীতি এবং বেআইনীভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের অভিযোগ আনা হয়েছে। এভাবে উপাচার্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে মামলা দায়ের করা বোধহয় এ উপমহাদেশের ইতিহাসে প্রথম। এটা মোটেই সমীচীন নয়। এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তিলমাত্র শ্রদ্ধা থাকলে এই কাজটি কেউ করতে পারে না। সারা পাকিস্তান আমলে এ ধরনের কাজ কখনো হয়নি। দু'একজনকে সরকার কোন কারণ না দেখিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন সত্য, কিন্তু জেলে পাঠিয়ে অপমান করেননি। বাংলাদেশেই প্রথম শিক্ষার এই অবমূল্যায়নটি ঘটল। এদের কাউকেই আমি আদর্শ পুরুষ বলছি না কিন্তু তাই বলে তাদেরকে রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন অপরাধের কথা বলে দায়ী করতে হবে এটাওতো ঠিক নয়।

১৬-৯-৭৫

বাংলা বিভাগের সভাপতি হিসেবে এ বছর আমি বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য। সে উপলক্ষেই আমি ঢাকায় এসেছি। সকাল ১০টায় পরিষদের বৈঠক বসল। আলোচ্যসূচীতে এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না। তবে পরিচিত অনেকের সঙ্গে দেখা হল এটাই বড় কথা। ঘন্টাখানেক মিটিং চলার পর আগামী দিনের জন্য মুলতবী রইল।

বিকেলে আলী নকীর বাসায় বঙ্গভবন থেকে একজন লোক আমার খোঁজে এলেন। তিনি শুধু আমার অবস্থানের ঠিকানা জানতে এসেছেন আর কিছু নয়। তিনি বললেন যে, আজ সকালে চট্টগ্রাম টেলিফোন করে তাঁরা জেনেছেন যে আমি ঢাকায় রয়েছি। ঢাকার ঠিকানাও সেখানেই পেয়েছেন। আমি জানতে চাইলাম আমার ঠিকানা দিয়ে কি প্রয়োজন? ভদ্রলোক বললেন, আমি ঠিক জানি না, তবে আপনাকে বোধহয় কোনও মিটিং-এ ডাকা হচ্ছে।

বিকেলবেলা মহিউদ্দিন সাহেব এলেন। তাকে বেশ প্রফুল্ল লাগছিল। খন্দকার মোস্তাক রাষ্ট্রপতি হওয়ায় তিনি বেশ খুশি হয়েছেন দেখলাম। তারা উভয়ই একই অঞ্চলের লোক এবং দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় সম্প্রীতি আছে। আমি তাঁকে ইফতার করে যেতে বললাম, কিন্তু তিনি ইফতারের জন্য আরেক দিন আসবেন বলে বিদায় নিলেন।

১৭-৯-৭৫

আজকে বাংলা একাডেমীর মুলতবী সভার বৈঠক বসল এবং ঘন্টাখানেকের মধ্যেই মিটিং শেষ হল। মিটিং-এর পর আমি গোপীবাগে গেলাম আমার শালার ওখানে। সেখানে কিছুক্ষণ থেকে বাসায় ফিরলাম।

আজ ইফতারের সময় কয়েকজন লোক ইফতারে অংশগ্রহণ করেছিল। এরা আলী নকীর বিশেষ পরিচিত। আমাদের দেশে ইফতারের অনুষ্ঠানটি একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান। প্রাত্যহিক খাদ্যতালিকায় যা থাকে, ইফতারে তা থাকে না। সাধারণত ইফতারে আমরা প্রথমেই শরবত মুখে দেই। সাধারণ চিনির শরবত ছাড়াও নানা রকম

www.pathagar.com

ফলের শরবত আমরা করে থাকি। চিনি শরবতেও আমি তোকমা দিয়ে থাকি। তাতে মুখে একটি পিচ্ছিল স্বাদের অনুভূতি হয়। আমের সময় দেখেছি কাঁচা আম পুড়িয়ে তাতে রস দিয়ে শরবত করা হয়। করাচীতে যখন ছিলাম, তখন সেখানেও শরবতের ব্যবস্থা হত। তবে যে খাবারটি সে অঞ্চলের বেশি উপভোগ করতাম, সেটা হচ্ছে আনারের দানার মধ্যে লেবুর রস, লবণ এবং কাঁচা লংকা দিয়ে একটা মিশ্রণ। ইফতারে বড়া থাকে, ডালপুরী এবং বিভিন্ন রকমের উপাদেয় খাবার থাকে। আমাদের বাসায় আবার সব সময় ইফতার শেষে মাগরেবের নামাজের পর ভুনা খিচুরির ব্যবস্থা করা হয়।

১৮, ১৯, ২০-৯-৭৫

এই তিন দিনে উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা নেই। শুধু বিশ তারিখে একটা খবর পেলাম যে আগামীকাল বঙ্গভবনে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এবং মাহবুবুল আলম চাষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে।

২১-৯-৭৫

বিকেলবেলা বঙ্গভবনে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এবং মাহবুবুল আলম চাষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তারা আমার শারীরিক কুশল জানতে চাইলেন এবং বর্তমানে চট্টগ্রামে আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা তাও জানতে চাইলেন। আমি তাদের জানালাম যে, বর্তমানে আমার কোনও অসুবিধা নেই, ভালই আছি। শুধু স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য একটু চিন্তিত। কথাবার্তার মাঝখানে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর একবার উঠে গেলেন এবং একটু পরে সে আমাকে জানালেন যে, জাতীয় সংসদের কিছু সদস্যদের নিয়ে রাষ্ট্রপতি ব্যস্ত আছেন। তা না হলে আজও তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতেন। তবে আগামীকাল আমাকে ইফতারের দাওয়াত দিয়েছেন, আমি যেন অবশ্যই আসি। আমি আর কিছু জানবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করলাম না। আগামীকাল আসবো বলে এদের কাছে বিদায় নিলাম।

২২-৯-৭৫

বঙ্গভবনে পৌঁছেই দেখলাম করিডোর দিয়ে শামসুল হক সাহেব যাচ্ছেন। আমাকে দেখেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদেরকে কেন ডেকে পাঠিয়েছে বলতে পারেন? আমি এখন প্রাইভেট লাইফে চলে এসেছি, নতুন করে আবার পাবলিক লাইফে যেতে চাই না।' আমরা এগিয়ে চললাম। রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব আমাদেরকে দোতলার একটি কক্ষে বসালেন। সেখানে শফিউল আযম সাহেবকে এবং শিক্ষা সচিব মোকাম্মেল হককে দেখলাম। একটু পরে রাষ্ট্রপতি মোস্তাক আহমদ এলেন এবং আমাদের সঙ্গে দেশের শিক্ষা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। খন্দকার সাহেব নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করছিলেন। আমরা শুনছিলাম মাত্র। আমাদের দুজনের কেউই মন্তব্য করছিলাম না। এক পর্যায়ে তিনি ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন উপাচার্যের

www.pathagar.com

অংশগ্রহণ নিয়ে কথা তুললেন। আমি তখন হঠাৎ বললাম, 'রাজনৈতিক কারণ থাকলে তাদেরকে সরিয়ে দেবেন, কিন্তু জেলে দেবেন কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'এদের দুজনের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের খবর পাওয়া গেছে। তাছাড়া এরা বাইরে থাকলে দেশের জন্য কিছু অসুবিধার কারণ ছিল। আমি আপনাদের জানাতে চাই যে, গুরুতর কারণ ছিল বলে এদেরকে ধরা হয়েছে।' ইফতারের সময় হয়ে এল। আমরা সবাই ইফতার করতে বসলাম। ইফতারের পর ভিতরের কক্ষে গিয়ে আমি নামাজ পড়লাম। নামাজের শেষে খন্দকার সাহেব রাতের খাবার খেয়ে নেবেন বললেন এবং আমাকে তাঁর সঙ্গে বসতে বললেন। খাবারটা ছিল খুব সাধারণ – ভাত, মুরগীর গোস্ত এবং ডাল। খাবারের শেষে আর কোনও আলোচনা হল না। শুধু মোস্তাক সাহেব আমাকে এবং শামসুল হক সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, 'দেশের বর্তমান অবস্থায় আপনাদের দুজনকে আমার প্রয়োজন আছে। আপনাদের কিছু দায়িত্ব দেয়া হবে এবং সে দায়িত্ব আপনাদের নিতেই হবে। এটুকু বলেই এবং আমাদের আর কোনরূপ কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি বিদায় দিলেন।

বাসায় এসে সবাইকে সাক্ষাৎকারের বিবরণটা দিলাম। আমার স্ত্রী শুধু বললেন, 'চট্টগ্রামে এখন তো আমরা ভালই আছি। আবার তুমি আমাদের নিয়ে কোন যন্ত্রণার মধ্যে যাবে বুঝতে পারছি না।'

২৩-৯-৭৫

আজ ইফতারের সময় বাংলা সংবাদে ঘোষণা শুনলাম যে, সরকার আমাকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত করেছেন এবং শামসুল হক সাহেবকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। আমার স্ত্রী এবং আমি উভয়েই ঘোষণাটি অত্যন্ত শান্তভাবে নিলাম এবং কোনও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলাম না। রাতের খাবারের পর আমার স্ত্রী শুধু বললেন, 'তোমার ভাল লাগতে পারে, কিন্তু আমি বলছি আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বারবার এই জায়গা বদল আর আমার ভাল লাগে না।' আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'দেখ, যেভাবে আমাকে জাহাঙ্গীরনগর থেকে সরান হয়েছিল, তা ছিল মারাত্মক রকম অপমানজনক, নতুন নিয়োগে আমার সেই অপমানের ক্ষোভটা দূর হল।'

২৪-৯-৭৫

স্ত্রীকে নিয়ে চট্টগ্রামে চলে এলাম। তিনি আপাতত চট্টগ্রামেই থাকবেন, আমি একা রাজশাহী যাব। পরে সেখানকার থাকার ব্যবস্থা ঠিক করে তাকে নিয়ে আসবো। ছোট ছেলেকে হোসেনী দালানে আমার ভাইয়ের ওখানে আগে রেখে এসেছিলাম, বড় ছেলে চট্টগ্রামে পড়ছে, আমার মেয়ে নাসরিন তার স্বামী কোরেশীর সঙ্গে চট্টগ্রামেই আছে এবং বড় মেয়ে আমেরিকায়। সুতরাং রাজশাহীতে আমাদের দুজনের সংসার নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।

www.pathagar.com

২৫-৯-৭৫

সিন্ডিকেট মিটিংয়ে সকলেই আমাকে অভিনন্দন জানালেন। আবুল ফজল সাহেব বললেন, 'আপনি তো আমাদের সদস্য রইলেন। সুতরাং, আপনার সঙ্গে তো মাঝে মাঝে দেখাই হবে।'

২৬-৯-৭৫

রাজশাহী যাবার পথে ঢাকায় এলাম। আরজ আলী সাহেবকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠালেন আমার নিয়োগপত্র নিয়ে আসার জন্য। আমি নিজে বঙ্গভবনে গেলাম রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ দেবার জন্য। সেখানে শফিউল আযমের সঙ্গেও দেখা হল। বিকেলবেলা বেইলী রোডে শিক্ষামন্ত্রী মোজাফফর আহমদ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি এক সময়ে আমাদের সহপাঠী ছিলেন এবং উপাচার্য হিসেবে আমরা পরস্পরের সহযোগী ছিলাম। তাঁকে খুব বিমর্ষ দেখলাম। তিনি বললেন, 'আপনার নিয়োগে আমি খুব খুশি হয়েছি, কিন্তু জানেন এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে কোনও পরামর্শ করা হয়নি। আমি শিক্ষামন্ত্রী অথচ আমাকে এড়িয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ হবে। এটা আমার জন্য কি একটু অপমানজনক নয়? যাকগে, আপনি বন্ধু বলেই এ কথাগুলো বললাম।' আমি অকস্মাৎ তাঁকে প্রশ্ন করলাম, 'আপনি বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন, আপনি তার মন্ত্রিসভায় ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর আপনি খন্দকার সাহেবের মন্ত্রিসভায় কি করে চলে এলেন?" তিনি বললেন, 'কেন যোগ দিলাম, সেটা কি আপনি বুঝতে পারেন না? আমরা তো কেউ ত্যাগী পুরুষ নই, আমরা তো সাধারণ মানুষ, আমাদের তো প্রাণের ভয় আছে।'

২৭-৯-৭৫

আলী নকীকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশ বিমানে ঢাকা থেকে ঈশ্বরদী পৌঁছলাম। ঈশ্বরদী বিমানবন্দরে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি নিয়ে রেজিস্ট্রার এবং আরও কয়েকজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। উপাচার্যের বাসভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। এঁদের সবাই আমার পরিচিত এবং বেশ কয়েকজন আমার ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে আছরের নামাজ পড়লাম এবং নামাজের পর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গেলাম এবং তারপর ডঃ শামসুজ্জোহার কবর জেয়ারত করলাম। এরপর আমার একান্ত সচিব আইনুল হুদাকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শিক্ষকদের বিধবা পত্নীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। বাসায় ফেরার পথে মাজাহারুল ইসলামের স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম।

২৮-৯-৭৫

আজ সকালে শহরে শাহ মখদুমের কবর জিয়ারত করলাম। তারপর রেজিস্ট্রারকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘুরে দেখলাম। দুপুরে মিসরের দুজন প্রতিনিধি সাক্ষাৎ

www.pathagar.com

করতে এলেন। তারা সরকারীভাবে বাংলাদেশ সফরে এসেছেন এবং বর্তমানে রাজশাহী আছেন। বিকেলে এদের সঙ্গে আমি ইফতার করলাম এবং রাতেও তারা আমার সঙ্গে খাবারে যোগ দিলেন। খাবারে আমার সঙ্গে ট্রেজারার শামসুদ্দিন সাহেবও যোগ দিয়েছিলেন।

২৯-৯-৭৫

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক ভবনে ডীন এবং প্রভোস্টদেরকে সাক্ষাৎকার দিলাম। তাঁদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলাম।

বিকেলে সিন্ডিকেট সদস্যদের সঙ্গে ইফতারে মিলিত হলাম।

৩০-৯-৭৫

চট্টগ্রাম থেকে টেলিফোন পেলাম যে, রাশিয়ায় যাবার জন্য আমার জন্য একটি জরুরি দাওয়াতপত্র চট্টগ্রামে এসেছে। আমি যেন শিগগির এসে দাওয়াতপত্র নিয়ে মস্কো যাবার ব্যবস্থা করি।

বিকেলবেলা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সদস্যরা আমাকে একটি ইফতার পার্টিতে আপ্যায়ন করলেন।

১-১০-৭৫

রাজশাহী থেকে ঢাকায় এলাম। জাতিসংঘ সমিতির সৈয়দ আহমদ হোসেন আমার সঙ্গে দেখা করল। সে আমাকে জানাল যে, মস্কোতে জাতিসংঘ সমিতির ২৫তম বৈঠক বসছে। সেখানে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমাদের যেতে হবে। সে জানাল যে, আমার পাসপোর্ট তাঁর হাতে দিলে সে ভিসার ব্যবস্থা করবে। আমার পাসপোর্ট ছিল চট্টগ্রামে এবং আমন্ত্রণলিপিও সেখানে। সুতরাং আমাকে অবিলম্বে চট্টগ্রাম থেকে সেগুলো এখানে নিয়ে আসতে হবে।

২-১০-৭৫

চট্টগ্রামে ফিরলাম। সেখান থেকে সবকিছু গুছিয়ে নিলাম এবং পরের দিন ঢাকায় ফিরবার ব্যবস্থা করলাম।

৩-১০-৭৫

সকাল সাড়ে আটটায় ঢাকায় আলী নকীর বাসায় এসে আহমদ হোসেন আমার পাসপোর্ট নিয়ে গেল। আমার সঙ্গে যে কাগজপত্র ছিল তার মধ্যে সরকারের অনুমোদন-পত্র ছিল এবং কনফারেন্স সংক্রান্ত খবরাদি ছিল।

১১.৩০ মিনিটে ঢাকা থেকে থাই এয়ারলাইন্সে দিল্লী পৌঁছালাম। দিল্লীর অশোকা হোটেলে আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। আমি সেখান থেকে বাংলাদেশের হাই

www.pathagar.com

কমিশনার শামসুর রহমানকে টেলিফোন করলাম। সে বিকেলে গাড়ি পাঠিয়ে দিল। তার বাসায় কিছুটা সময় কাটিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। হোটেলে রাতের খাবারটি খুব ভাল হয়েছিল। আমি অর্ডার করেছিলাম চিকেন টিক্কা, রওগন জুস এবং নান। চিকেন টিক্কাটা অসাধারণ লেগেছিল। নানটি অনেকটা ত্রিভুজের মত তেকোণা গরম ছিল এবং তার উপর ঘি মাখান ছিল।

৪-১০-৭৫

সকাল ন'টায় অ্যারোফ্লোটে মস্কো যাত্রা করলাম। মাঝখানে তাসখন্দে আধঘন্টার জন্য যাত্রাবিরতি ছিল। তাসখন্দ থেকে মস্কো পৌঁছলাম। এয়ারপোর্টে কাউকে পেলাম না। বাংলাদেশ মিশনে এবং কনফারেন্স উদ্যোক্তাদের কাছে টেলেক্স পাঠান হয়েছিল। মনে হল টেলেক্স পৌঁছেনি। আমি কোথায় কি করে যাবো বুঝতে পারছিলাম না। এমন সময় একটি ১৮/১৯ বছরের ছেলেকে দেখলাম। গলায় একটি নোটিশ ঝুলে আছে। সাইনবোর্ডে লেখা 'WHO'। সম্ভবত বিশ্বস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কোনও সম্মেলন হচ্ছে। সম্মেলনের অতিথিদের জন্য ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে। আমি ছেলেটির দিকে এগিয়ে গিয়ে আমাকে সাহায্য করতে বললাম। ছেলেটি আমার কাগজপত্র দেখে বলল যে, হোটেল রুসিয়ায় আমার থাকবার কথা এখানে লেখা আছে। তখন সে হোটেল রুসিয়ায় বিভিন্ন টেলিফোনে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করতে লাগল। আধঘন্টা পর একটি উত্তর পেয়ে আমাকে বলল, 'আপনার জন্য হোটেলে বুকিং আছে। তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি একটি ট্যাক্সি নিয়ে চলে যান। পাঁচ রুবল লাগবে।' আমি আমার সুটকেস নিয়ে এয়ারপোর্টের বাইরে বেরুতেই নিশান উড়তে থাকা এক লিমুজিনের শোফার আমাকে প্রায় টেনে গাড়ির ভিতর বসিয়ে দিল। যতদূর মনে হল সে কোনও মন্ত্রীকে এখানে নামিয়ে দিয়েছে এবং বেআইনীভাবে কিছু উপার্জন করবে বলে এখানে অপেক্ষা করছিল। আমি যখন হোটেল রুসিয়ার কথা বললাম তখন সে হাতের পাঁচ আঙুল দেখিয়ে জানাল যে, পাঁচ রুবল লাগবে। নিশান উড়তে থাকা অবস্থাতেই সে সাঁ সাঁ করে গাড়ি ছেড়ে দিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে হোটেল রুসিয়ার সামনে এসে আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। আমার থাকবার ঘর হয়েছে এগার তলায়, ২২৬ নম্বর কক্ষে। হোটেলে পৌঁছে বাংলাদেশ মিশনের মাহবুবুল হক এবং আবারামুল কাদিরের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। হায়াৎ মাহমুদের সঙ্গেও যোগাযোগ করলাম। মাহবুবুল হক পরের দিন দুপুরে তার সঙ্গে খেতে বলল।

রাত্রে হোটেলের ডাইনিং রুমে কনফারেন্সের লোকজনের সঙ্গে দেখা হল। খাবার ব্যবস্থাটি ভাল নয়। বেছে নেবার মত কিছু ছিল না। সবই ছিল সুনির্দিষ্ট ভাতের মণ্ডের মত একটি থন স্যুপ, বিফ স্টেক এবং তার সঙ্গে আলুসেদ্ধ এবং সবশেষে পুডিং।

৫-১০-৭৫

সকালে ব্রেকফাস্টে পেলাম লবণাক্ত কাঁচা হেরিং মাছ। সাদা, লাল এবং কালো - তিন ধরনের পাউরুটি। সঙ্গে আম জেলি ছিল। সবশেষে চা। আণ্ডা দেয়নি। হেরিং মাছটি গলাধঃকরণ করতে পারিনি। চিবুতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারিনি।

www.pathagar.com

হায়াৎ মাহমুদ এসেছিল।

দুপুর বারোটায় মাহবুবুল হকের গাড়ি এল। তার বাসা ছিল বেশ দূরে। তার ওখানে ক'জন বাংলাদেশী ছাত্রের সঙ্গে দেখা হল। সকলে মিলে বাংলাদেশী খাবার ভালই লাগল।

বিকেল চারটায় হল অব ট্রেড ইউনিয়নে আমাদের সম্মেলনের উদ্বোধন হল। সন্ধ্যায় হোটেলে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং কনফারেন্সে আগত সকলের সঙ্গে নৈশভোজে মিলিত হলাম। জাতিসংঘের সমিতিগুলো পৃথিবীর সব দেশেই আছে। এ সমিতিগুলো এক ধরনের ক্লাবের মত। এখানে জাতিসংঘের আদর্শ নিয়ে আলোচনা হয় এবং সকল প্রকার কর্মতৎপরতার প্রশংসা করা হয়। বছরে একবার করে পৃথিবীর একেকটি দেশে একটি করে প্লেনারি সেশন হয়। যারা এ সমস্ত কনফারেন্সে যোগ দেয় তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বেড়ানো এবং ভাবের আদান-প্রদান করা।

৬-১০-৭৫

আজ ছিল সেমিনারের শেষ দিন। সকালে একটি সেশন ছিল এবং বিকেলে একটি। রাত্রে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল একটি বেশ বড় রেস্তোরাঁয়। সেখানে নানা রকম খাবার ছিল। সবচেয়ে স্বাদের ছিল তাসখন্দ অঞ্চলের বিরিয়ানী এবং ল্যাম্ব সাশালীক। এখানে বিরিয়ানীতে গোশ্‌তের টুকরো থাকে বেশ বড় বড়, আলু থাকে, এক ধরনের সব্জি থাকে। তবে আমাদের মত চাল থাকে না। চালের পরিবর্তে এক রকমের দানা থাকে। সম্ভবত গমের টুকরো। এখানে ইউনেস্কোর পুরনো কয়েকজন ফরাসি বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। তারা মস্কোতে ছিলেন এবং ডিনারে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

৭-১০-৭৫

আজ ঈদুল-ফিতর। মাহবুবুল হক সকালে টেলিফোন করে জানালেন যে, রাতে ঈদ উপলক্ষে তার ওখানে আমাকে খেতে হবে।

দশটার সময় কনফারেন্সের সবাইকে মস্কো থেকে সত্তর মাইল দূরে 'যারগোস্‌বা' শহরে ভ্রমণের জন্য নিয়ে যাওয়া হল। এ শহরে একটি বিশ্ববিখ্যাত পুতুল যাদুঘর আছে। পৃথিবীর সকল দেশের পুতুলের নানা বিচিত্র সংগ্রহ এখানে দেখলাম। এ শহরটি কয়েকটি পুরনো গির্জার জন্য প্রসিদ্ধ। আমরা ঘুরে ঘুরে কয়েকটি গির্জাও দেখলাম। এগুলোকে 'অর্থোডক্স চার্চ' বলা হয়।

ভ্রমণ থেকে ফিরে মাহবুবুল হকের বাসায় ঈদ উপলক্ষে মিলিত হলাম। দেশের একটি পরিচিত পরিমণ্ডল সেখানে গড়ে উঠেছিল। আমরা সবাই তা উপভোগ করলাম।

৮-১০-৯৫

আমরা সকালে লুবুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর প্রফেসর সতানিসের অফিসে এলাম। সতানিস আমাকে খুব সাদরে গ্রহণ করলেন। তিনি আমাকে খুব ভালভাবে আপ্যায়ন

www.pathagar.com

করালেন– মাছ ভাজা এবং ক্যাভিয়ার ছিল। বিদায় নেওয়ার আগে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রেস্ট উপহার দিলেন।

সতানিসের ওখান থেকে হায়াৎ মাহমুদের ওখানে গেলাম। দুপুরের খাবার সেখানেই খেলাম। সেখানে রুশ অনুবাদক সেরগির সঙ্গে সাক্ষাৎ হল।

রাত্রি দুপুরের পর ঢাকার পথে অ্যারোফ্লোটে উঠলাম।

৯-১০-৭৫

বাগদাদ এবং বোম্বাই হয়ে বিকেল পাঁচটায় ঢাকায় ফিরে এলাম। এবার রফিকের বাসায় উঠলাম। এসেই শুনলাম বার তারিখে তুসির বিয়ে। তাছাড়াও মঞ্জুরি কমিশনের মিটিং আছে। বাংলা একাডেমীর একটি মিটিং আছে এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলে একটি মিটিং আছে। অর্থাৎ, ১৬ তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় থাকতে হচ্ছে।

১০, ১১, ১২-১০-৯৫

তুসির বিয়ে উপলক্ষে আত্মীয়স্বজন সকলের সঙ্গেই দেখা হল। চট্টগ্রাম থেকে গ্রীন অ্যারোতে আমার ছোট ছেলে সীমাবকে নিয়ে আমার স্ত্রী ঢাকায় এলেন। তিনি এবার আমার সঙ্গে রাজশাহী যাবেন।

১৩-১০-৭৫

আজ অনেকেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ভারতীয় দূতাবাসের জালাল আহমেদ, ডঃ মনিরুজ্জামান, ডঃ মুস্তফা, নূর-উল ইসলাম, ডাঃ কাসেম এবং আহমদ হোসেন। বিকেলে আমি ডঃ মল্লিকের এবং ডঃ মুজাফফর আহমদ চৌধুরীর বাসায় গেলাম। উভয়কেই দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় খুবই বিরক্ত দেখলাম।

১৪-১০-৯৫

আজকে ব্রিটিশ কাউন্সিলের জনসনের বাসায় নৈশভোজের দাওয়াত ছিল।

১৫-১০-৭৫

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সভায় অনেকের সঙ্গে দেখা হল। সভার শেষে ডঃ নাসেরের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাদাভাবে কথা বললাম।

১৬-১০-৭৫

সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোস্তাক আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কবলাম। তিনি খুব আন্তরিকভাবে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসন নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, একটি দেশকে সর্বতোভাবে সুশৃংখল এবং সুন্দর করা যায়,

www.pathagar.com

যদি সে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার প্রতি নিবেদিত না হয়ে রাজনীতি চর্চায় মুখর হয় উঠেছে এবং এর ফলেই বিড়ম্বনা সৃষ্টি হয়েছে। কথায় কথায় তিনি আবুল ফজল সাহেবের কথা তুললেন। তিনি বললেন, তাকে তিনি এবারকার হজ্জ ডেলিগেশনের প্রধান করে মক্কায় পাঠাতে চেয়েছিলেন। তিনি একজন প্রবীণ লোক, শ্মশ্রুমণ্ডিত এবং দেখতে বেশ ধর্মপ্রাণ মনে হয়। কিন্তু তিনি যেতে রাজী হননি। উত্তরে নাকি বলেছিলেন, 'আমি কি কোন পাপ করেছি নাকি যে, হজ্জে যাব?'

১৭-১০-৭৫

আজ রাজশাহীতে ফিরলাম।

১৮-১০-৭৫

বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিংপুলে বিডিআর-এর সাঁতার প্রতিযোগিতা হচ্ছে। প্রধান অতিথি হিসেবে আমি প্রতিযোগিতা উপভোগ করলাম। শৈশবে সাঁতারের প্রতি আমার প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল। সব সময় পানিতে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করতো। নিজের মধ্যে কেমন এক প্রকার অদ্ভুত শক্তি পেতাম। পানির মধ্যে ভারি বস্তু ডুবে যায়। সেখানে আমি ভেসে থাকতে পারছি – এটাতেই ছিল আমার গর্ব।

১৯-১০-৭৫

স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এবং সিন্ডিকেট সদস্য আবদুস সালাম সাহেবের মেয়ের বিয়েতে যোগ দিলাম তার সিপাইপাড়ার বাসভবনে। ভদ্রলোক উকিল হিসেবে বেশ খ্যাতিমান।

২০-১০-৭৫

আজ আমি বিভাগীয় অধ্যক্ষদের সঙ্গে একটি আলোচনায় মিলিত হলাম।

২১-১০-৭৫

আজ স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তাঁদের সঙ্গে কলেজগুলোর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলাম। বিকেলে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এসেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশ বেতার কর্তৃপক্ষের কয়েকজন।

সন্ধ্যার পর প্রেমতলীতে মাহবুবুল আলম্ চাষীর সঙ্গে দেখা হল।

২২-১০-৭৫

সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত আমি পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ এবং পরিসংখ্যান বিভাগ পরিদর্শন করলাম।

www.pathagar.com

সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ উপাচার্যের বাসভবনে একটি চা-চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, মাহবুবুল আলম চাষী, বিভাগীয় উপ-কমিশনার এবং বিভাগীয় অধ্যক্ষবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কথাবার্তা মূলত মাহবুবুল আলম চাষীই বলছিলেন। কতকগুলো বিষয়ে তিনি কথা বলায় বেশ পারঙ্গম – কৃষি এবং সমবায়। এ দুটি বিষয়ে তিনি প্রচুর বই পড়েছেন এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এসব বিষয়ের নানা ধরনের পরিকল্পনা তিনি পরীক্ষা করেছেন। বাংলাদেশ হবার পর প্রথম প্রথম এসব বিষয় নিয়ে তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে কাজে অগ্রসর হতে চেয়েছেন, কিন্তু প্রশাসনিক বাধায় তিনি কিছুই করতে পারেননি। এখন মনে হচ্ছে বর্তমানে তিনি স্বাধীনভাবে তাঁর কাজের অধিকার পেয়েছেন।

২৩-১০-৭৫

আজ সকাল ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত বাংলা, ইতিহাস, ইংরেজি, ইসলামের ইতিহাস এবং ভাষা বিভাগ পরিদর্শন করলাম।

২৪-১০-৭৫

সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত রসায়ন বিভাগ, ফলিত রসায়ন বিভাগ, গণিত বিভাগ এবং ভূগোল বিভাগ পরিদর্শন করলাম।

বিকেল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিষয়ে কোনও কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় কিনা, তা নিয়ে একটি আলোচনায় বসলাম। মূলত মাহবুবুল আলম চাষী এ বিষয়ে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আজকের আলোচনায় বিভাগীয় কমিশনার, ভিসি উপস্থিত ছিলেন এবং কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর উপস্থিত ছিলেন।

২৫-১০-৭৫

সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা বিভাগ, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, অর্থনীতি বিভাগ, দর্শন বিভাগ, সমাজতত্ত্ব, সমাজকর্ম, আইন, বোটানি, প্রাণিতত্ত্ব ও সামরিক শিক্ষা বিভাগ পরিদর্শন করলাম।

সন্ধ্যা ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে ঈদ পুনর্মিলনীতে যোগ দিলাম।

২৬-১০-৭৫

সন্ধ্যায় ডঃ সরকার তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে এসেছিলেন।

২৭-১০-৭৫

খুব ভোরে গাড়ি নিয়ে ঢাকায় এলাম। আগামীকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হবে।

www.pathagar.com

২৮-১০-৭৫

বেলা ১১টায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আইবিএস সংক্রান্ত সভায় যোগ দিলাম। সন্ধ্যায় শিক্ষামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর বাসগৃহে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হলাম।

২৯-১০-৭৫

রাজশাহী প্রত্যাবর্তন।

৩০, ৩১-১০-৭৫

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা নেই।

১-১১-৭৫

দুপুর ১২টায় ইতিহাস বিভাগে বিখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ও দার্শনিক টয়েনবি-র ওপর একটি আলোচনা সভায় যোগ দিলাম। আমি আমার বক্তৃতায় টয়েনবি-র সঙ্গে আমার একবার যে সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেই কথাটি বললাম। টয়েনবি ছিলেন অত্যন্ত নিরহঙ্কার ও বিনয়ী। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাঁর একটি উদার মনোভঙ্গী ছিল। পাকিস্তান আমলে তিনি যখন একবার করাচীতে আসেন তখন সেখানে একটি আলোচনা সভায় বলেছিলেন, 'ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্টীয় ধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম একই ধারার তিনটি ধর্ম। মূলত এই তিনটি ধর্মের উৎসই হচ্ছে ইব্রাহিমের একত্ববাদ। এই একত্ববাদ সংক্রান্ত চিন্তার বিভিন্ন রকম বিকাশ ঘটেছে ইহুদি মতবাদে, খ্রিস্টীয় মতবাদে এবং ইসলামী বিশ্বাসে। এই তিনটি ধর্ম পরস্পরের পরিপূরক হয়ে যদি থাকতে পারত, তবে পৃথিবীতে কোনও বিবাদ-বিসংবাদের কোনও সম্ভাবনা থাকত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এরা প্রত্যেকে একে অন্যের বিরুদ্ধে ভয়ংকরভাবে আক্রমণাত্মক ভঙ্গী নিয়ে উদ্যত হয়ে আছে।'

২-১১-৭৫

আজ সকালে জোহা হল পরিদর্শন করলাম এবং তারপর যাদুঘর পরিদর্শন করলাম।

বিকেল ৫টায় আন্তকলেজ সাঁতার প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত ছিলাম। সেখান থেকে জুবেরী হল পরিদর্শন করলাম।

৩-১১-৭৫

আজ সকাল ৮টা থেকে ঢাকার সঙ্গে সর্বপ্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমি রাজশাহী সেনানিবাসের আর্মি কমান্ড্যান্ট খালেকুজ্জামানকে টেলিফোন করে জানতে চাইলাম, ঢাকার অবস্থা কি। সে জানাল যে, সেও কিছু জানে না। তার সঙ্গেও যোগাযোগ নেই। সে খুব ভীত হয়ে পড়েছে বলে মনে হল।

www.pathagar.com

বিকেলে একাডেমিক কাউন্সিলে মিটিং ছিল। ঢাকা থেকে এসেছেন মনসুরউদ্দিন সাহেব। তিনিও ঢাকার কথা কিছু বলতে পারলেন না। রাজশাহীতে আমরা একপ্রকার শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় রয়েছি।

৪-১১-৭৫

আজও ঢাকার কোনও খবর নেই। খালেকুজ্জামান আমার অফিসে দেখা করতে এল। রাজশাহী জোনের ডিআইজি এলেন। তাঁরা রাজশাহী শহরে কোনও প্রকার গোলযোগ যাতে না দেখা দেয়, সেজন্য ব্যবস্থা নিচ্ছেন বললেন। একটু পরে বিভাগীয় কমিশনার এলেন। তাঁরা সবাই মিলে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হবে বললেন। খালেকুজ্জামান বলল, ঢাকার পরিস্থিতি খুব জটিল। সমস্ত খবর রাত্রে পাওয়া যাবে।

৫-১১-৭৫

খুব সকালে খালেকুজ্জামানের টেলিফোন এল। সে ঢাকা জেলে হত্যাকাণ্ডের কথা জানাল। কেন্দ্রীয় জেলে তাজউদ্দিন, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী ও নজরুল ইসলামকে হত্যা করা হয়েছে। সেনাবাহিনী প্রধানের পদ থেকে জেনারেল জিয়া পদত্যাগ করেছেন এবং খালেদ মোশাররফ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। একটু পরে ডিআইজি টেলিফোন করলেন যে, রাজশাহীতে দাফনের জন্য কামরুজ্জামানের লাশ আসছে। তিনি আমাকে সতর্ক থাকতে বললেন।

সকাল ১০টায় ফাইন্যান্স কমিটির মিটিং ছিল। কিন্তু মিটিং হতে পারল না। একদল ছাত্র স্লোগান দিতে দিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনে প্রবেশ করল এবং সকল প্রকার কাজকর্ম বন্ধ রাখতে বলল। তারা কিছু ভাঙচুরও করল। তারা আমার কক্ষে এসে আজকের দিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি ঘোষণা করতে বলল। ছাত্ররা সেখান থেকে কামরুজ্জামানের জানাজায় অংশ নিতে শহরে গেল। এই ছাত্রদল চলে যাওয়ার পর বিপরীতপন্থী আরেকটি ছাত্রদল বেরিয়ে এল। তারা আনন্দ উল্লাস করতে করতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা প্রদক্ষিণ করতে লাগল।

সন্ধ্যায় ডিআইজি এবং বিভাগীয় কমিশনার আলম সাহেব আমার বাসায় এলেন এবং জানালেন যে, রাত্রিবেলা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশ টহল দেবে এবং আমার বাসায় পুলিশ পাহারা দেবে। তাঁরা আরও খবর দিলেন যে, দেশে উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুসংখ্যক ছাত্র বহিরাগতদের সাহায্যে আমার বাসভবন আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আমাকে তারা পদত্যাগে বাধ্য করবে – এমন চিন্তাও করছে। তারা দুজন শিক্ষকেরও নাম বললেন, যারা এ পরিকল্পনায় জড়িত রয়েছেন।

৬-১১-৭৫

ঢাকার খবর পেলাম। খন্দকার মোস্তাক পদত্যাগ করেছেন। মন্ত্রিসভাও পদত্যাগ করেছেন এবং প্রধান বিচারপতি সায়েম সাহেব রাষ্ট্রপতির ভার গ্রহণ করেছেন। সায়েম সাহেব আমার পূর্ব পরিচিত। দেশ বিভাগের পূর্বে কলকাতা থাকতেই তাকে জানতাম।

www.pathagar.com

৭-১১-৭৫

দেশের পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে। গতরাত থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনী ঢাকায় চলে এসেছে এবং জিয়াউর রহমানের পক্ষে সংঘবদ্ধ হয়ে দেশের প্রশাসনকে দখল করেছে। দেশের আপামর জনসাধারণ সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিতভাবে দেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে পথে পথে স্লোগান দিচ্ছে। খালেদ মোশাররফ পলাতক এবং জেনারেল জিয়া দেশের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এ অভ্যুত্থানে একটি অবস্থা সুস্পষ্ট হল যে, আমাদের দেশের সেনাবাহিনী ও জনসাধারণ ভারতের অঙ্গীকার এবং দায়বদ্ধতার মধ্যে কোনক্রমেই যেতে চায় না। খালেদ মোশাররফের উদ্ভবকে তারা ভারতের ষড়যন্ত্র হিসেবে ধরে নিয়েছিল।

সন্ধ্যায় আমার বাসায় খালেকুজ্জামান, ডিআইজি এবং বিভাগীয় কমিশনার এলেন। আমরা সবাই দেশের সার্বিক ঘটনার একটি নিশ্চিন্ত পরিসমাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করলাম। জিয়ার ক্ষমতা গ্রহণকে দেশের জন্য বর্তমান অবস্থার সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর বলে সকলেই অভিমত প্রকাশ করলাম।

৮-১১-৭৫ থেকে ৩১-১২-৭৫

আমার ডায়েরীতে এ সময়কালের বিশেষ কোনও ঘটনার উল্লেখ নেই।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com